A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

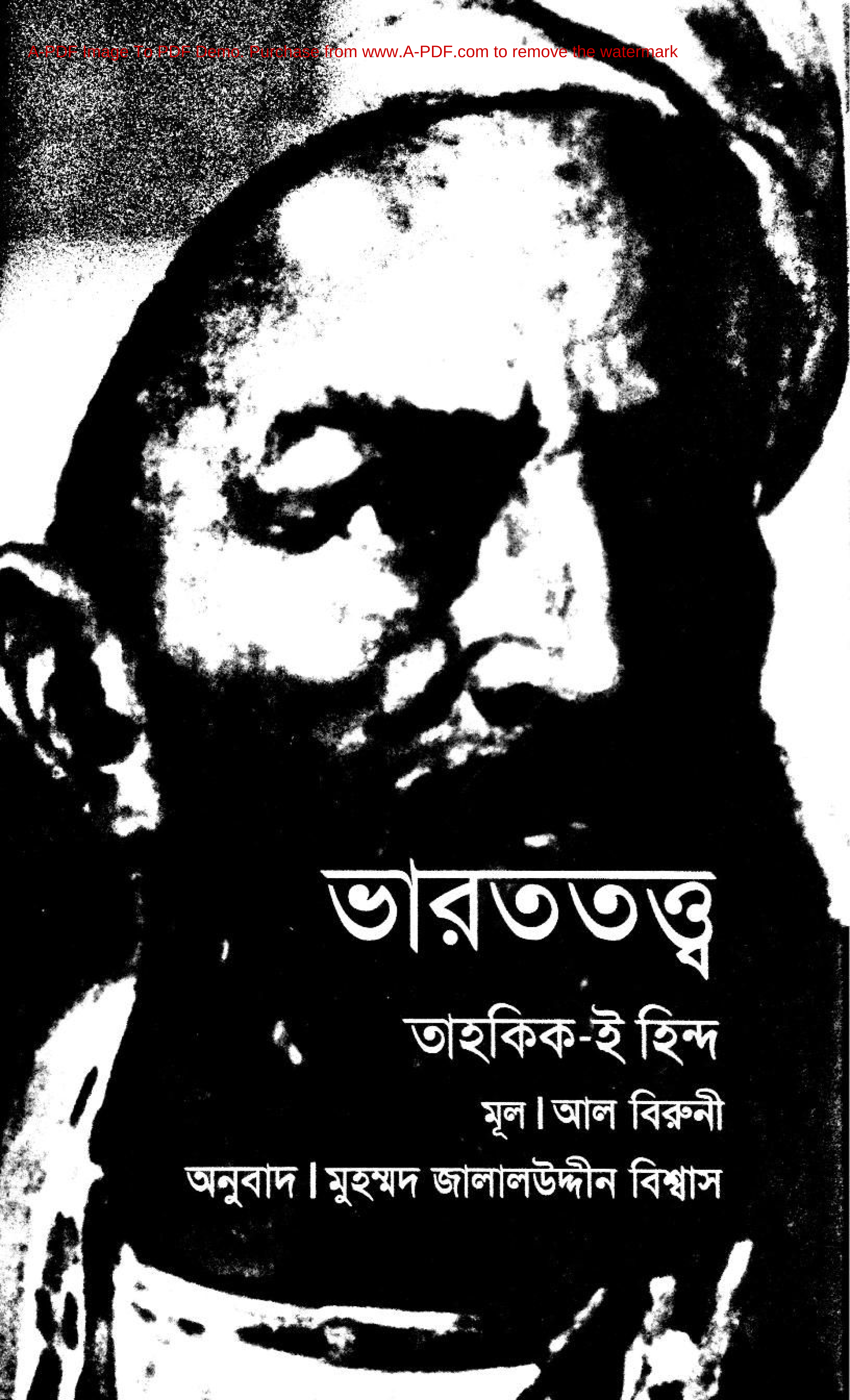

ভারততত্ত্ব

তাহকিক-ই হিন্দ

মূল । আল বিরুনী

অনুবাদ । মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

ভারততত্ত্ব
মূল: আবু রায়হান মুহম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী
অনুবাদ ও সম্পাদনা: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

প্রকাশক

ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮
মে ২০১১

প্রথম ঐতিহ্য সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ
শিবু কুমার শীল

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
পাঁচশত টাকা

TAHAKIK-E-HIND (Bharat Tatva) Translated, Edited & Introduced by Muhammad Jalaluddin Biswas.
Published by Oitijhya
Second Print : May 2011.

website: www.oitijhya.com
Email: oitijhya@gmail.com

All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 500.00 US$ 15.00

ISBN 984-70193-0083-4

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক, ফ্রেন্ড, ফিলসফার এবং গাইড

মোহাম্মদ ওয়াজির আলী সাহেবের দস্ত্ মুবারকে–

নৃপতি মানিত দেশে বিদ্বান মানিত হন সর্বত্রই জানি।

শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞজনে উৎসর্গ করিনু তাই এই গ্রন্থখানি।

বিদ্যা অমূল্য ধন মুঠি ভরে লও তারে কহে ধর্ম দীন।

উৎসর্গিত করে গ্রন্থ সে-সাধনে নিয়োজিত জালালউদ্দীন।

আরবি নাম : কিতাব আত-তাহকিক আল হিন্দ

সংক্ষিপ্ত নাম : তহকিক-ই হিন্দ বা তারিখ-উল হিন্দ

বাংলা নাম : ভারততত্ত্ব

মূল : আবু রাইহান মুহম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী

জার্মান পণ্ডিত অ্যাডওয়ার্ড সি. সখাউ-এর ইংরেজি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

ভূমিকা

ইসলাম, মুসলমান, মনুষ্যত্ব ও মানবতার শত্রুরা জগদ্বিখ্যাত বীর সুলতান মাহমুদের ভারত বিজয়কে 'ভারত আক্রমণ' বা 'সোমনাথ-মন্দির লুণ্ঠন' এবং তাঁকে 'লুটেরা' বলে অভিহিত করলেও আমরা আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল মুসলমানরা তাকে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী মহান গাজি বা বীর বলে অভিহিত করে থাকি এবং এ ঘটনাকে আমরা একজন গাজি ও বীরের রাজনৈতিক মিশন বলে অভিহিত করি। এর কৈফিয়ত-স্বরূপ আমরা এতটুকুই বলতে পারি যে, আমরা মুসলমানরা দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের শত্রুদের চেহারা দেখি না ; এবং আমরা আমাদের শত্রুদের চোখ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকেও দেখি না, জগৎকেও দেখি না, তাই আমরা তাদের অনুভূতি ও তাদের ভাষায় কথা বলি না বা সেই মতে কোনো ঘটনার মূল্যায়নও করি না। সুতরাং সুলতান মাহমুদকে আমরা তথাকথিত 'লুটেরা', 'লুণ্ঠনকারী' বা 'আক্রমণকারী' বলে অভিহিত করি না। আমরা তাঁকে, সিন্ধুবিজয়ী বীর মুহম্মদ ইবনে কাশিমের পরে ভারতে বা উপমহাদেশে মুসলমানদের দ্বিতীয় রাজনৈতিক মিশন পরিচালনাকারী মহান বীরসেনানী ও গাজি বলে অভিহিত করি। কেননা, ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ তাঁরাই পরিষ্কার করে গিয়েছেন। ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে তাঁরা মুসলমানদের পূর্বসূরি। তাই এতে আঞ্চলিক, জাতিগত ও ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে দেশীয় শত্রুদের চেয়ে তথাকথিত 'বিদেশি মুসলমান'রাই আমাদের পরম আপনজন। মনে রাখতে হবে যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী ও মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিনাশকারী ঘৃণিত শত্রুদের দেশি-বিদেশি কোনো সহযোগী ও তাদের মিত্ররা কখনোই মুসলমানদের বন্ধু এবং আপনজন বলে বিবেচিত হতে পারে না। সুতরাং তারা সর্বথায় পরিত্যাজ্য এবং তাদের কৃত ঐতিহাসিক মূল্যায়ন–যা কিনা ইসলাম, মুসলমান, মনুষ্যত্ব ও মানবতার পরিপন্থী–তা সর্বথায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের যোগ্য। সেক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনাজাত উপলব্ধিই একমাত্র কাম্য।

মহাত্মা গাজি ও বীর সুলতান মাহমুদ ও অন্য ভারত-বিজেতাদেরও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে হবে। আর ইসলামের শত্রুদের দেশি-বিদেশি সহযোগীদের ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে হবে। তাহলে, সেইটাই হবে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে মুসলমানের নিজের অন্তর ও বাইরের চেহারা দেখা। এর বাইরের যে দেখা, সে হলো জাহিলি বা মূর্খতার দেখা বা বাতিলিদের দেখা। সে দেখা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

মহাত্মা সুলতান মাহমুদের ভারত-বিজয়কে সেই প্রেক্ষিতে এবং সেই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। আর উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের অবদানকে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে তো বটেই ; তাঁর সভাপণ্ডিত আল বিরুনীর জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়েও দেখতে হবে। কেননা, সুলতান মাহমুদ যে মহান গুণী ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির

অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর প্রতিভা চয়নের ক্ষমতা দেখেও অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়। একদিকে ফারসি সাহিত্যের অমর কবি ফেরদৌসীও যেমন তাঁর চয়ন, তেমনি আল বিরুনীও তাঁরই আবিষ্কার। আর তাঁর রাজসভা ? সেখানে তো চাঁদের হাট বসেছিল। দেশি-বিদেশি জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর সে রাজসভা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার এক মহিমান্বিত মিলনমেলা। আর সেই রাজসভা থেকে বিদ্যা ও জ্ঞানের ফুলকি দুনিয়ার দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ যুগের ভাষায় তাঁর রাজসভার গুণী-সমাবেশকে যদি বলি 'তারকা বা নক্ষত্র সমাবেশ' তাহলেও বোধ করি ভুল বলা হয় না। কেননা, মহাকালের মহাকাশে তাঁরা তো উজ্জ্বল তারকারূপেই অবস্থান করছেন আজ হাজার বছর যাবত। সেই তারকাপুঞ্জেরই এক তারকা বরং বলা উচিত ধ্রুবতারা ; তিনি ইরানের আকাশ থেকে এসে ভারতের আকাশে সুউজ্জ্বল ধ্রুবতারা-রূপে নিজের স্থানটি চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তিনি হলেন আবু রাইহান মুহম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী। বিশ্বজগতে যিনি সংক্ষেপে 'আল বিরুনী' নামে চিরপরিচিত ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

আল বিরুনী, ট্রান্স অক্সিয়ানায়, ইরানের সামানীয় বংশের রাজত্বকালে ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খওয়ারিজম-এর এক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম শহরে নয় ; বরং শহরতলিতে হয়েছিল। যে স্থানটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেইটিই তাঁর নাম ও খ্যাতির সঙ্গে এমন বিশ্বপরিচিতি লাভ করেছে যে, সেখানে তাঁর আসল নামটিই যেন হারিয়ে গেছে। 'বিরুনী' হলো ফারসি থেকে আগত একটি শব্দ– স্থানীয় ভাষায় যার অর্থ 'বহিরাগত'। তবে লিপিকরদের লিপ্যান্তরণের ত্রুটির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দটি 'নিরুন' হয়েছে, এই 'নিরুন' আবার সিন্ধু প্রদেশের একটি জায়গার নাম ; ভারত সম্পর্কে তাঁর আত্যন্তিক আগ্রহের কারণে তাঁকে অনেকেই 'নিরুন'-এর অধিবাসী বা ভারতীয় ভেবে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। এটা ভ্রান্তই। প্রকৃতপক্ষে, বিরুন হলো খাওয়ারিজম প্রদেশের একটি জায়গার নাম। আর ঐ 'বিরুন' থেকেই তিনি 'বিরুনী' বা 'আল বিরুনী' নামে পরিচিত হয়েছেন।

আবু রাইহান মুহম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনীর 'কিতাব-আত তাহকিক আল হিন্দ'-এর ইংরেজি অনুবাদক ডক্টর অ্যাডওয়ার্ড সি. সখাউ 'বিরুন' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী তাঁর 'ইসলামিক কালচার' (১ম খণ্ড, ১৯৭২) গ্রন্থে 'আল বিরুনীজ ইন্ডিয়া' শিরোনামের অভিসন্দর্ভে তাঁকে ইরানি বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি একথাও বলেছেন যে, তাঁর পিতামাতা ছিলেন 'বহিরাগত'। কিন্তু আল বিরুনী ছিলেন ইরানি বংশোদ্ভূত মুসলমান। এই গ্রন্থের রচয়িতা ও আজীবন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ আল বিরুনী তাঁর বিশাল রচনাবলিতে 'সবার কথা' বললেও নিজের কথা তেমন কিছুই বলেননি বললেও ভুল বলা হয় না। আর আশ্চর্যের কথা তাঁর সম্পর্কে তেমন বেশি তথ্যও পাওয়া যায় না। তাঁর ধর্মীয় জীবন ও ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও পণ্ডিতদের মধ্যে বিভ্রান্তি বা মতভেদ লক্ষ করা যায়। জনাব হিট্টি তাঁর 'হিস্ট্রি অব দ্য অ্যারাবস' (১৯৬৮, পৃ. ৩৭৭) গ্রন্থে তাঁকে 'শিয়া' ও 'অজ্ঞেয়বাদী'রূপে অভিহিত করলেও তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য মত হলো যে, তিনি ছিলেন ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সর্বমুক্তিবাদী সুন্নি মুসলমান।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ আর সেই সঙ্গে ছিল ব্যাপক পড়াশোনা। বাল্যকাল থেকেই বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতি তাঁর এ আকর্ষণ ছিল। কথিত আছে, মৃত্যুশয্যায় তাঁর এক বিজ্ঞানী বন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাঁকে গণিত সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেন। এতে তাঁর বন্ধু আশ্চর্য হয়ে মৃত্যুশয্যায়ও তাঁর এ আগ্রহ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমার জন্য কি এটাই বাঞ্ছনীয় নয় যে, একটা প্রশ্নের সমাধান জেনে নিয়েই মৃত্যুবরণ করি ? তা কি না জানার চেয়েও শ্রেয় নয় ? এই হলেন আল বিরুনী, জীবনের কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বন্ধু প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে বাইরে বেরুতেই শোকোচ্ছ্বাসের কান্না শুনতে পান।

আল বিরুনী ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত এবং বহুমুখী প্রতিভাধর ও বহু বিষয়ের লেখক। তিনি তাঁর মাতৃভাষাতেও পারঙ্গম ছিলেন। সেই সঙ্গে হিব্রু, সিরিয়ান, সংস্কৃত ও ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক বা লোকমুখে প্রচলিত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। গ্রিক ভাষার জ্ঞান তিনি সরাসরি লাভ করেননি ; তবে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস ও অন্য গ্রিক-পণ্ডিত ও দার্শনিকদের রচনাবলি তিনি আরবি অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করেছিলেন। তাছাড়া আরবি ভাষাই ছিল তাঁর রচনার প্রধান মাধ্যম। তিনি তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই আরবি ভাষায় রচনা করেছেন। সন্দেহ নেই, এ যুগেও যেমন সে যুগেও তেমনি আরবি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম। আর একথা তো সর্বজনবিদিত যে, ভারত-সম্পর্কিত তাঁর মহান গ্রন্থ 'কিতাব-উল-হিন্দ' আরবি ভাষাতেই লেখা।

আল বিরুনীর প্রারম্ভিক জীবনে পশ্চিম-মধ্য এশিয়ায় খুব দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে চলেছিল। সেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপরেও পড়েছিল। তাঁর খাওয়ারিজমে অবস্থানকালে—সেখানকার এক স্থানীয় রাজবংশ—মাইমুনীদের সহায়তায়– ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সামানীয়দের উৎখাত করলে তাঁর জীবনে বিড়ম্বনা নেমে আসে। ফলে, তিনি ওখান থেকে প্রস্থান করে ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবিস্থত জুরজান নামক রাজ্যের শামসুল মাআলি কাবুস ইবনে বাশমগিরের দরবারে গিয়ে আশ্রয় নেন। আল বিরুনী তাঁকে 'আসারুল ওয়াকিয়া আন-ইল-কুরুরুন-আল-খালিয়া' নামক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থটিকে আল বিরুনীর সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়। তারপর গাজি বীর সুলতান মাহমুদ গজনবী (৯৯৯–১০৩০ খ্রি.) ১০১৭ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজম অধিকার করলে আল বিরুনী কিছুদিনের জন্য নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যান। খাওয়ারিজমের রাজদরবারের যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গজনীর রাজসভায় পেশ করা হয় তাঁদের অন্যতম ছিলেন আল বিরুনী। তারপর, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গজনীতে অবস্থান করেন এবং ৪৪০ হিজরি সন মোতাবেক ১০৪৮ বা ১০৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

সুলতান মাহমুদের দরবারে আল বিরুনী কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সম্ভবত, একজন সম্মানিত বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বেত্তা ও পণ্ডিতরূপে সুলতান মাহমুদের দরবারে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল এবং একথাও সত্য যে, সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। আল বিরুনী তাঁর ভারত-সম্পর্কিত ও জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থটি তাঁর রাজত্বকালেই (১০৩০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে) রচনা

করেছিলেন। তাতে তিনি সুলতান মাহমুদের প্রসঙ্গ অতি-সংক্ষেপেই উল্লেখ করেছেন। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মৈত্রীপূর্ণ না থাকলেও তাঁর পুত্র মাসুদের সঙ্গে আল বিরুনীর অতি ঘনিষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আল বিরুনী তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কানুন-আল-মাসুদী-ফিল-হাইয়া-ওয়াল-নুজুম' নামক গ্রন্থটি সুলতান মাসুদের নামে উৎসর্গিত করেন। এ গ্রন্থে তিনি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল বিরুনী তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো সুলতান মাসুদের দরবারেই অত্যন্ত সুখ, সমৃদ্ধি, বৈভব ও প্রশান্তির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন।

গজনীতে প্রবাস-জীবন অতিবাহনকালে ভারত ও ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি আগ্রহান্বিত হন। উল্লেখ্য যে, তাঁর আগে থেকেই ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলি আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভেই অনুবাদ হয়েছিল। এরকম কিছু গ্রন্থের সঙ্গে আল বিরুনী পরিচয় লাভ করেন। একথা তাঁর 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থ থেকেও জানা যায়, তিনি তাতে সংস্কৃত গ্রন্থাবলিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত পরিভাষাগুলোর আরবি লিপ্যান্তরণের ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন। গজনীতে অবস্থানকালে ভারত বিষয়ক গ্রন্থাবলি পাঠের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধাও তিনি লাভ করে থাকবেন। সে সময়ে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারতে রাজনৈতিক মিশন পরিচালনার সময় বহুসংখ্যক কলাকুশলী, যুদ্ধবন্দি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গজনীতে নিয়ে আসা হলে আল বিরুনী তাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ভারত-সম্পর্কিত বিষয়াদির সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচয়লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া পাঞ্জাব সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় আল বিরুনী সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান এবং পশ্চিম-পাঞ্জাবের স্থানীয় ভাষা শিখে নেন। ফারসির মাধ্যমে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলির সঙ্গে পরিচয়লাভ করেন। ডক্টর চ্যাটার্জির মতে, সে সময়ে অনেক স্থানীয় অধিবাসী ফারসি ভাষা জানতেন।

আল বিরুনীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সুলতান মাহমুদের কাছে পরাজিত নৃপতি আনন্দপাল সুলতানি রাজত্বে তুর্কিদের বিদ্রোহের খবর শুনে তাঁকে সহায়তার জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, উভয় রাজদরবারে পারস্পরিক রাজভাষা জানা এবং বোঝার জন্য দোভাষী থাকতেন। তাঁর 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থ পাঠ করে একথাও জানা যায় যে, ভারত ও ইরানে ভারত-সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক জ্ঞানী ও গুণীজনও ছিলেন। যাদের জন্য আল বিরুনী বিভিন্ন পুস্তকের অনুবাদও বিভিন্ন ভাষায় সম্পন্ন করেছিলেন।

আল বিরুনীর জীবন ও সাধনার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, দু'পক্ষেরই প্রতিকূল অবস্থার কারণে তিনি হিন্দুদের কাছাকাছি স্থানে চলে আসেন। আমাদের কাছে এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও তাঁর গ্রন্থপাঠ থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তাঁর একটা আবাল্য আকর্ষণ ছিল ; আর প্রবাসী জীবনকালে ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসার ফলে তা সোনায়-সোহাগা হয়ে ওঠে। সে সময়ে ভারতীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা অনুবাদের মাধ্যমে সহজলভ্য থাকার কারণে তিনি তা ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে তিনি তাঁদের কাছ থেকে মৌখিক তথ্যাবলিও জানতে

পারেন। আর সে যুগে পাঞ্জাব গজনীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণেরও সুযোগ পান। এভাবে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ 'কিতাব-উল-হিন্দ'-এর উপকরণ সংগ্রহের সুবর্ণ অবসর লাভ করেন।

আল বিরুনীর লেখা পুস্তকের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইয়াকুত (১১৭৯-১২২৯ খ্রি.) বলেন, তিনি মার্ভ শহরে খুব ছোট ছোট হরফে লেখা আল বিরুনীর গ্রন্থাবলির ষাট পৃষ্ঠার একটি তালিকা দেখেছিলেন। অন্য এক লেখক বলেন, তাঁর লেখা গ্রন্থাবলির বোঝা একটা উটের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না। এর চেয়েও একটি বিস্ময়কর তথ্য স্বয়ং আল বিরুনীর লেখা তাঁর এক বন্ধুকে দেওয়া পত্রের মাধ্যমে জানা যায়। সে তালিকায় ১১৪টি গ্রন্থের নাম রয়েছে। কিন্তু তা-ও সম্পূর্ণ নয়। এর পরেও আল বিরুনী শেষ জীবনে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় কিন্তু তালিকায় নয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর বিপুল-সংখ্যক গ্রন্থের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে অথবা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। কেবলমাত্র 'আসার-উল-ওয়াকিয়া' ও 'কিতাব-উল-হিন্দ'-এর মুদ্রিত সংস্করণ ও তার ইংরেজি অনুবাদমাত্র পাওয়া যায় আর এর কৃতিত্ব অর্জনকারী ব্যক্তি হলেন জার্মান পণ্ডিত ডক্টর অ্যাডওয়ার্ড সি. সখাউ (১৮৪৫-১৯৩০ খ্রি.)। যিনি বিদ্বানোচিত নিষ্ঠার সাথে এ গ্রন্থদ্বয়কে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে অবশিষ্ট জগতে পরিচিত করিয়েছেন।

অ্যাডওয়ার্ড সি. সখাউ ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই নিউমনস্টর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিটিক ভাষার অধ্যাপক (১৮৬৯) ছিলেন এবং পরে রয়েল ইউনিভার্সিটি অব বার্লিনে প্রাচ্যজগতের ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ ১৮ বছর যাবত 'কিতাব-উল-হিন্দ' পাঠে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি এর পাঠ সম্পাদন করেন। প্রথমে জার্মান এবং পরে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় তার অনুবাদ সম্পাদনও তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্ম। ১৮৭২-৭৩ সালে আরবি পাণ্ডুলিপির এক প্রামাণ্য পাঠ প্রস্তুত করে সখাউ প্রথমে তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে তা আরবি ভাষায় প্রকাশকালে সখাউ পুনরায় গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। মূল আরবি এক পাতা করে ছাপা হচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অনুবাদ করে চলেছিলেন। প্রথমে টীকা-টিপ্পনীসহ ইংরেজিতে দু'খণ্ডে তা লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর, সেই সংস্করণ এক খণ্ডে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ওখান থেকেই প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত দু'খণ্ডের সংস্করণ ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং পূর্বোক্ত এক খণ্ডের সংস্করণ ভারত থেকে (এস. চাঁদ, নয়াদিল্লি) ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ সম্পন্ন করেন শান্তরাম ; ১৯২৭–২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, ইলাহাবাদ থেকে তা প্রকাশিত হয়। এর আরেকটি অনুবাদ সম্পন্ন করেন রজনীকান্ত শর্মা, তা ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে উপরোক্ত স্থান থেকে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আসগর আলী কৃত উর্দু অনুবাদ ১৯৪১-৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'আঞ্জুমান-ই-তরক্কি' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রুশ ভাষায় এর অনুবাদ সম্পন্ন করেন এ. বি. খালিদভ ও ওয়াই. এন. জাভাদোভস্কি ; (পূর্বতন) সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দ থেকে এ. আই. বেলায়েভের সম্পাদনায় ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। এর অনেক কাল পরে এ. বি. এম. হাবীবুল্লাহ মূল আরবি থেকে এর বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। সখাউ-এর ইংরেজি অনুবাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, এ গ্রন্থে

যেভাবে করা হয়েছে, তা সম্পন্ন করেন এন্সলি টি, এম্ব্রি, সেটি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের হিন্দি অনুবাদ সম্পন্ন করেন নূরনবী আব্বাসী। এটি দিল্লির ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেন ভারতের পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর কিয়ামউদ্দীন আহমদ। আমি মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস উপরোক্ত হিন্দি গ্রন্থ থেকে এর বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করি। সম্ভবত, হিংদি সংস্করণ থেকে এটিই প্রথম বাংলা অনুবাদ। এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির বিশেষত্ব হলো আল বিরুনীর দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা, আলোচনা পদ্ধতি, ভারতীয় সমাজ ও তাঁদের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র-বিষয়ে তাঁর রচনার সারাংশ ও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থের সুবিস্তৃত বিষয়াবলিকে আশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন, প্রত্যেকটি অধ্যায়ের নির্দিষ্ট শিরোনাম দিয়েছেন এবং তাতে আবার বিষয়ভিত্তিক উপশিরোনাম যুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থারম্ভ করেছেন ইসলামি নিয়মমাফিক যথারীতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে। তিনি তাঁর বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভৌগোলিক ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম, স্বভাব, প্রকৃতি ও চারিত্রিক ব্যবধান নির্ণয় করে তাঁর অতি দুরূহ ও জটিল অবস্থার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন এবং সাবধানতার সঙ্গে, সহানুভূতিপূর্ণ ও নির্মোহ পর্যবেক্ষণ করেছেন। সাধারণত, বিজাতীয় লেখকদের বিজাতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব ঘটে থাকে, কিন্তু আল বিরুনীর ক্ষেত্রে তা এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলে পরিগণিত এবং বহুল প্রশংসিত।

তিনি তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম অধ্যায়ের মধ্যে ধর্ম ও দর্শন, নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে সমাজ-সংগঠন, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নিয়ম ও মূর্তিকলা, দ্বাদশ, চতুর্দশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে পরিমাপ-বিদ্যা, ওজন ও রসায়ন বা অপরসায়ন, অষ্টাদশ থেকে দ্বি-ষষ্ঠী অধ্যায়ে ভূগোল, বিশ্বসৃষ্টি, জ্যোতিষশাস্ত্র, কালনিরূপণ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়, ত্রি-ষষ্ঠী অধ্যায় থেকে উনাশীতি অধ্যায়ে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে যে, তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিষয় ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এটা তাঁর অমনোযোগিতা মোটেও নয় ; বরং সেটা তাঁর মতে, জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলার এক প্রত্যক্ষ অসুবিধা। আর তাছাড়া, বিষয় হতে বিষয়ান্তরে যাওয়ার সময় বিষয়ের যে পুনরাবৃত্তি ঘটে, পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে তা সমস্যা-নিরূপণে সহায়ক হয়। তাঁর এ পুনরাবৃত্তি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এটা তাঁর মতে, 'শিক্ষা হলো পুনরাবৃত্তিরই সুফল'।

প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয় বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত অথচ সুচারু পরিচয় দিয়ে কিন্তু পরে তাতে আসে বিশাল এবং ব্যাপক বিবরণ এবং সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও তার মাধ্যমে বিষয়টির স্পষ্টকরণ। যে সমস্ত সূত্র বা গ্রন্থ হতে এবং লোকমুখ হতে যে সমস্ত তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা সত্যায়িত না করা পর্যন্ত বা সততার কষ্টিপাথরে যাচাই না করে, তা তিনি গ্রহণ করেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পেয়ে তিনি পরম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'হায় ! হায় !! একই প্রশ্নের কত বিভিন্ন উত্তর ! একমাত্র আল্লাহই সর্বজ্ঞ !'

আল বিরুনীর বিষয়ভিত্তিক আলোচনার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এক-একটি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা ও অধ্যয়ন। যেখানে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাভাব লক্ষ করেছেন, সেখানে তা উপেক্ষা না করে পরম সততার সঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন।

সমাজ-বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজের জাতি-পরিচয়গত বৈশিষ্ট্য, তাদের জাত বিচার, সেই সঙ্গে তাদের ধর্ম, আইন-কানুন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত তাঁর তুলনামূলক আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তাঁর গভীর নির্মোহ ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যুগে যুগে, কালে কালে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতাধররা নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্য প্রতারণামূলকভাবে যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন, আর প্রজাসাধারণ তা অন্ধের মতো কীভাবে মেনে চলতে বাধ্য হয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন এবং অত্যন্ত স্নিগ্ধ আলোচনা করেছেন। কোথাও কারো প্রতি কোনো ঘৃণা ও অবহেলা প্রকাশ পায়নি।

আল বিরুনী ভারতীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতি প্রসঙ্গে 'বিষ্ণুধর্ম' হতে 'শৌনক'-এর এক ঐতিহ্যগত প্রথার উল্লেখ করে বলেছেন যে, সামাজিক রীতিনীতি প্রথায় প্রকৃতির প্রভাব রয়েছে। পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতাই সভ্যতার মূল সূত্র। আর প্রথা ও প্রয়োগের মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।

কিছু কিছু ধর্মীয় ভক্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় আবহাওয়া, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থার বিশেষ অবদান থাকে।

আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উর্ধ্বতন' তত্ত্বের অবতারণা করে দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় যুদ্ধ ও সংগ্রামের ভূমিকা থাকে। এ যুদ্ধ যেমন মানুষে মানুষে সংঘটিত হয় তেমনি প্রকৃতিগতভাবেও যোগ্যতমরাই টিকে থাকে এবং পৃথিবীতে জননোৎপাদনের ধারা তারাই বজায় রাখে।

আল বিরুনীর এ গ্রন্থের অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভারতীয় পৌত্তলিক সামাজের অভিশপ্ত জাতপাত-প্রথা। সেখানে একদল লোক জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণীয় হওয়ার সুবাদে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং জন্মসূত্রে নিম্নবর্ণীয় হওয়ার কারণে আরেক দল নিকৃষ্ট এবং অভিশপ্ত। জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের আশীর্বাদ আর জন্মগত নিকৃষ্টত্বের অভিশাপদগ্ধ যে সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা যেমনি কৌতুকপ্রদ তেমনই জঘন্য অমানবিক। এই অমানবীয় জীবনবিধানের প্রতি নিম্নবর্ণের মানুষদের যে জাহিলি বা অন্ধ আনুগত্য– তা আরও আশ্চর্য ব্যাপার। পৃথিবীর কোনো সভ্য সমাজে এরকম অসভ্য বিধিবিধানের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। আরও অদ্ভুত এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারতীয় হিঁদু সমাজ আজও সেই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা নিজেদের ঠিক ঐরকমই নিকৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে এবং যেন ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিধিবিধান জ্ঞানে তারা নিজেদের জায়গাতেই সন্তুষ্ট ! হা হতোস্মি !! পৌত্তলিকতা ও জাহিলিয়াতের এটাই মহিমা, আর এটাই পরিণতি !!!

মহাত্মা গাজি সুলতান মাহমুদের রাজনৈতিক মিশন এদেশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। পৌত্তলিকতাদগ্ধ ভারতে রাজনৈতিক মিশনের পিছন ধরে ইসলামের একেশ্বরবাদের যে আলো এ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল, তারই পরিণামে এদেশের লক্ষ-কোটি মানুষ পৌত্তলিকতার অভিশাপদগ্ধ জীবন হতে মুক্তিলাভ করে ইসলামের

আলোকধারায় স্নাত হয়। আজকের উপমহাদেশ কোটি কোটি মুসলমানের যে পদচারণায় উন্মুখর তার অন্যতম স্থপতি ছিলেন গাজি বীর সুলতান মাহমুদ।

তৎকালীন যুগের হিঁদু সমাজে বহুবিবাহের যে প্রচলন ছিল, আল বিরুনীর বিবরণে তাও স্পষ্ট। সে সমাজব্যবস্থায়ও ছিল সামাজিক শোষণ ও একচোখা রীতিনীতি। ব্রাহ্মণরা একসঙ্গে চারটে অথচ শূদ্ররা একসঙ্গে একটার বেশি বউ রাখতে পারত না। সামাজিক জীবনেও ছিল সীমাহীন প্রবঞ্চনা।

আল বিরুনী হিঁদুদের সামাজিক ব্যবস্থার যে করাল চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা-ও বিস্ময়কর। অন্য ধর্মের লোকেরা পানির পাত্র স্পর্শ করলে পানি অপবিত্র হয়ে যায়। উচ্ছিষ্ট ও নোংরা বস্তু পতিত হলে সেখানে গো-মল বা গোবর-গোমূত্র দিয়ে লেপা-মোছা করা হয়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, জাত যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে গো-মল ও গো-মূত্র ভক্ষণ করিয়ে তাদের জাতে তোলার ব্যবস্থা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার যে, বর্তমান সভ্য পৃথিবীতে হিঁদুদের মধ্যে এ ব্যবস্থা আজও সমানভাবে প্রচলিত রয়েছে। এর সামান্যতম ব্যতিক্রমও হয়নি। এসব দৃষ্টে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত যে, সে সমাজের মানুষের চেয়ে গোরুর গো-জীবন রক্ষার জন্য মনুষ্যজীবন হননের দৃষ্টান্তও নিতান্ত কম নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতি ও যে জাতির কাছে মানুষের জীবনের চেয়ে গো-জীবনের মূল্য বেশি, সে সমাজে মনুষ্যত্ব ও মানবতার মূল্যটা কেমন তা সহজেই অনুমান করা যায়। নিম্নবর্ণের হিঁদু ও অহিঁদুদের প্রতি তাদের আচরণে তা খুবই স্পষ্ট। এমতাবস্থায় তাদের কাছে মনুষ্যত্ব ও ন্যায় বিচার চাওয়ার ব্যাপারটা কী প্রহসন নয় ? প্রশ্নটা এ কারণেই যে, স্বাধীন ভারতের বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস কিন্তু তাদের সেই পূর্ব-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। খ্রিষ্টান পাদ্রিদের পুড়িয়ে হত্যা ও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা তো এই সেদিনকার কথা। আর জাতপাত, সম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও খুনোখুনি সে তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থে হিঁদুদের নানাবিধ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা চর্চা বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, হিঁদুদের অক্ষর সংখ্যা পঞ্চাশ। তারা ইউনানিদের ন্যায় বামদিক থেকে ডান দিকে লেখেন। আর সেমিটিকরা লেখেন ডান দিক থেকে বাম দিকে।

আল বিরুনী 'ভৈক্ষুকী' নামক একটি ভাষার উল্লেখ করেছেন। যেটি পূর্বদেশে বা পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। ডক্টর সখাউ-এর মতে, তা গৌতম বুদ্ধের ভাষা ছিল। এ ভাষা আঞ্চলিক নয় ; বরং তা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ছিল।

তখনকার যুগের হিঁদুদের নানারকম উৎসব ও পালা-পার্বণেরও উল্লেখ করেছেন আল বিরুনী। সেগুলো এ যুগের মতোই ছিল।

আল বিরুনী মনে করতেন, জ্ঞান কোনো বিশেষ জাতির একান্ত নিজস্ব কোনো সম্পদ নয়। তা আন্তর্জাতিক এবং তাতে সকল জাতি ও সকল মানুষের অধিকার রয়েছে। দেশ-বিদেশের মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদের প্রতি তাঁর ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। এ আগ্রহ ছিল তাঁর উক্ত মানসিকতারই বিশ্বস্ত বহিঃপ্রকাশ।

আল বিরুনী হিঁদুদের জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করলেও তাঁদের মধ্যে পৌত্তলিকতাজনিত জাহিলি ধারণা বা কুসংস্কারের প্রতি তিনি অত্যন্ত ভব্য ভাষায় কটাক্ষ

করেছেন। তাছাড়া ধর্মের নামে ভণ্ডামি, হিঁদু পুরোহিততন্ত্র ও তাদের দ্বারা নীচু-জাতের হিঁদুদের প্রতি ধর্মীয় ও সামাজিক শোষণের বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। হিঁদু রাজা ও পুরোহিতদের লোভ-লালসা, পৌত্তলিকতাজনিত অভিশপ্ত কুসংস্কারের কারণে দেবতার সামনে মানুষ 'বলি' এসব বর্বরোচিত প্রথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া, হিঁদু রাজন্যবর্গের সোনার প্রতি অতিরিক্ত লোভবশত মানব-শিশুকে আগুনে ঝলসানোর বর্বরোচিত হীন মানসিকতার বিবরণ তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া পতিতাবৃত্তি হিঁদু সমাজে একটি বৈধ পেশা– একথাও এ গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি এসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

হিঁদুদের করনীতি, আয়ের বিভাজন-ব্যবস্থা, জাতপ্রথার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত বিধিবিধানের বর্ণনা রয়েছে তাঁর গ্রন্থে। এমনকি জাতের পেশাগত বিভাজনও সবিশেষ লক্ষণীয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, উত্তরাধিকার মনোনয়ন ইত্যাদিও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন আল বিরুনী।

আল বিরুনী অত্যন্ত বিবেকপূর্ণ ও সহানুভূতিসূচক আগ্রহের সঙ্গে হিঁদুদের বিষয়বস্তুকে পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর জ্ঞান ও বিবেচনায় যা নিরপেক্ষ ও সত্য বলে প্রতীত হয়েছে, তা-ই তিনি তাঁর গ্রন্থে অকপটে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ গ্রন্থ অ্যাডওয়ার্ড সখাউ-এর ইংরেজি অনুবাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের হিন্দি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কিয়ামউদ্দীন আহমদ এর সম্পাদন ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেন। গ্রন্থের শেষাংশে তা প্রদত্ত হয়েছে এবং যে সকল গ্রন্থের সহায়তায় টীকা সংযোজন করা হয়েছে, তার একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে, প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যের প্রধান নির্বাহী ও স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাইম সাহেবকে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের খিদমতে পেশ করার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গ্রন্থটি সকলের কাছে সাদরে গৃহীত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করব।

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

সূচিপত্র

প্রাক-কথন : ২১

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ হিঁদুদের সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পর্যালোচনা ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্ সম্পর্কে হিঁদুদের বিশ্বাস ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

'বোধগম্য' ও 'অবোধগম্য' দুই প্রকার পদার্থ সম্পর্কে হিঁদুদের বিশ্বাস ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মের কারণ ও আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মার দশা ও পুনর্জন্মের দ্বারা জগৎ সংসারে তার আসা-যাওয়া ৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন লোক তথা স্বর্গ ও নরকে প্রতিফলের স্থান ৫১

সপ্তম অধ্যায়

ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির স্বরূপ ও সেই পর্যন্ত পৌছানোর পথ ৫৬

অষ্টম অধ্যায়

প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের নাম ৬৪

নবম অধ্যায়

জাতিসমূহ, যাদের বর্ণ বলা হয় তাদের নিম্নতম শ্রেণী ৬৯

দশম অধ্যায়

হিঁদুদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলির মূল উৎস, তাদের একক আইন রদ ৭৪

একাদশ অধ্যায়

মূর্তিপূজার উদ্ভব ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির বর্ণনা ৭৭

দ্বাদশ অধ্যায়

বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য শ্রেণীর দেশীয় সাহিত্য ৮৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হিঁদুদের ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ ৯০

চতুর্দশ অধ্যায়

গণিত-জ্যোতিষ, ফলিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি ও অন্য শাস্ত্র-বিষয়ে হিঁদুদের সাহিত্য ৯৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় পরিমাপ-বিদ্যার বিবরণ ১০৪

ষোড়শ অধ্যায়

হিঁদুদের লিখন-সামগ্রী তাদের গণিত সম্পর্কিত বিষয় ও তাদের বহুবিচিত্র রীতি রেওয়াজের বিবরণ ১০৮

সপ্তদশ অধ্যায়

হিঁদুদের শাস্ত্রসমূহ, যাতে সাধারণভাবে অজ্ঞানতার প্রশ্রয় পাওয়া যায় ১২০

অষ্টাদশ অধ্যায়

তাদের দেশ, তাদের নদনদী, সাগর-মহাসাগর, বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের সীমানা থেকে তাদের দূরত্বের বিবরণ ১২৩

উনবিংশ অধ্যায়

গ্রহসমূহের নাম, রাশি, চাঁদ ও নক্ষত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি ১৩৬

বিংশ অধ্যায়
ব্রহ্মাণ্ড ১৩৯
একবিংশ অধ্যায়
হিন্দুদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণানুসারে আকাশ ও পৃথিবীর বর্ণনা যার উপরে তাদের পৌরাণিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে ১৪১
দ্বাবিংশ অধ্যায়
ধ্রুবতারা সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ১৪৬
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতাদের বিশ্বাস অনুসারে মেরু পর্বতের বর্ণনা ১৪৮
চতুর্বিংশ অধ্যায়
সাতটি দ্বীপ সম্পর্কে পৌরাণিক ধ্যান-ধারণা ১৫০
পঞ্চবিংশ অধ্যায়
ভারতের নদনদী, তার উৎস ও গতিপথ ১৫৪
ষড়বিংশ অধ্যায়
হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আকাশ ও পৃথিবীর আকার ১৫৭
সপ্তবিংশ অধ্যায়
জ্যোতির্বিদ ও পুরাণ রচয়িতাদের মতবাদ ১৬৩
অষ্টবিংশ অধ্যায়
দশটি দিকের পরিভাষা ১৬৫
ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়
হিঁদুদের মতে বাসযোগ্য পৃথিবীর পরিভাষা ১৬৭
ত্রিংশৎ অধ্যায়
লঙ্কা বা পৃথিবীর গম্বুজ ১৭৩
একত্রিংশৎ অধ্যায়
দ্রাঘিমাগত প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন দেশের পার্থক্য ১৭৬
দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়
সাধারণভাবে কাল ও স্থিতিকাল সম্পর্কিত ধারণা ও জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ ১৭৮
ত্রয়োত্রিংশৎ অধ্যায়
দিন বা রাত্রির বিভিন্ন প্রকার ও বিশেষত দিন ও রাত ১৮৫
চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়
অহর্নিশের সময়কে লঘু কণায় বিভাজন ১৮৯
পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়
বিভিন্ন প্রকারের মাস ও বর্ষ ১৯৪
ষষ্ঠত্রিংশৎ অধ্যায়
সময়ের চারটি মাপ যাকে মান বলা হয় ১৯৭
সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়
মাস ও বর্ষ ভাগ ১৯৯
অষ্টাত্রিংশৎ অধ্যায়
সময়ের বিভিন্ন পরিমাণ যাতে দিবস ও ব্রহ্মার আয়ুও অন্তর্ভুক্ত ২০১
ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়
সময়-পরিমাণ, যা ব্রহ্মার আয়ুর চেয়েও বড় ২০২
চত্বারিংশৎ অধ্যায়
সন্ধি, দুই কালান্তরের মধ্যে ব্যবহার ও সংযোগ ২০৩

এক চত্বারিংশ অধ্যায়
'কল্প' চতুর্যুগ' ইত্যাদি শব্দাবলির পরিভাষা ও একের দ্বারা অন্যের ব্যাখ্যা ২০৪
দ্বি-চত্বারিংশৎ অধ্যায়
চতুর্যুগকে যুগে বিভক্তিকরণ ও যুগ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ২০৬
ত্রি-চত্বারিংশৎ অধ্যায়
চার যুগ ও ঐ সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা যার চতুর্থ যুগের অন্তে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২০৭
চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়
মন্বন্তর ২১১
পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়
সপ্তর্ষির তারামণ্ডল ২১২
ষষ্ঠচত্বারিংশৎ অধ্যায়
নারায়ণ, বিভিন্ন যুগে অবতরণ ও তার নাম ২১৪
সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়
বাসুদেব ও ভারত-যুদ্ধ ২১৬
অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়
অক্ষৌহিণীর পরিমাণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ২১৯
ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়
সংবতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২২১
সার্ধশত অধ্যায়
এক 'কল্প' ও এক 'চতুর্যুগ'-এ কতটা তারা-চক্র হয় ২২৮
একপঞ্চাশৎ অধ্যায়
'অধিমাস', 'ঊনরাত্রি' ও 'অহর্গন' শব্দসমূহের ব্যাখ্যা যা দিবসের বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীক ২৩০
দ্বাপঞ্চাশৎ অধ্যায়
সাধারণভাবে অহর্গনের হিসাব এবং বছরের ও মাসের দিনে রূপান্তর ও তার বিপরীত পদ্ধতি ২৩৩
ত্রয়পঞ্চাশৎ অধ্যায়
কালের কতিপয় তিথি অথবা পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য বিশেষ নিয়মানুসারে যে পঞ্চাঙ্গ অবলম্বন করা হয়
অহর্গন অথবা বর্ষের মাসসমূহের বিয়োজন ২৩৫
চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়
নক্ষত্রপুঞ্জের মাধ্যস্থানসমূহের বর্ণনা ২৩৬
পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়
নক্ষত্রপুঞ্জের ক্রম, সে সবের দূরত্ব ও আয়তন ২৩৮
ষটপঞ্চাশৎ অধ্যায়
চন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষ ২৪১
সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়
তারকাপুঞ্জের সূর্য-সাপেক্ষ উদয় ও সে সকল সংস্কার ও অনুষ্ঠান যা এ সময়ে হিন্দুরা করে ২৪৪
অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়
সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা কীভাবে আসে ২৪৬
ঊনষষ্টি অধ্যায়
সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ২৪৯
ষষ্টি অধ্যায়
পর্বণ ২৫২

একষষ্টিতম অধ্যায়
ধর্ম ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সময়ের অধিষ্ঠাতা ও আনুষঙ্গিক বিষয় ২৫৩
দ্বাষষ্টি অধ্যায়
সংবৎসর বা ষষ্ঠাব্দ প্রসঙ্গ ২৫৪
ত্রিষষ্টি অধ্যায়
এমন বিষয় যা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা তাদের আজীবন মেনে চলতে হয় ২৫৫
চতুঃষষ্টি অধ্যায়
ধার্মিক কৃত্য ও রীতি-রেওয়াজ যা ব্রাহ্মণেতর জাতিদের আজীবন পালন করতে হয় ২৬০
পঞ্চষষ্টি অধ্যায়
যজ্ঞ ২৬২
ষষ্ঠষষ্টি অধ্যায়
তীর্থক্ষেত্র দর্শন ও তীর্থযাত্রা ২৬৩
সপ্তষষ্টি অধ্যায়
দান, অর্থোপার্জন ও ব্যয়ের বিধিমালা ২৬৬
অষ্টষষ্টি অধ্যায়
পানাহার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ ২৬৮
ঊনসপ্ততি অধ্যায়
বিবাহ, রজঃস্রাব, ভ্রূণ এবং সন্তান প্রসব ২৭০
সপ্ততি অধ্যায়
মামলা-মোকদ্দমা ২৭৪
একসপ্ততি অধ্যায়
দণ্ডবিধান ও প্রায়শ্চিত্ত ২৭৬
দ্বাসপ্ততি অধ্যায়
উত্তরাধিকার এবং মৃতের অধিকার ২৭৯
ত্রিসপ্ততি অধ্যায়
জীবিত ও মৃত লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার ২৮১
চতুঃসপ্ততি অধ্যায়
বিভিন্ন প্রকারের ব্রত ২৮৪
পঞ্চসপ্ততি অধ্যায়
ব্রতের দিনগুলোর নির্ধারণ ২৮৬
ষষ্টিসপ্ততি অধ্যায়
ব্রত ও আমোদ-প্রমোদের দিন ২৮৭
সপ্তসপ্ততি অধ্যায়
বিশেষরূপে পুণ্যদিবস, শুভাশুভ সময় তথা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনুকূল সময় ২৯২
অষ্টসপ্ততি অধ্যায়
করণ ২৯৫
ঊনাশীতি অধ্যায়
যোগ ২৯৭
অশীতি অধ্যায়
হিন্দু ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত ও ফলিত জ্যোতিষ-সম্পর্কিত তাঁদের গণনা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৯৮
টীকা-টিপ্পনী ৩০৩
টীকায় ব্যবহৃত সহায়ক গ্রন্থাবলির তালিকা ৩১৮

প্রাক-কথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম*

১. পরম্পরা, জনশ্রুতি বা প্রত্যক্ষদর্শন ; ২. বিভিন্ন প্রকারের সংবাদদাতা ; ৩. সততার প্রশংসা।

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার ব্যাপারে জনশ্রুতি বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনের সমতুল্য হতে পারে না। কেননা, প্রত্যক্ষ দর্শনের ক্ষেত্রে দর্শকের দৃষ্টি বস্তুর তত্ত্ব ও যা সে প্রত্যক্ষ করছে তার উপর নিবদ্ধ থাকে। সেখানে সে দেশকালপাত্রকেও প্রত্যক্ষ করে– যেখানে সে নিজেই মওজুদ থাকে। কিন্তু জনশ্রুতির বিশেষ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকলে জনশ্রুতিত্বে বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা যেত। কেননা, চোখে দেখা অস্তিত্ব কেবল প্রত্যক্ষ ও ক্ষণজীবী হয়ে থাকে কিন্তু জনশ্রুতি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, তিনটিরূপে সামিল থাকে। যার ফলে তাকে বিশেষ অর্থে– আছে ও নেই (অর্থাৎ যা লুপ্ত হয়ে গেছে এবং যা আজও প্রকাশ হয়নি) দুইভাবে ভাগ করা যায়। লিখিত সংবাদও এক প্রকার জনশ্রুতি–বরং আমরা একথাও বলতে পারি যে, ঐটিই সর্বোত্তম। যদি এসব চিরস্থায়ী স্মারক লিখিতভাবে বিদ্যমান না থাকত তাহলে আমরা এক-একটি জাতির ইতিহাস কীভাবে জানতে পারতাম ?

কিছু ঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু সংবাদ জানা যায়, যা তর্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক নিয়ম– কোনোটারই বিরোধী নয়। সেক্ষেত্রে তার সত্য মিথ্যার বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে বিবরণদাতার উপর নির্ভরশীল বলে প্রতীয়মান হয়। আর এদের চরিত্রকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার বিদ্যমান বিরোধ, হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈরীভাব। আমাদের উচিত বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণদাতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা।

এদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে–যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা রচনা করে– সে মিথ্যা নিজের পরিবার বা জাতির 'গুণগান করার' উদ্দেশ্যেও হতে পারে। নিজের পরিবার অথবা জাতিকে আঘাত করেও সে এ ধরনের মিথ্যা রচনা

---

*সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আরম্ভ–যিনি অসীম দয়ালু, অতীব কৃপাবান (মূল গ্রন্থে গ্রন্থারম্ভ এভাবেই করা হয়েছে)। –অনুবাদক

করতে পারে। কেননা, এটি তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায়ও হতে পারে। দুটি ক্ষেত্রেই তার ব্যবহার অবাঞ্ছনীয় অর্থলিপ্সা ও দ্বেষভাব দ্বারা প্রভাবিত।

দ্বিতীয়ত, এ লোকেরা হলো তারাই যারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের পছন্দ করে না, এরা এমন লোক যারা কারো দ্বারা উপকৃত হয়েছে অথচ তাদের জন্য মিথ্যা বলে। আবার কারো তারা ঘৃণা করে, কেবলমাত্র সে জন্যই তাদের ব্যাপারে মিথ্যা বলে। তাদের মিথ্যা বলার অন্যতম কারণ থাকে যে, হয়ত অতীতে তাদের মধ্যে কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এরকম বিবরণদাতাদের সন্ধান অনেক অতীত কাল থেকেই পাওয়া যায়। এরাও ব্যক্তিগত অভিরুচি ও শত্রুতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ধরনের ব্যবহার করে থাকে।

তৃতীয়ত, লোকেরা এ জন্যই মিথ্যার আশ্রয় নেয় যে, স্বভাবগতভাবেই তারা নীচ-স্বভাবের লোক যাদের দৃষ্টি সব সময়েই কোনো-না-কোনো লাভের প্রতি নিবদ্ধ থাকে অথবা এরা এমনই স্বার্থের কাঙাল যে, এরা সত্য কথা বলতেও ভয় পায়।

চতুর্থত, এ শ্রেণীর লোকেরা এই জন্যই মিথ্যা বলে যে, মিথ্যা বলাটা তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। এরা মিথ্যা ছাড়া থাকতে পারে না। এদের এই স্বভাবের কারণ হলো এদের চারিত্রিক নিকৃষ্টতা এবং অন্তরাত্মার ভ্রষ্টতা।

সর্বশেষ কারণ হলো এই যে, মানুষ অজ্ঞতাবশত মিথ্যা বলে। হতে পারে, তারা সেই সমস্ত লোকেদের অন্ধ অনুসরণ করে যেমনি তারা তাদের শিখিয়েছে। আজ যদি এ ধরনের মিথ্যুক বিবরণ তাদের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায় যারা কোনো স্মৃতি-বিশেষের প্রতীক বলে গণ্য হয় অথবা কিছু কাল পরে তারা একটি দুটি–সম্প্রদায় অথবা জাতি নির্মাণ করে নেয় তাহলে প্রথম বিবরণদাতা ও তার অনুসারী মিথ্যার আবিষ্কারক ও তার শ্রোতাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যাবে আর যদি তাদের জুড়ে দেওয়া শৃঙ্খলাকে ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম–আমরা যাদের গণনা করেছি–আর সে হলো এমন ব্যক্তি যার থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত।

কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিই প্রশংসার পাত্র যে মিথ্যা থেকে দূরে অবস্থান করে এবং সর্বদাই সত্যের উপর সমাসীন থাকে এবং মিথ্যার কবল থেকেও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

১. ধার্মিক ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর মুসলিম গ্রন্থাবলির দোষত্রুটি ; ২. হিঁদুদের সম্পর্কে যাদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে–ইরানি গ্রন্থাবলির উপর আলোচনা ; ৩. আল বিরুনীকে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার অনুরোধ– তিনি তার পদ্ধতি পেশ করলেন।

আমি যখন একদিন উস্তাদ আবু সোহেল আবদুল মুনইম ইবন-এ আলী ইবন্-এ-নূহ আতিফলিসীর[১] সঙ্গে সাক্ষাৎ করি (আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন), তখন আমি তাঁকে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের[২] উপরে লেখা একটি গ্রন্থের লেখকের ঐ

সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকে ভুল পদ্ধতিতে তুলে ধরার প্রবৃত্তিকে নিন্দা করতে দেখি। কেননা, মুতাজিলাদের সিদ্ধান্তানুসারে 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ' ; কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে লেখক এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যার অর্থ হয় 'আল্লাহ অজ্ঞান' (যেমন, মানুষ অজ্ঞান) আর এভাবে তিনি অশিক্ষিত লোকেদের বিপথগামী করেছেন। আর এরা এই ধারণা করে বসে আছেন যে, 'আল্লাহ জ্ঞানশূন্য'। সুবহান আল্লাহ ! আল্লাহ তো এরকমের অসংখ্য প্রকারের উক্তির অনেক ঊর্ধ্বে। আমি এ প্রসঙ্গে উস্তাদকে বললাম যে, ঠিক এই পদ্ধতি ঐ লোকেদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, যারা এরকম ধার্মিক ও দার্শনিক পদ্ধতির ইতিবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করছে, যার ফলে কিছু মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে অথবা যারা তার ঘোর বিরোধী...।

নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করবার জন্য উপস্থিত লোকেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হিঁদুদের ধর্ম ও চিন্তাধারার উল্লেখ করলেন। তারপর আমি এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বললাম, আমাদের সাহিত্যে যা কিছু পাওয়া যায় তা অপ্রত্যক্ষ তথ্য, যা একজন অন্য জন থেকে নকল করে দিয়েছেন। সে সব উপকরণ মিলেমিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যা আলোচনার জন্য উদ্ধৃত করাও কষ্টকর। এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আমি একজন মাত্র লেখককে জানি, যিনি তাঁর রচনায় কোনো বিদ্বেষ ও পক্ষপাতকে স্থান না দিয়ে এসব বিষয়ে সরাসরিভাবে সত্য এবং সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, ইনি হলেন আবুল আব্বাস আল ইরান শহরী।[৩] তাঁর সমকালীন কোনো ধর্মেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাঁর স্ব-প্রবর্তিত ধর্মমতকে একাই অনুসরণ করে চলতেন এবং তাই-ই প্রচার করতেন। তিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মমত ও সেই সঙ্গে 'তওরাত' (মুসা সংহিতা) ও 'বাইবেল'-এর অদ্ভুত এক পাঠ নিরূপণ করেছেন। এ ছাড়া তিনি মানিকিবাদীদের ও অতীতের ঐ সকল অপ্রচলিত দর্শনগুলোর উৎকৃষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু যখন তিনি তাঁর গ্রন্থে হিঁদু ও বৌদ্ধদের সম্পর্কের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হলো এবং পরে তো সম্পূর্ণই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এবং তিনি জারকানিদের গ্রন্থ[৪] প্রসঙ্গে এসে পড়লেন যার বিষয়বস্তু তিনি তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আর জারকানিদের কাছ থেকে তিনি যা গ্রহণ করেননি তার সবটাই তিনি নিজে হিঁদু ও বৌদ্ধদের মধ্যেকার সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে শুনে নিয়েছেন।

কালান্তরে উস্তাদ আবু সোহেল ঐ গ্রন্থগুলো পুনরায় অধ্যয়ন করেন এবং তা তিনি আমার বর্ণনা মতোই অনুভব করেন। তখন তিনি আমাকে বলেন, হিঁদুদের সম্পর্কে তুমি যা কিছু জান তা লিখে রাখ যাতে তা ঐ লোকেদের জন্য সহায়ক বলে বিবেচিত হয় যাঁরা হিঁদুদের সঙ্গে ধর্মীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনায় উপনীত হতে চান এবং পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় করতে চান। তাঁদের খুশি

করার জন্য আমি এসব করেছি এবং হিন্দুদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেছি যাতে আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের বিরোধিতা করেন এবং অযৌক্তিক অপপ্রচারে লিপ্ত হন। আর সেই সাথে আমি যেখানেই একথা মনে করেছি কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন, তখন আমি সে বিষয়টি প্রতিপাদনের জন্য তাদের ভাষাতেই তা করেছি যাতে বিষয়টি আরও বেশি বোধগম্য হয়। একজন মুসলমান হিসেবে তা অসঙ্গত মনে না করেই একাজ করেছি। যদি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত এ সব কথাবার্তা মুসলিম-বিরোধী বলে মনে হয় এবং সঠিক পথের অনুসারী মুসলমানদের কাছে তা আপত্তিকর মনে হয় তাহলে আমি কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, হিন্দুরা এটাই বিশ্বাস করে এবং তারা নিজেরাই তাদের রক্ষা করতে সক্ষম।

এ কখনোই কোনো বিতর্কিত গ্রন্থ নয়। আমি আমার বিরোধীদের মতামতকে এ উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করব না যাকে আমি ভ্রান্ত বলে মনে করি এবং তা খণ্ডনও করতে পারি। আমার এ গ্রন্থ তথ্যাবলির সহজ-সরল ঐতিহাসিক নিদর্শন মাত্র। আমি পাঠক সমীপে হিন্দুদের ধ্যান-ধারণগুলোকে ঐভাবেই তুলে ধরব, তাদের সম্পর্কে তারা নিজেরাই যা করেছে। আমি তাদের সম্পর্কে ইউনানিদের সেই ধ্যান-ধারণাগুলোকেও পেশ করব, যেগুলোর সঙ্গে তাদের অনেক মিল রয়েছে, যাতে তাদের উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হতে পারে। কেননা, সেখানে ইউনানি দার্শনিকদের প্রশ্ন, যদিও তারা সিদ্ধান্তের রূপে সত্যের অনুসন্ধান করে, অর্থগত দিক থেকে বাহ্যিক উপলব্ধি ও ধর্ম তথা ন্যায়ের প্রশ্নে তারা কখনো নিজস্ব ধ্যান-ধারণার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। ইউনানিদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া আমি সুফি-সন্ত বা খ্রিষ্টানদের কোনো-না-কোনো সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণাও পেশ করব কেননা পুনর্জন্ম ও সৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের একত্বের ব্যাপারে সর্বেশ্বরবাদীদের মধ্যে যে সব ধারণা প্রচলিত আছে, তাতে এবং এসব ব্যবস্থাবলির মধ্যে অনেক সমতা লক্ষ করা যায়।

আমি প্রথমেই দুটি পুস্তক আরবিতে অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছি, যার একটি সৃষ্টির প্রারম্ভের সমস্ত জীবজগৎ সম্পর্কে লেখা, যেটি 'সাংখ্য'[৫] নামে পরিচিত এবং অন্যটি মানব-শরীরে আত্মার অবস্থান সম্পর্কে লেখা, যেটি 'পাতঞ্জল' নামে পরিচিত। এ দুই পুস্তকে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের অধিকাংশ তত্ত্বই লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু তা থেকে উদ্ভূত সমস্ত ধর্মীয় সিদ্ধান্ত তাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। আশা করি বর্তমান পুস্তকটি পাঠের পর পূর্বোক্ত দুটি পুস্তকসহ অন্য পুস্তকাবলি পাঠের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এই পুস্তকই এ বিষয়ের পর্যাপ্ত পরিচয় দিতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ চাহে তো এ থেকেই তাঁরা পূর্ণ পরিচয় লাভে সমর্থ হবেন।

[পুস্তকের পৃথক পৃথক অধ্যায়গুলোতে আল বিরুনীর সংক্ষিপ্ত সারবস্তু দেখে নিন। পৃষ্ঠাসূচিসহ... পৃষ্ঠাগুলো দেখে নিন।]

আল বিরুনী

ভারততত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ হিঁদুদের সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পর্যালোচনা

মুসলমানদের সঙ্গে হিঁদুদের ভেদভাবের উপকরণসমূহের বর্ণনা, যার কারণে যে কোনো মুসলমানের পক্ষেই যে কোনো ভারতীয় বিষয়ের অধ্যয়ন বড়ই কঠিন প্রতিপন্ন হয়।

নিজের এ বিষয়টির প্রতিপাদনের শুরুতেই আমাদের এ কথা ঠিকমত অনুমান করে নেওয়া উচিত, যা ভারত সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ের গভীর অধ্যয়নে বিশেষভাবে বাধা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত কাঠিন্যের আভাস হয় আমাদের কর্মস্পৃহাকে সহজ করে দেবে নতুবা তা আমাদের নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে তুলে ধরবে– যা আমাদের উভয়েরই রয়েছে। এর কারণস্বরূপ পাঠকদের একথা সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, হিঁদুরা আমাদের থেকে সমস্ত দিক দিয়েই ভিন্ন। তাদের এমন অনেক গূঢ় ও জটিল বিষয় রয়েছে তা যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত তাহলে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে যেত। যে সমস্ত ভেদভাব হিঁদু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে তার অনেক কারণ বিদ্যমান।

প্রথম কারণ : ভাষাগত পার্থক্য ও তাদের জটিল প্রকৃতি

এখানে আমরা সর্বপ্রথমে ভাষাগত পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরব। যদিও ভাষাগত পার্থক্য অন্যান্য জাতির মধ্যেও মজুদ রয়েছে। এই কাঠিন্যকে যদি আপনি জয় করতে চান (অর্থাৎ সংস্কৃত শিখতে চান) তাহলে এটাও আপনার জন্য মোটেও সহজ হবে না। কেননা, এই ভাষার শব্দভাণ্ডার ও রূপ-রচনা দুটিই খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক। এই ভাষায় কিছু কিছু শব্দ আছে ঠিক আরবির মতো, যাতে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ রয়েছে– যার মূল শব্দও রয়েছে আবার বুৎপত্তিও রয়েছে–

আবার বিভিন্ন বিষয়ের জন্য একই শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যা ঠিকমত বুঝতে গেলে এবং তার প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ প্রয়োগেরও দরকার পড়ে। এর কারণ হলো এই যে, কোনো ব্যক্তিই কোনো শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মূল বিষয়টির সঙ্গে সে পরিচিত হবে। এবং একটা বাক্যের পূর্বাপর ভাগের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক রয়েছে তা জ্ঞাত না হবে। হিঁদুদের ভাষা এই ব্যাপকতা ও রহস্য বাস্তবিকই তাদের একটা দোষ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

এ ছাড়া এ ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত– এক. এর একটি উপেক্ষিতা অশিষ্ট ভাষা, যে ভাষায় সাধারণ মানুষেরা কথা বলে। আর অন্যটি হলো শাস্ত্রীয় ভাষা– যা হলো শাস্ত্রীয় ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের মুখের ভাষা। এ খুবই শিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ভাষা এবং তা বৈয়াকরণিক রূপ-রচনা ও বুৎপত্তিগত নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সমস্ত বিষয়ই এ ভাষায় চর্চা হয়।

আরও একটু অগ্রসর হলে দেখা যাবে এর কিছু ধ্বনি (ব্যঞ্জন) যা থেকে ভাষা উদ্ভূত হয়েছে, তা না আরবি আর না ফারসির সমান, আর তা কোনো অবস্থাতেই ঐ দুটি ভাষার মতো মনে হয় না...। সে জন্য যে কোনো ভারতীয় শব্দ নিজস্ব ভাষালিপিতে (আরবি বা ফারসিতে) লেখা খুব কঠিন। কেননা, ঐ সব শব্দাবলির সঠিক উচ্চারণ নিশ্চিতভাবে লেখার জন্য (আরবি-ফারসির) ধ্বনিবিষয়ক বিন্দুগুলোকে (নোকতা বা জের-জবর ইত্যাদি) বদলাতে হবে। আর বিভক্তি চিহ্নগুলোর উচ্চারণ হয় আরবির সাধারণ নিয়মানুযায়ী নতুবা এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ কোনো নিয়মের অনুরূপ করতে হবে।

শুধু তাই নয়, হিঁদু লিপিকাররা বেপরোয়াও হয়ে থাকেন। তারা শুদ্ধ ও সুসংবদ্ধ প্রতিলিপি তৈরি করতে মোটেও পরিশ্রম করেন না। এর পরিণামে লেখকের মানসিক বিকাশ থেকে উদ্ভূত উচ্চতম পরিণাম ফল তাদের অসাবধানতার কারণে মাঠে মারা যায় আর তাদের পুস্তকের প্রথম প্রতিলিপির চেয়ে দ্বিতীয় প্রতিলিপিটি এতটাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় যে, পাঠকালে তাকে সম্পূর্ণই নতুন মনে হয়। তা না কোনো বিদ্যার্থীর বোধগম্য হয় আর না এমন কোনো ব্যক্তির বোধগম্য হয় যারা ঐ বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত, তা সে হিঁদু বা মুসলমান যেই হোক না কেন। আমি যদি পাঠককে এ কথাটি বলি, তাহলে সম্ভবত একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আমি কখনো কখনো হিঁদুদের মুখনিঃসৃত কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ অনেক পরিশ্রমে নিশ্চিত হয়েই তারপর লিপিবদ্ধ করেছি। পরে যখনই ঐ শব্দ তাদের সামনে পুনরায় উচ্চারণ করেছি তখন সে শব্দগুলো চিনতে তাদের অনেক কষ্ট হয়েছে।

সেই সঙ্গে, হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক বইপুস্তকগুলোও বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ রচনা দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা এই অভিপ্রায় থেকেই করা হয়েছে যে, ছন্দোবদ্ধ রচনা কণ্ঠস্থ করতে সহজ হয়, অন্যথায় পুস্তকগুলোতে কোথাও বা প্রক্ষেপ ও কোথাও বা বিলোপনের মাধ্যমে বিকৃত করা হয়। সেই সঙ্গে, তারা তাকেই প্রামাণ্য বলে মনে করে যা কণ্ঠস্থ হতে পারে। লিখিতরূপে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে সে সবের কোনো গুরুত্ব নেই। একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, সব ধরনের ছন্দোবদ্ধ রচনায় এমন সব অস্পষ্ট ও ভারিক্কি শব্দাবলির প্রয়োগ করা হয় যার উদ্দেশ্য কেবল ছন্দের মিল রক্ষা করা আর এক ধরনের সংযোগ রক্ষা করা। আর এ কারণেই কম বেশি শব্দাড়ম্বর সেখানে অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। এটাও একটা কারণ যে, সেখানে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এ সমস্ত বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সাহিত্যিক রচনাবলি ছন্দোবদ্ধ হওয়ার কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন বিশেষভাবে দুরূহ হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় কারণ : তাদের অতীতমুখী ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা

দ্বিতীয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও তারা আমাদের থেকে সর্বথায় ভিন্ন। কেননা, যে কথা আমরা বিশ্বাস করি, সে কথা তারা বিশ্বাস করে না আর তাদের বিপরীতে আমাদের যা বিশ্বাস, তা তাদের নেই। সব মিলিয়ে প্রশ্ন যেখানে ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ক সেখানে তারা খুব জোর বিবাদাস্পদ তর্ক উপস্থিত করে ; যদি তারা কখনো ঝগড়া বিবাদেও লিপ্ত হয় তাহলে সে লড়াই ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ধর্মের প্রশ্নে তারা কখনো নিজেদের আত্মা, শরীর বা সম্পদকে বাজি রাখে না। এর বিপরীতে তাদের ধর্মান্ধতার লক্ষ্য হলো তারাই– তাদের চোখে যারা বিদেশি– অর্থাৎ স্বদেশিরা নয়। তারা বিদেশিদের ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র জ্ঞান করে। তাদের সঙ্গে তারা যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে, তা সে আন্তর্বিবাহ হোক বা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা বা খানাপিনাই হোক। কেননা, তাদের ধারণা, এটা করলে তারা অপবিত্র হয়ে যাবে। বিদেশিরা যা কিছু স্পর্শ করে তাই তাদের কাছে অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়। এমনকি পানি বা আগুনও। অথচ একথা আলোর মতো স্পষ্ট যে, আগুন ও পানি ছাড়া ঘর-গেরস্থালি চলে না। এ ছাড়া তাদের এ প্রবৃত্তি কখনোই হয় না, যে বস্তু এক কথায় অপবিত্র হয়ে যায় তাকে পবিত্র করে পুনরায় ব্যবহার করা হোক। কেননা, সাধারণ পরিস্থিতিতে যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু অশুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে পবিত্র করে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরে পাওয়ার চেষ্টা মানুষ সাধারণত করে থাকে। তারা তাদের

স্বধর্মীয় লোক ছাড়া কোনো ব্যক্তিকেই নিজেদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয় না, তা সে তাদের ধর্মের প্রতি যতই আকৃষ্ট হোক না কেন। এটাও একটা অন্যতম কারণ যে, তারা তাদের সঙ্গে যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক স্থাপনকে সর্বক্ষেত্রেই অসম্ভব বলে মনে করে। এটাই তাদের এবং আমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

তৃতীয় কারণ : তাদের আচার-বিচার ও রীতি-নীতির মূল পার্থক্য

তৃতীয় কারণ এই যে, তাদের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির সঙ্গে আমাদের এত বিশাল পার্থক্য যে, তারা আমাদের বেশভূষা, নিয়মনীতি ও রীতি-রেওয়াজ থেকে তাদের সন্তানদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখে, এমনকি তারা আমাদের রাক্ষস-খোক্কসের জাত বলে অভিহিত করে এবং আমাদের কার্যকলাপকে মন্দ এবং অনুচিত বলে মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা কর্তব্য যে, বিজাতীয়দের প্রতি এ ধরনের ন্যক্কারজনক মনোভাব শুধু আমাদের আর হিঁদুদের মধ্যেই নয় ; বরং সমস্ত জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই মনোভাব বিদ্যমান।

চতুর্থ কারণ

চতুর্থ কারণ এই যে, হিঁদুদের বিজয়ী জাতির প্রতি ঘৃণা তখন বহুগুণে বেড়ে যায় যখন মুসলমানরা তাদের দেশের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। মুহম্মদ ইবন আল-কাসিম ইবন-আল-মুনাব্বা সিজিস্তানের (সাকসাতিন) দিক থেকে সিন্ধুতে প্রবেশ করেন এবং বহমনওয়া ও মূলস্তান নামক নগর দুটি জয় করেন। তিনি প্রথম শহরটির 'আল-মনসুরা' ও দ্বিতীয় শহরটির 'আল-মামুরা' নামকরণ করেন। তিনি ভারতভূমির কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করেন এবং কনৌজ পর্যন্ত অধিকার করেন। সেখান থেকে তিনি গন্ধার অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। ফেরার পথে তিনি কাশ্মিরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই দীর্ঘ পথে তিনি কখনো বা অসি চালনা করেন আবার কখনো বা সন্ধি দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারীদের যেমন গ্রহণ করেন তেমনই প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের স্ব-স্ব ধর্মপালনের অধিকার স্বীকার করেন। এসব ঘটনা তাদের মনের গভীরে ঘৃণার বীজ বপন করে।

মাহমুদ কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও মুসলমানদের বিজয়লাভ

পরবর্তীকালে এমন কোনো মুসলিম-বিজেতার সন্ধান পাওয়া যায়নি যিনি কাবুলের সীমানা ও সিন্ধুনদ অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্যই তুর্কি

আমলে তা সম্ভব হয়েছিল, যখন তিনি গজনীর সামানী বংশের হাত থেকে ক্ষমতা অধিকার করেন এবং নাসিরুদ্দৌলা সবুক্তগীন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। এই রাজকুমার জিহাদকে নিজের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেন এবং সেজন্য নিজেকে 'আল গাজি' (আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী) বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত-রাষ্ট্রের সীমানাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন আর সেই পথ ধরে তাঁর পুত্র ইয়ামিনউদ্দৌলা মাহমুদ ত্রিশ-চল্লিশ বা ততোধিক বছর যাবত ভারতের উপরে নিরন্তর আক্রমণ পরিচালনা করেন। আল্লাহ পিতা-পুত্র উভয়ের উপরেই রহমত বর্ষণ করুন। মাহমুদ দেশের সমৃদ্ধিকে নষ্টভ্রষ্ট করে দেন। আর সেখানে এমন ধুন্ধুমার আক্রমণ চালান যে, তার পরিণামে হিঁদুরা ছিন্নভিন্ন হয়ে ধূলিকণার ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সে কথা জনসাধারণের মুখে অতীতের কাহিনিমাত্র হয়ে রয়ে গেল। তাদের সেই ছিন্নভিন্ন হওয়া উত্তরাধিকারীরা আজও পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে থাকে। এটাও অন্যতম কারণ যে, হিঁদুশাস্ত্র দেশের ঐ সকল স্থান থেকে দূরে চলে গেল যেখানে আমরা বিজয়লাভ করেছিলাম। এ সকল স্থান ত্যাগ করে তারা এমন সব স্থানগুলোতে অর্থাৎ কাশ্মির, বেনারস ও অন্যান্য নগর উপ-নগরে গিয়ে আশ্রয় নিল যেখানে আমাদের বিজয়ের রথ আজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। আর এগুলো হলো সে সমস্ত স্থান যেখান থেকে তারা সমস্ত বিজয়ী জাতির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচার করে যাচ্ছে। আর সেখান থেকে তারা রাজনৈতিক ও ধার্মিক দুরকম শক্তিই অর্জন করছে।

পঞ্চম কারণ : হিঁদুদের অভিযান ও তাদের সমস্ত বিজাতীয় জাতির প্রতি ঘৃণার মনোভাব

পঞ্চম কারণ হিসেবে এমন কিছু বিষয় এসে যায় যার উল্লেখ হাসির খোরাক জোগাতে পারে—তাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মনের গভীরে বিদ্যমান কিন্তু তাদের আচরণ ও ধ্যান-ধারণায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, মূর্খতা এমন একটা ব্যাধি যার কোনো ওষুধ নেই। আর হিঁদুদের বিশ্বাস হলো এই যে, তাদের মতো কোনো দেশ নেই। তাদের মতো না আছে কোনো জাতি, না আছে কোনো শাসক, না আছে কোনো দেশ, আর না আছে তাদের মতো কোনো বিজ্ঞান। তারা দাম্ভিক, আহম্মক, অহঙ্কারী এবং ভাবলেশহীন। তারা যা কিছু জানে, তার সম্পর্কে তারা স্বভাবগতভাবে এতটাই কৃপণ যে, অন্যে যাতে তা জেনে ফেলতে না পারে, তার জন্য তারা খুব সাবধানতা অবলম্বন করে। তারা যা কিছু জানে তা যেন অন্য জাতির নিকট পর্যন্ত

পৌঁছাতে না পারে, সে ব্যাপারে তারা খুব সাবধান থাকে। আর তা কোনো বিজয়ী জাতি পর্যন্ত পৌঁছানোর তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাদের মতানুসারে এ জগৎ-সংসারে তাদের মতো আর কোনো দেশ নেই। তাদের মতো নেই কোনো জাতি এবং তাদের নিকট ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো জাতি নেই যাদের কাছে কোনো রকমের জ্ঞান বা বিজ্ঞান আছে। তাদের দর্পের আর একটা নমুনা হলো এই যে, যদি আপনি তাদের সামনে অন্য কোনো বিজ্ঞান বা খুরাসান ও ইরানের কোনো বিজ্ঞানের নাম উচ্চারণ করেন তাহলে সে আপনাকে শুধু মূর্খ নয়, মিথ্যাবাদী বলেও অভিহিত করবে। যদি তারা নিজের দেশের বাইরে যায় এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে মেলামেশা করে, তাহলে অনতিবিলম্বেই তাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে তারা মনে করে। কারণ, তাদের পূর্বপুরুষেরা এতটা সঙ্কীর্ণমনা ছিল না, যতটা বর্তমান প্রজন্ম।

লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক

এখন ভারতের এটাই বাস্তবিক পরিস্থিতি। আমার বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। যদিও এদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, আর সম্ভবত, সে যুগে আমিই একমাত্র ব্যক্তি, যে সংস্কৃত গ্রন্থাবলি প্রাপ্তির জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। এখানে আমার অর্থোপার্জন বা অন্যান্য লাভালাভের কোনো প্রশ্নই নেই। এখানে আমার সেই ব্যক্তিরই প্রয়োজন, এবং অনেক দূর হতেও এমন হিঁদু পণ্ডিতকে নিয়ে আমার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যিনি বোদ্ধা এবং আমাকে পড়াতে সক্ষম। আর এমন বিদ্যার্থী আর কোথায় পাবে, যার এ সব বিষয় অধ্যয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও রয়েছে ? এমন ঘটনা তো বিরল যাঁকে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন, কিন্তু সে সুযোগ তিনি আমায় দেননি– অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে চলাফেরার প্রয়োজন, সেই পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে আমি বঞ্চিত। আমি সেই পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য কখনোই লাভ করিনি, যা আমার চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে খুবই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হতে পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁর শোকর আদায় করছি আর তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তা আমার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি।

অ-ইহুদি ইউনানিদেরও খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে এমন অনেক মত ছিল, যেমনটি ছিল হিঁদুদের ; তাদের মধ্যেকার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এমন মত প্রচলিত ছিল, যেমনটি হিঁদুদের মধ্যেও আছে ; তাদের মধ্যেকার সাধারণ মানুষেরাও হিঁদুদের ন্যায় মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিল...। কিন্তু ইউনানিদের মধ্যে দার্শনিকও ছিল যারা নিজেদের দেশে সামান্যতম অন্ধবিশ্বাসকেও প্রশ্রয় দেননি ;

বরং তাদের জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন এবং তার সমাধান প্রস্তুত করলেন...। সক্রেটিসের যুগের ঐ সময়ের কথা কল্পনা করুন যিনি তাঁর স্বজাতীয়দের বিরোধিতা করেছিলেন... এবং... সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা রাখতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভে সমর্থ ও আগ্রহী ব্যক্তির সন্ধান হিঁদুদের মধ্যে পাওয়া যেত না। এর কারণ ছিল, হিঁদুদের মধ্যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সাধনগুলো ভিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল ; তাদের ছিল না কোনো যুক্তিসঙ্গত তার্কিক পদ্ধতি। আর সে জন্যই কোনো বিষয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগেই তা হাস্যস্পদ বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে যেত...। তাদের গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র পর্যন্ত সাহিত্যের তুলনা, যে পর্যন্ত আমি নিজে অবগত আছি, তাকে ধুলামাটির সঙ্গে মিশে থাকা ঝিনুক, গোবরের সঙ্গে মিশে থাকা মোতি বা কাঁকরের সঙ্গে মিশে থাকা রত্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাদের দৃষ্টিতে এ দুই ধরনের বস্তু পরস্পরে যে সমান, এ জন্য যে, তারা নিজেদের বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে অক্ষম।

আমি আমার পুস্তকের অধিকাংশ স্থল টীকা-টিপ্পনী ছাড়াই কেবল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছি। আর যেখানে টীকা-টিপ্পনী অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, সেখানে তা দিয়েছি। আমি প্রয়োজনীয় সংস্কৃত নাম এবং পারিভাষিক শব্দগুলোকে একবারমাত্র উল্লেখ করেছি, আর তাও আমার ব্যাখ্যাসম্বলিত সন্দর্ভে যেখানে অত্যাবশ্যক ছিল আর শব্দ 'মূল' হলে এবং তার অর্থ আরবিতে দেওয়া সম্ভব হলে সেখানেই মাত্র আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছি ; আর বহুল প্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলোকে মূলরূপেই লিপিবদ্ধ করেছি এবং তার শুদ্ধ লিপ্যান্তরণের চেষ্টাও করেছি। যদি শব্দ গঠন বা ব্যুৎপন্ন হয় কিন্তু তার সাধারণ প্রয়োগও হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও তাকে অক্ষত অবস্থায় রেখে দিয়েছি, তা তার প্রতিশব্দ আরবিতে থাক বা না থাক। কিন্তু তার প্রয়োগের পূর্বেই আমি তার অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছি।

উপসংহারে আমার সিদ্ধান্ত যে, আমরা আমাদের চর্চিত বিষয়ে সাধারণত জ্যামিতিক পদ্ধতি কঠিনভাবে অনুসরণ করতে পারি না। যা কিছু আগে আসে তার উদ্ধৃতি তো পেশ করিই ; কিন্তু যা পরে আসে তার নির্দেশ কখনো দিতে পারি না। উদাহরণত, পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে কখনো বা অজ্ঞাত কোনো ঘটকের উল্লেখ করতে হয়েছে, যার ব্যাখ্যা পুস্তকের অন্য কোনো অধ্যায়ে দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ সাহায্য করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহ্ সম্পর্কে হিঁদুদের বিশ্বাস

আল্লাহর স্বরূপ

প্রত্যেক জাতির শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য লক্ষ করা যায় ; কেননা, শিক্ষিত লোকেরা অমূর্ত বিষয়কে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে এবং সাধারণ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করে আর অশিক্ষিত লোকেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গৌণ সিদ্ধান্ত থেকেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। ঐ সমস্ত বিবরণ সম্পর্কে তারা কোনো আগ্রহও দেখায় না, বিশেষত, ধর্ম-সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্নে, যার সম্পর্কে লোকেদের মত ও তাদের ভালোমন্দের বিষয়টি পৃথক। আল্লাহ সম্পর্কে হিঁদুদের বিশ্বাস, তিনি শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত, স্বেচ্ছাধীন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, জীবন্ত, জীবনদাতা, নিয়ন্তা, রক্ষাকর্তা ; তিনি সেই যার প্রভুসত্তা অনন্য, তিনি অদৃশ্য, তিনি কারো মতো নন, আর কেউ তার মতো নয়। এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমি তাদের সাহিত্য থেকে কিছু উদাহরণ পেশ করব, যাতে পাঠক একথা মনে না করেন যে, আমার বিবরণ কেবলমাত্র জনশ্রুতি নির্ভর।

['পাতঞ্জল',[৬] 'গীতা'[৭]–'ভারত' সম্পর্কিত এ গ্রন্থের সেই অংশ যেখানে অর্জুন ও বাসুদেবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে–এবং 'সাংখ্য' নামক গ্রন্থের উদাহরণ... দেওয়া হয়েছে।

এই পদ্ধতি আল বিরুনী পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেও অনুসরণ করেছেন। প্রথমে তো তিনি কোনো বিশেষ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তের বিবরণ দিয়েছেন এবং পরে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলি হতে সংগত উদাহরণ পেশ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি দার্শনিক ও সুফিদেরও ঐ প্রকারের চিন্তাধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।]

কর্ম ও কর্তা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত

হিঁদুদের মধ্যে কর্মের পরিভাষা সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈশ্বরকেই একমাত্র কর্মকর্তা বলে বিশ্বাস করেন, তা তাঁর সার্বভৌম সত্তার

কারণেই, কেননা, কর্তার অস্তিত্ব কেবলমাত্র কর্মের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। আর এরই ফলস্বরূপ, তাঁরই মাধ্যমেই সমস্ত কর্মসংঘটিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকেরা কর্মকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে স্বীকার করেন না ; বরং অন্য উৎস বলে মনে করেন এবং এই বৈশিষ্ট্য হেতু তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর তাঁর বাহ্যিক প্রেক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মকেই মাত্র জন্ম দান করেন।

আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক ও অশিষ্ট ধারণাসমূহ

শিক্ষিত লোকেদের আল্লাহ সম্পর্কে এইটাই বিশ্বাস। তারা তাঁকে 'ঈশ্বর' অর্থাৎ আত্মনির্ভর বলে অভিহিত করেন। তিনি নিস্পৃহ, কৃপাশীল এবং দাতা, তিনি কিছু নেন না। তারা ঈশ্বরের একত্বকে নিরপেক্ষ বলে মনে করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের এটাও ধারণা যে, ঈশ্বর সম্পর্কে ঈশ্বর-এর বা যা কিছু একত্ব বলে মনে হয় বাস্তবে তা একই বস্তুর অনেকরূপ মাত্র। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই যথার্থ অস্তিত্ব বলে মনে করেন। কেননা, প্রত্যেক পদার্থ, যার বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে তা তারই কারণেই অস্তিত্বশীল। একথা অনুভব করা অসম্ভব নয় যে, বিদ্যমান প্রাণী 'নেই' এবং তা 'আছে' কিন্তু একথা অনুভব করা অসম্ভব যে, তিনি 'নেই' এবং তিনি 'আছেন'।

অতএব, যদি আমরা, হিঁদুদের মধ্যেকার শিক্ষিত লোকেদের ধ্যান-ধারণা থেকে জনসাধারণের ধ্যান-ধারণার তুলনা করি তাহলে প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভালো যে, তাদের মধ্যে বিশ্বাসের ভিন্নতা রয়েছে। তাদের কিছু বিশ্বাস তো অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ ; কিন্তু এ ধরনের ভুল অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও রয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের মধ্যেও কিছু বিষয়কে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে, যেমন– মানবতাবাদী সিদ্ধান্ত, জবরিয়া[১] সম্প্রদায়ের শিক্ষাবলি, ধার্মিক বিষয়ে চর্চা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং এরকম বিবিধ বিষয়। ধর্ম-সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বাক্যের, যা সাধারণ লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার শব্দচয়ন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করা উচিত, যেমনটি নিম্নলিখিত উদাহরণ এর সাহায্যে পেশ করা হয়েছে। কোনো হিঁদু পণ্ডিত আল্লাহকে এক বিন্দু সমান বলে অভিহিত করেছেন। এই অভিপ্রায় হলো শরীর সম্পর্কিত কোনো বিশেষত্ব তাঁর উপর আরোপিত হয় না। এই বাক্যটি যখন কোনো অশিক্ষিত লোকে পড়ে তখন সে একথা বুঝে বসে থাকে যে, ঈশ্বর একটি বিন্দুর সমান সূক্ষ্ম। সে একথা বোঝার চেষ্টাও করে না যে, এই বাক্যে বিন্দু শব্দের প্রয়োগ কী উদ্দেশ্যে (অভিপ্রায়ে) করা হয়েছে। তা এই ঘৃণিত তুলনা ঐ আকার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না ; বরং আল্লাহকে আরও কিছু বড় করে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন– 'তিনি বারো আঙুল লম্বা এবং চার আঙুল চওড়া।' সুবহান আল্লাহ ! তিনি তো মাত্রা এবং সংখ্যার

অনেক উর্ধ্বে। এ ছাড়া যদি কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি এসব শোনে, যাদের কথাও আমরা চর্চা করছি, ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনই ব্যাপ্ত যে, তার কোনকিছুই গোপন নেই, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ কল্পনা করে নেবে যে, এ কেবল ব্যাপ্তি দৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব ; আর দৃষ্টি কোনো নেত্রঘটিতই হয়ে থাকে, আর নেত্র যদি একটি ছাড়া দুটি হয় তাহলে ভালো এবং পরিণামত সে ঈশ্বরকে সহস্র লোচনধারী বলে মান্য করবে, কেননা, তা থেকেই তাঁর সর্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

এরকম বীভৎস সব কপোল-কল্পনা হিঁদুদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আর বিশেষত, তা ঐ সমস্ত জাতির মধ্যেই দেখা যায় যাদের জন্য শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ এবং যাদের সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

‘বোধগম্য’ ও ‘অবোধগম্য’ দুই প্রকার পদার্থ সম্পর্কে হিঁদুদের বিশ্বাস

আদি কারণ সম্পর্কে ইউনানি ও সুফি দার্শনিকদের মতবাদ

যে যুগে দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়নি সে যুগে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে হিঁদু ও ইউনানিদের মতামতের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। সে যুগে ইউনানিদের দর্শন তথাকথিত (সাতটি ‘বুদ্ধি স্তম্ভ’-এর তত্ত্বাবধানে) গুরুত্ব লাভ করেছিল, যেগুলোর নাম ছিল এরকম : এথেন্সের সোলান, প্রিয়েনের ব্যাস, কোররিথ-এর পেরিওন্ডার, মিলেতাসের সালিস, লেসিডেমোন-এর কিলোন, লেসবোস-এর পিটেকস, লিন্ডোস-এর ক্লিও বিউলাস ও তাদের পরবর্তী দার্শনিক সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যেকার কিছু দার্শনিকের মত ছিল যে, সব পদার্থ এক আর এই পদার্থ কিছু লোকের মতানুসারে ‘টু লেনথানিয়েন’ আর অন্য কিছু লোকের মতে তা ছিল ‘হি ডিউনামিস’ ; উদাহরণস্বরূপ, পাথর বা সচেতন জগতের তুলনায় মানুষের এটাই একমাত্র পরমাধিকার। আর তা তাদের তুলনায় আদি কারণের অধিক নিকটবর্তী। আর যদি তা না হতো তাহলে এসবের অবস্থা তাদের তুলনায় বেশি ভালো হতো না।

অন্য কিছু লোকের মত যে, বাস্তবিক অস্তিত্ব কেবল আদি কারণের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কেননা, কেবলমাত্র সেই-ই স্বাবলম্বী অর্থাৎ কারো মুখাপেক্ষী নয়, যেখানে আর সব বস্তুই তার মুখাপেক্ষী। যে কোনো বস্তু, যে তার নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয় তখন তার জীবন হয় স্বপ্নের মতো, যথার্থ নয়। আর এই যথার্থ কেবল সেই ‘এক’ এবং আদি জীব (আদি কারণ)।

সুফি শব্দের ব্যুৎপত্তি

এই সিদ্ধান্ত সুফি অর্থাৎ মনীষীদেরও, কেননা, ইউনানি ভাষায় ‘সুফ’ শব্দের অর্থ ‘প্রজ্ঞা’ (সোফিয়া)। কারণ এটাই যে, ইউনানি ভাষায় ফিলোসফার (দার্শনিক)-কে

পিলোসোপা (ফিলোসোফস) অর্থাৎ প্রজ্ঞাও বলা হয়। যখন ইসলামে লোকেরা এসকল দার্শনিকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তারা এই নামই গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু লোকের কাছে এই শব্দটি বোধগম্য না হওয়ায় ভুলবশত আরবি 'সফা' শব্দটি এর সঙ্গে জুড়ে দেন, মানে সুফি (ইউনানি ফিলোসফাই) ও তথাকথিত 'আহল-উসসুফফা' যারা মুহম্মদের* সাথি ছিলেন তাঁরা ও এঁরা একই। কালান্তরে ভুল ব্যবহারের কারণে এই শব্দ বিকৃত হয়ে যায় আর গত্যন্তর না দেখে এই শব্দটি 'সুফ' থেকে ব্যুৎপন্ন বলে গণ্য করা হয় (সুফ-এর শাব্দিক অর্থ ভেড়ার পশম)। আবু ফাত্হ আল বুস্তানি* একে ভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষার জন্য প্রশংসনীয় প্রয়াস চালান এবং বলেন, 'প্রাচীন কাল থেকে লোকেদের মধ্যে সুফি শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ চলে আসছে এবং তারা এর ব্যুৎপত্তি 'সুফ' (অর্থাৎ পশম) শব্দ বলে স্বীকার করে আসছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই শব্দটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমি এমনই এক নবযুবক বলে মনে করি যিনি সাফি বা পবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই 'সাফি' ঐ সুফি হয়ে গেছে আর এই রূপেই এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের নামে (অর্থাৎ সুফি) সুপরিচিত হয়ে গেছে।

এই ইউনানিদের মধ্যেও এ ধারণাও প্রচলিত যে, জগৎ একটাই এবং আদি কারণগুলো এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে পরিলক্ষিত হয়। আদি কারণগুলোর শক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জগতের অঙ্গগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে, যার কারণে জাগতিক পদার্থগুলোর মধ্যে এক প্রকারের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায় তা সে মূলরূপে যতই একত্বভাবে অধিষ্ঠিত থাক না কেন।

তাঁদের মধ্যেকার আরও কিছু লোকের মত ছিল, যা কিছু তার নিজের আদি কারণের প্রতি উন্মুখ হয় এবং যতই তার মতো হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তা অন্তর্বর্তী অবস্থাকে অতিক্রম করে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে 'তার' সঙ্গে 'একাকার' হয়ে যাবে। ধর্মীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমরূপ ধারণা পোষণের কারণে সুফিদের মধ্যেও এই মতবাদ প্রচলিত ছিল।

আত্মা ও প্রেতাত্মার ব্যাপারে ইউনানিদের মতবাদ হলো শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার আগে তার নিজের একটা স্বাধীন সত্তা থাকে। তারা বিশেষ সংখ্যা এবং রূপে অবস্থান করে এবং তা পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রূপে মিলেমিশে অবস্থান করে, তারা একে অন্যের মধ্যে পরিচিত অপরিচিত–দুটি রূপেই অবস্থান করে। তারা শরীরের মধ্যে বসবাস করার সময় স্বেচ্ছাকৃত কর্ম দ্বারা এমন এক

---

*মুহম্মদ (সা.)-এর সাথিদের এক বচনে সাহাবি ও বহুবচনে সাহাবা বলা হয়। এই পবিত্র নাম উচ্চারণ ও শ্রবণের সাথে সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য কর্তব্য। – অনুবাদ

ভাগ্য লাভ করে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা তারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিভিন্নভাবে জগৎ সংসারের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে। এ কারণে তারা তাদের দেবতা বলে অভিহিত করে, তাদের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আবার তাদের উদ্দেশে বলিও দেয়।

ইউনানিরা সাধারণত ভব্য, সভ্য ও শ্রেষ্ঠ বস্তুর উপর দেবত্ব আরোপ করে থাকে, যেমনটি আরও অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। এমনকি, তারা তো পাহাড়-পর্বত. নদী-সমুদ্র ইত্যাদির উপরেও দেবত্ব আরোপ করে থাকে। দ্বিতীয়ত, এবং বিশেষ অর্থে, 'দেবতা' শব্দটি ব্যবহার করে, এর আদি কারণ দেবদূত ও তাদের আত্মাদের জন্যও তা করে থাকে। আর তৃতীয়, প্রচলিত অর্থে প্লেটো দেবতাদের 'সেকিনাত' (মুসায়ী) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে নির্বাচনকর্তাদের দ্বারা প্রযুক্ত শব্দ যথার্থ নয়, এর ফলে আমরা তো তাদের নাম জানতে পারি কিন্তু অর্থ বুঝতে পারি না।

আরবি, ইবরানি ও সিরীয় ভাষায় ঈশ্বর নামের পার্থক্য

কিন্তু এমন কিছু অভিব্যক্তিও আছে যা এক ধর্মের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও অন্য ধর্মের কাছে তা আপত্তিকর। তা এক ভাষায় গ্রাহ্য কিন্তু অন্য ভাষায় ত্যক্ত। এই শ্রেণীর অন্তর্গত একটি শব্দ হলো 'অপোথিওসিস' (দেবত্বারোপ), যা মুসলমানদের কাছে খুবই আপত্তিকর। যদি আমরা আরবি ভাষায় দেবতা শব্দের প্রয়োগ নিয়ে বিবেচনা করি তাহলে আমরা জানব যে, এরকম একটি শব্দের অর্থ হবে 'পরমসত্য' অর্থাৎ তার দ্বারা আল্লাহকেই বোঝাবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রাণীদের সম্পর্কে যে কোনো শব্দই প্রয়োগ করা যেতে পারে কিন্তু প্রশ্ন যেখানে 'আল্লাহ' সম্পর্কিত, সেখানে সে শব্দটি কেবলমাত্র 'আল্লাহ' শব্দের প্রতিশব্দরূপে খোদা বা ঈশ্বর শব্দটিই মাত্র প্রযোজ্য হতে পারে ; আর এটাই হলো তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম।

যদি আমরা এই শব্দটি ইবরানি বা সিরীয় ভাষাতে প্রয়োগ করে তার অর্থ নিয়ে আলোচনা করি, যা কুরআনের পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে আমরা অবগত হব যে, 'তওরাত' ও তার পরবর্তীকালে আগত নবীদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলি, যা 'তওরাত' এর সমকক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়, সে সব গ্রন্থাবলিতে 'রব' (বা মালিক) শব্দটি আরবি 'আল্লাহ' শব্দের সমার্থক, কিন্তু সম্বন্ধকারক রচনায় এ শব্দটি 'ঈশ্বর' ছাড়া আর কোনো কিছুর জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে না ; আর 'বাড়ির মালিক' 'জমির মালিক' (যা আরবিতে স্বীকার্য) ইত্যাদি অর্থে 'রব' শব্দটি প্রযুক্ত হতে পারে না।

'ঈশ্বর' শব্দটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে দেখতে পাব যে, 'পিতা' ও 'পুত্র' প্রসঙ্গেও তা প্রযুক্ত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একথা বলে নেওয়া আবশ্যক যে, ইসলাম এসব শব্দাবলির ব্যবহার বা প্রয়োগে মোটেও উদার নয়। কেননা, আরবিতে 'ইবনে' শব্দের অর্থ হয় 'পুত্র' আর 'ওয়ালিদাইন' (মাতাপিতা) তথা 'বিলাদত' (সন্তান) এর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোনো শব্দই 'রবুবিয়াত' (ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব) এর অর্থে প্রযুক্ত যা ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য ভাষা এ দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকটাই স্বাধীন। কেননা, যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে 'আব' (পিতা) বলে সম্বোধন করে তাহলে তার অর্থ এমনটাই হয়, যে তাকে 'সৈয়দ' (শ্রীমান) বলে সম্বোধন করে। যেমন, সকলেই অবগত আছেন যে, এ ধরনের শব্দের ব্যবহার খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, কোনো ব্যক্তিই কাউকে সম্বোধন করার সময় 'আব' (পিতা) বা 'ইবনে' শব্দটির প্রয়োগ করে না বললেই চলে। আর সম্ভবত, 'ইবনে' বা পুত্র শব্দটিকে তারা নিজেদের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করে থাকে। তাদের কাছে পুত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ যিশু বলেই জ্ঞাত। কিন্তু তারা এর প্রয়োগ যিশু ছাড়াও অন্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে।

[আল বিরুনী মানিকিবাদীদের ঈশ্বরের উপর মানবীয় রূপ আরোপেরও উল্লেখ করেছেন এবং এর পরে হিঁদুদের প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা নিয়েও আলোচনা করেছেন। দ্রঃ সপ্তম অধ্যায়, উপশিরোনাম মোক্ষ বিষয়ে সাংখ্য দর্শনের ভাষ্য।]

শিক্ষিত হিঁদুদের এ ধরনের ঈশ্বরের উপর মানুষিকরূপ আরোপকে ঘৃণা করেন কিন্তু তাদের মধ্যেকার সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তা ব্যাপকভাবে চর্চা করে। এরা তারাই, যাদের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যারা ঈশ্বরের স্ত্রীপুত্রকন্যাদি আছে বলে বিশ্বাস করে এবং গর্ভধারণ ও সমস্ত রকমের শারীরিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করে। এরা এমনই ধর্মান্ধ যে, এ ধরনের কথাবার্তা বলার সময় তারা নিজেদের হাস্যকরভাবে মূর্খ বলে পরিচয় দিতে এবং অশোভন ভাষা প্রয়োগ করতে মোটেও কোনো সংকোচবোধ করে না। কিন্তু এদের এবং এদের ধ্যান-ধারণার প্রতি কেউ কখনো কোনো মনোযোগ দেয় না তো তাদের সংখ্যা কম-বেশি যাই হোক না কেন। হিঁদুদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মূল উৎস হলো ব্রাহ্মণেরা, তারা যা বলে, তাই তারা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে এবং বোঝে ; কেননা, তাদেরকেই তাদের ধর্মকে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়। এই হচ্ছে তাদের ধর্মানুসন্ধানের মূল উৎস, যা আমরা পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব, অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের বিশ্বাস।

পুরুষ

১. হিঁদুরা অস্পষ্ট সংকেতের চেয়ে শুদ্ধ ও স্পষ্ট পরিভাষা দ্বারা আত্মাকে **'পুরুষ'** বলে অভিহিত করেন। কেননা, তাঁদের মতে, বর্তমান সংসারে তিনিই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ। জীবনই এমন একমাত্র জ্ঞান যা আত্মার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। তাদের ধারণা, আত্মার মধ্যে জ্ঞান ও অজ্ঞান পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করে। প্রত্যক্ষভাবে, অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে জ্ঞানের সম্ভাবনা থেকে যায় এবং অজ্ঞান অবস্থায় জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টায় রত থাকে। পুরুষের অনভিজ্ঞতা কর্মের অস্তিত্বের কারণ এবং তার অভিজ্ঞতা কর্মের অন্তের কারণ।

অব্যক্ত

২. এর পরে আসে সাধারণ পদার্থ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্ব যাকে তারা অব্যক্ত বা নিরাকার বলে অভিহিত করে। এটি জড় কিন্তু এর তিনটি শক্তি আছে, যাকে সত্ত্ব, রজস ও তমস্ বলা হয়। বাস্তবে তো নয় কিন্তু সম্ভবত বিদ্যমান থাকে। আমি শুনেছি যে, বুদ্ধোধন[১০] তাঁর অনুচর শ্রমণদের সামনে ভাষণ দানের সময়, এগুলোকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ বলে অভিহিত করেছিলেন, অর্থাৎ এগুলোই 'বুদ্ধি', 'ধর্ম' ও 'অজ্ঞান'। প্রথম শক্তি সুখস্বস্তি ও শান্তি আর এ থেকেই বুদ্ধির বিকাশ হয়। দ্বিতীয়টি হলো (উদ্যোগ ও শান্তি-এ থেকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আসে। তৃতীয়টি হলো) উদাসীনতা ও অনিশ্চয়তা যার পরিণাম বিধ্বংস ও বিনাশ। অতএব, প্রথম শক্তি দেবতাদের সঙ্গে, দ্বিতীয় শক্তি মানুষের সঙ্গে এবং তৃতীয় শক্তি পশুদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব কথা 'পূর্বে' (আরও), 'পরে' (পরে) এবং 'তারপর' (সর্বশেষে)-এর উল্লেখকালে সময় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে তা করা হয় না ; বরং এক সামান্য ক্রম বলে অভিহিত করতে এবং তা ভাষায় প্রকাশ করতে অসমর্থ হওয়ার কারণে করা হয়।

ব্যক্ত ও প্রকৃতি (অব্যক্ত)

৩. 'ডিউনোমিস' থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন আকারে এবং 'তিন' মূল শক্তির সঙ্গে 'প্রাকসিস' পর্যন্ত পৌঁছানো পদার্থকে ব্যক্ত অর্থাৎ সাকার বলা হয় এবং নিরাকার তত্ত্ব ও সাকার পদার্থকে প্রকৃতি বলা হয়।

কিন্তু আমাদের জন্য এ শব্দের কোনো অর্থ নেই ; আমরা কোনো নিরাকার পদার্থের চর্চা করতে চাই না, আমাদের জন্য পদার্থ পর্যায়ে শব্দের প্রয়োজন, কেননা, পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

অহংকার

৪. এর পরে আসে স্বভাব, যাকে 'অহংকার' বলে। এই শব্দের বুৎপত্তি 'অভিভূত' করা, 'বিকশিত করা', 'আগ্রহান্বিত করা' ইত্যাদি ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা, পদার্থ যখন আকার ধারণ করে বস্তুকে নতুন রূপে বিকশিত করে আর এই বিকাশ 'বাহ্য' অথবা বিজাতীয় তত্ত্বগুলোকে পরিবর্তন করে তখন সেগুলোকে বিকশিত ও অঙ্গীকৃত করে নেয়। অতএব, এগুলো এরকম, মানে 'স্বভাব' 'অন্য' অর্থাৎ বিজাতীয় তত্ত্বগুলোকে পরিবর্তন করে এই প্রক্রিয়াকে অভিভূত করছে এবং যা কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেগুলোকে বশীভূত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মহাভূত

৫–৯ স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক যৌগিক বস্তুর জন্য পরিশুদ্ধ তত্ত্বের একান্ত প্রয়োজন, যার মিশ্রণে সে নিজেই প্রস্তুত হয়েছে এবং যার মধ্যে সে হয়ে যাচ্ছে। জগৎ সভায় যাদের নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে, তাদের সংখ্যা পাঁচ, যেগুলো হিঁদুদের বিশ্বাস অনুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী নামে পরিচিত। এগুলোকে একত্রে মহাভূত বলা হয়। অর্থাৎ 'মহান অহংকারের সঙ্গে যুক্ত।' এরা অন্যদের মতো একথা মানে না যে, অগ্নি আকাশের অধোভাগের নিকট উষ্ণ-শুষ্ক একটি পিণ্ডের নাম। তারা অগ্নিকে পৃথিবীর সেই সাধারণ আগুন বলে মনে করে যা ধোঁয়ার উত্তেজনা থেকে সৃষ্ট হয়।

পঞ্চমাতৃ

১০–১৪ যেহেতু এ তত্ত্ব যৌগিক, সেহেতু তা প্রস্তুতের জন্য শুদ্ধতত্ত্ব যা 'পঞ্চমাতৃ', যাকে পাঁচ মাতা বলা হয়, তার প্রয়োজন। তারা এগুলোকে ইন্দ্রিয়ের কার্য বলে অভিহিত করে। আকাশের শুদ্ধ তত্ত্ব হলো, 'শব্দ' (বা আওয়াজ) অর্থাৎ, যা শোনা যায় ; বায়ুর স্পর্শশক্তি আছে, অর্থাৎ, তা ছোঁয়া যায় ; অগ্নির 'রূপ' আছে অর্থাৎ যাকে দেখা যায় ; 'জল'-এর রস আছে, অর্থাৎ, তাই, যা আস্বাদন করা যায় ; আর পৃথ্বীর 'গন্ধ' আছে, অর্থাৎ যাকে শোঁকা যায়। এই মহাভূত তত্ত্বে (যেমন– পৃথ্বী, জল ইত্যাদি–) প্রত্যেকের সঙ্গে 'পঞ্চমাতৃ'-র মধ্যে থেকে একটিকে জুড়ে দেওয়া হয়, যেমন, আমরা তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি পরে ঐ সবকটির সঙ্গে ঐ মহাভূত তত্ত্বকে জুড়ে দেওয়া হয়। এরকমই পৃথ্বীতে তা পাঁচটি গুণ সামিল রয়েছে কিন্তু জলে সৌগন্ধগুণ সামিল নেই (অর্থাৎ, তাতে মাত্র চারটি গুণই রয়েছে) ; অগ্নির ঘ্রাণ বা আস্বাদের গুণ তো হয় না (অর্থাৎ দু

গুণই হয়) ; বায়ুর তো ঘ্রাণ, আস্বাদ ও দৃষ্টিগুণ হয় না, (অর্থাৎ দুটি গুণই হয়) ; আকাশের তো ঘ্রাণ, আস্বাদ, দৃষ্টি, স্পর্শ কিছুই হয় না (অর্থাৎ একটি গুণই হয়)।

... এর সব তত্ত্বেরই ফল যেগুলোকে আমরা গণনা করেছি, অর্থাৎ এর সবগুলোই যৌগিক যশ বলে গণ্য হয়। হিন্দুরা বৃক্ষলতাদিকে পশু প্রজাতির অংশ বলেই গণ্য করে, যেমন প্লেটো মনে করতেন, বৃক্ষলতাদিরও বোধশক্তি রয়েছে। কেননা, অনুকূল ও প্রতিকূল দুটি বিষয়েরই পার্থক্য করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। পশু এমন প্রাণী যা পাষাণ থেকে ভিন্ন, কেননা, তাদের ইন্দ্রিয় শক্তি রয়েছে।

ইন্দ্রিয়াদি

১৫–১৯. শক্তি পাঁচটি, এদের ইন্দ্রিয় বলা হয়। শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ, ঘ্রাণের জন্য নাক, আস্বাদ নেওয়ার জন্য জিভ এবং স্পর্শ করার জন্য ত্বক। (অর্থাৎ, চক্ষু, বর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক– এগুলোকে পঞ্চেন্দ্রিয় বলা হয়)।

মনস্

২০. এর পরে আসে ইচ্ছাশক্তি, যা ইন্দ্রিয়গুলোকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত (বা প্রবৃত্ত) করে। অন্তরের গভীরে এর অবস্থান। সে জন্য তারা একে 'মনস্' বলে অভিহিত করে।

কর্মেন্দ্রিয়

২১–২৫. পাঁচটি আবশ্যক ধর্ম পাশববৃত্তিকে পরিপূর্ণ করে তোলে। একে তারা 'কর্মেন্দ্রিয়' বলে সংজ্ঞায়িত করে, যার অর্থ কর্মের ইন্দ্রিয়সমূহ। প্রথমোক্ত ইন্দ্রিয়গুলো বিদ্যা ও জ্ঞান দান করে আর পরবর্তীগুলো কর্ম ও উদ্যোগ। আমরা সেগুলোকে 'আবশ্যকীয়তা' বলে অভিহিত করব। সেগুলো যথাক্রমে :

১. মানুষের বিভিন্ন আবশ্যকতাও ইচ্ছার মধ্য থেকে কোনো একটার জন্য শব্দ উৎপন্ন করা, ২. নিজের প্রয়োজনের জন্য বলপূর্বক হাতকে সংকোচন অথবা প্রসারণ করা, ৩. কোনো বস্তু লাভের জন্য বা তার কবল থেকে রক্ষার জন্য পায়ের সাহায্যে চলা, ৪-৫. দুটি রন্ধ্রের মধ্য থেকে পাষাণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্যকে বাইরে বের করে দেওয়া, যা এই প্রয়োজনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

পঁচিশ তত্ত্বের সারাংশ

এই তত্ত্বগুলোর মোটসংখ্যা হলো পঁচিশ, যথা–

১. সামগ্রিক আত্মা,
২. নিরাকার সত্তা,
৩. সাকার পদার্থ,
৪. প্রবল প্রবৃত্তি,
৫-৯ পরিশুদ্ধ মাতা,
১০-১৪. মূলভূত (পঞ্চভূত) তত্ত্ব,
১৫-১৯. জ্ঞানেন্দ্রিয়,
২০. প্রেরক ইচ্ছা (মনস্),
২১-২৫. কর্মেন্দ্রিয়।

এ সমস্ত পদার্থের সমগ্র রূপকে তত্ত্ব বলা হয়, এবং সমস্ত জ্ঞান ঐ সমস্তের মধ্যে সীমিত থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মের কারণ ও আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক

আত্মা যা শরীরের সঙ্গে একাকার হতে ইচ্ছুক, তা মধ্যবর্তী প্রেতাত্মাদের দ্বারাই এক হয়ে যায়।

শরীর যদি জীবিত না হয় আর আত্মার সঙ্গে, যা স্পৃহ, তার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক না থাকে তাহলে কোনো জীবধারীর শরীরে স্বৈচ্ছিক ক্রিয়া জন্ম নিতে পারে না। হিঁদুদের মতে, আত্মা, যা মূলভূত প্রকৃতি ও তার ভৌতিক অধঃস্তর থেকে অনভিজ্ঞ, যার অনুভব করার ক্ষমতা নেই, সে সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস যে, প্রকৃতি ছাড়া তাদের কোনো অস্তিত্ব সৃষ্টি হতে পারে না। এ জন্য তারা শিবের আকাঙ্ক্ষা করে, যার স্থায়িত্ব আছে, আর যা কিছু তাতে লুক্কায়িত থাকে তা তারা শিখতে চায়, তারা প্রকৃতি থেকে একাকার হওয়ার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন পদার্থ, যা 'সঘন' আর এমন, যা 'বিরল' তাতে যদি গুণ অত্যধিক মাত্রায় বিরাজমান থাকে তাহলে তারা মধ্যবর্তী তত্ত্ব দ্বারাই একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, যাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো-না-কোনো সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, বায়ু, অগ্নি ও পানির মধ্যে যোগসূত্র (মাধ্যম) হলো এদের মধ্যে যারা একে অন্যের বিপরীত। কেননা, অগ্নির সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক তার বিরলতার কারণ, আর পানির সঙ্গে সঘনতার কারণ এবং এরা এ দুই গুণের দ্বারা একে অন্যকে মিলনের যোগ্য করে তোলে। এভাবে শরীরী ও অশরীরীর মধ্যে এর চেয়ে বেশি বৈপরীত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য আত্মা তার নিজের স্বরূপের কারণে ইচ্ছাপূর্তি কেবল ঐ সবের মাধ্যমে, প্রেতাত্মাদের দ্বারা করতে পারে, যার অস্তিত্ব দ্যুলোক, ভূলোক ও স্বর্গলোক নামক লোকের মধ্যে পঞ্চমাত্রারই সঙ্গে সম্পর্কিত। হিঁদুরা তাকে সঘন পিণ্ড থেকে পৃথক করার জন্য, যাদের অস্তিত্ব পঞ্চভূতের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে বিরাট পিণ্ড বলে সংজ্ঞায়িত করে। আত্মার মাধ্যমে একাকার হওয়ার ফলস্বরূপ তা নিজেকে সাধনের রূপে প্রযুক্ত করে। এভাবে সূর্যের বিম্ব, যদিও তা কেবল 'এক', তাকে অনেক দর্শন দ্বারা দর্শন করানো যায়। এমনকি একটি পাত্রে পানি রেখেও তার মাধ্যমে তাকে দর্শন করা যেতে পারে। সূর্যকে প্রত্যেক দর্শনে বা প্রত্যেক

পাত্রে একই রকম দেখায় এবং প্রত্যেকটিকে তার দ্বারা উত্তপ্ত করা যায় এবং আলোকিতও করা যায়...।

এরকমই, আত্মার ক্রিয়াশীল হওয়ার এটাই সর্বোচ্চ কারণ।

প্রকৃতি যা আত্মার সঙ্গে একাকার হতে চায়

দ্বিতীয় নিম্নতম কারণ যা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত তা হলো : ঐ প্রকৃতি পরিপূর্ণতার জন্য সচেষ্ট হয় এবং তা হামেশাই অল্প ভালোর চেয়ে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ তা সম্ভাব্য অবস্থা (ডিউনোমিস) থেকে বেরিয়ে সাকার (প্রাকসিস) অবস্থার প্রতি ধাবিত হয়। নিজের আত্মশ্লাঘা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ, যা তার মূল তত্ত্ব, প্রকৃতির সমস্ত রকমের সম্ভাবনা যার মধ্যে বিদ্যমান, নিজের আশ্রিত আত্মার সৃষ্টির জন্যই সে সবকিছুই করে থাকে। আর তাকে সমস্ত রকমের বনস্পতি ও জীবধারী পর্যন্ত নিয়ে যায়।

সাংখ্য দার্শনিকদের মতানুসারে কর্মের কারণ রূপে প্রকৃতি

'সাংখ্য দর্শন' অনুসারে কর্মের উৎস হলো প্রকৃতি। কেননা, রূপের অন্তর (পার্থক্য) যা প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। 'তিন প্রধান শক্তি'র উপর এবং এই সংক্রান্ত তত্ত্বের উপর বা এর প্রথম বা শেষ শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে কি না তা এখন বিচার্য। এই তিন শক্তি হলো 'দিব্য', 'মানবীয়' ও 'পাশবিক'। এই তিন শক্তিরই সম্পর্ক প্রকৃতির সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে নয়। আত্মার কর্ম এমন এক দর্শকের মতো যে প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড জানতে অথবা শিখতে চায় অথবা সে ঐ পথিকের মতো যে পথ চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য কোনো গ্রামে গিয়ে অবস্থান করে। প্রত্যেক গ্রামবাসী আপনাপন কাজে ব্যস্ত থাকে কিন্তু সে (পথিক) তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে চিন্তা করে– তাদের মধ্যেকার কিছুকে সে পছন্দ করে আবার অন্য কিছুকে সে অপছন্দ করে এবং তা থেকে উদাহরণ গ্রহণ করে। এভাবে সে ব্যস্ত থাকে এবং যে কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে তার মধ্যে না থাকে কোনো সাক্ষ্য এবং না থাকে তার সঙ্গে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক।

লোকেরা বলে যে, আত্মা বর্ষার পানির সমান, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। আর তা সর্বদাই একই প্রকারের হয়ে থাকে। কিন্তু তা যদি নানা পাত্রে ধারণ করে জমা করা যায়, সে পাত্রগুলো যদি সোনা, রুপা, কাচ, মাটি, চীনামাটি অথবা পাথরে তৈরি হয়– তাহলে তাতে রূপ, রস ও গন্ধের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবে আত্মা যে কোনো রূপে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করা ছাড়াই তার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক হওয়ার কারণে প্রকৃতিকে জীবন দান করে থাকে। এ জন্য প্রকৃতি যখন

ক্রিয়াশীল হয়ে যায় তখন তার পরিণাম ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে যা 'তিন মূলভূত শক্তি'র অন্যতম রূপে একে অন্যের অনুকূল হয়, যা অন্য শক্তির চেয়ে প্রবল হয়ে যায় এবং পারস্পরিক সহায়তার কারণে সমরূপ লাভ করে এবং সুপ্ত শক্তির মধ্য থেকে উপরোক্ত যে কোনো একটিকে শক্তি দান করে। এই সহায়তা বিভিন্ন প্রকারে দেওয়া যেতে পারে, যেমন– তেল, শুকনো বাতি এবং ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য একে অন্যের মধ্যে সহায়তা করে। প্রকৃতিতে আত্মার স্থান একটি গাড়ির চালকের (কোচওয়ান) মতো, ইন্দ্রিয়গুলো যার অধীন, যেগুলো গাড়ির চালকের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, আত্মা ঐ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা ঈশ্বর দান করেছেন। এই বুদ্ধিকে তারা এভাবে পেশ করে যার দ্বারা কোনো জিনিস সম্পর্কে বাস্তব বোধ জাগ্রত হয়। যা ঈশ্বরের জ্ঞান এবং এমন কর্মকাণ্ডের পথ প্রদর্শন করে, যাকে প্রতিটি মানুষ পছন্দ করে এবং তার প্রশংসা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মার দশা ও পুনর্জন্মের দ্বারা জগৎ সংসারে তার আসা-যাওয়া

পবিত্র ইসলামের মূলমন্ত্র যেমন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ* ত্রিত্ববাদ যেমন খ্রিষ্টধর্মের মূলমন্ত্র, 'সাইবথ' (বিশ্রাম) সংস্কার যেমন– ইহুদিদের বিশেষত্ব তেমনি হিঁদুদের মূলমন্ত্র হলো 'পুনর্জন্ম'। পুনর্জন্মে যে বিশ্বাস করে না সে হিঁদু নয় এবং তাকে হিঁদুদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। এ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস নিম্নরূপ :

পুনর্জন্মের উৎস, বিকাশ ও তার অন্তিম পরিণতি

আত্মা যতদিন পর্যন্ত পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত সে বিশ্বের সকল পদার্থকে সহজ রূপে জানতে পারে না। সেজন্য তাকে সমস্ত যোনি (স্থানীয়) ও প্রাণীর সন্ধান নেওয়া উচিত এবং অস্তিত্বের সমস্ত সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করা উচিত ; এবং যেহেতু তাদের সংখ্যা অনন্ত নয় ; বরং অনেক বেশি, সে জন্য আত্মাকে তাদের সমস্ত কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, যাতে সে বহু সংখ্যক পদার্থকে অবলোকন করতে পারে। আত্মা বিভিন্ন প্রাণী, যোনি ও তাদের প্রধান কর্ম ও অবস্থাকে অবলোকন করেই তারপর জ্ঞান লাভ করে। সে প্রতিটি পদার্থ থেকে অনুভব লাভ করে এবং এভাবে সে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে।

কিন্তু এসব কর্মে উপরোক্ত তিনটি আদি তত্ত্বের ন্যায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। এর অতিরিক্ত জানাকেও দিশাহীনভাবে ত্যাগ করা যায় না ; বরং তাকে লাগাম দিয়ে নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ জন্য অবিনশ্বর আত্মা তার

---

*আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহম্মদ (সা.) তাঁর রাসুল।– অনুবাদক

ভালো মন্দ কর্মানুযায়ী নশ্বর শরীরে বিচরণ করতে থাকে। একথা বলার উদ্দেশ্য আত্মা স্বর্গে যায়। এভাবে আত্মাকে পুণ্যকর্মের দিকে প্রবৃত্ত করা হয় যাতে তার মধ্যে আরও বেশি বেশি পুণ্যকর্ম করার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। আত্মার নরক লোকে যাওয়ার অভিপ্রায় এই যে, তার মনোযোগ দুষ্কর্মে ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করা যাতে সে তা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করে।

এই পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া নিম্নতম অবস্থা থেকে শুরু হয় এবং পুনর্জন্ম উপর থেকে নিচে, যেমন আমরা জেনে বুঝে বলছি ; বরং নিচে থেকে উপরে, উচ্চতর উৎপত্তিস্থলে চলতে থাকে। এর কারণ এই যে, যদি উপর থেকে নিচের দিকে হয় তাহলে নিচের থেকে উপরের দিকে হওয়াও তো সম্ভব। উচ্চতর ও নিম্নতর অবস্থা কর্মের উপর নির্ভরশীল হয় এবং এও স্বভাবের গুণাত্মক ও পরিণাম সম্পর্কিত বিভিন্ন তা এবং ও সবের বিভিন্ন অংশে সংযোগের পরিণামে তার নিজস্ব স্বভাব প্রকট হয়।

পুনর্জন্মের এই প্রক্রিয়া ততদিন পর্যন্ত জারি করে যতদিন পর্যন্ত না আত্মা ও পদার্থের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ না হয়। এর নিম্নতম লক্ষ্য হলো পদার্থের বিনাশ, যাতে কেবল এক অপবাদ এটাই যে, সে কোনো নতুন রূপ ধারণ করে নিক, যা তার কাছে বাঞ্ছনীয় বলে প্রতীত হয়। উচ্চতম লক্ষ্য এটাই যে, আত্মার সবকিছু জানার ইচ্ছা লুপ্ত (সমাপ্ত) হয়ে যাক, যা তার স্বাধীন ইচ্ছার ঔদার্য বোধের আগে অজানা ছিল। সে এটাই অনুভব করত যে, সে পদার্থের সর্বনিকৃষ্ট স্বভাব ও তার আকারের অস্থিরতা এবং ঐ সকল বস্তুর মধ্যে যে পদার্থ ইন্দ্রিয়কে দমন করছে, তা থেকে প্রাপ্ত আনন্দের সত্য উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাকে ত্যাগ করতে পারে। এমনটি হওয়ার পর আত্মা পদার্থ থেকে বিমুখ হয়ে যায় ; এ দুয়ের মধ্যে সংযোগকারী বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার অভিন্নতা খণ্ডিত হয়ে যায়। তা পৃথক ও ছিন্ন হয়ে যায় ও আত্মা তার কেন্দ্রের দিকে ফিরে যায় এবং নিজের সঙ্গে জ্ঞানের অতটাই আনন্দ নিয়ে যায় যতটা পরিমাণ তিলের কণা ও মঞ্জরীর মধ্যে হয়ে থাকে এবং যা পরে তেল থেকে পৃথক হয় না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সব মিলে একাকার হয়ে যায়।

এখন তাদের (হিঁদুদের) সাহিত্য থেকে এ বিষয়ে অন্যান্য জাতির স্বজাতীয় (নিজস্ব) সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রস্তুত করা আমার একান্ত কর্তব্য।

[এর পরে 'গীতা' ও হিঁদুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইউনানিদের সঙ্গে সমমতামতভিত্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সক্রেটিস এর ফাইডো নামক গ্রন্থের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দশম অধ্যায়ের শেষাংশের ৫টি অনুচ্ছেদ এবং একাদশ অধ্যায়ের পুরো অংশ দ্রষ্টব্য।]

সুফি মতবাদ

... এই সিদ্ধান্ত ঐ সুফিরাও প্রতিপাদন করেছেন, যারা শিক্ষা দেন যে, এ জগৎ তো আত্মার মধ্যে সুপ্তাবস্থায় আছে, পরলোকে আত্মা জাগ্রতাবস্থায় থাকবে। এরা এই সঙ্গে স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কিছু বিশিষ্ট স্থানে বিদ্যমান আছেন– উদাহরণস্বরূপ, স্বর্গ-আসনে তথা আল্লাহর নিজস্ব সিংহাসনে (যা কুরআনে উল্লেখ আছে)। কিন্তু এর বাইরে তারা একথাও মানেন যে, ঈশ্বর সমস্ত জগৎ-সংসারে, পশুপাখি, বৃক্ষলতাদি ও অচেতন জগতে– সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং তাঁরা এই ব্যাপ্তিকে বিশ্বব্যাপী বলে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁদের মত যে, তাঁদের দৃষ্টিতে আত্মার বিভিন্ন উৎসক্ষেত্রে পুনর্জন্মের সংকল্প বা আকাঙ্ক্ষা কোনো গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন লোক তথা স্বর্গ ও নরকে প্রতিফলের স্থান

তিন লোক, ত্রিলোক বা ত্রিভুবন

হিঁদুরা জগৎকে লোক বলে অভিহিত করেন। এর তিনটি ভাগ– ঊর্ধ্বলোক, অধোলোক ও মধ্যলোক। ঊর্ধ্বকে 'স্বর্গলোক' বা স্বর্গ বলা হয় ; অধোকে 'নাগলোক' অর্থাৎ সাপের জগৎ বা নরক বলা হয় ; একে তারা 'নর-লোক' বলেও অভিহিত করেন, আবার কখনো বা একে 'পাতাল' অর্থাৎ নিম্নতম লোক বা জগৎ বলেও অভিহিত করেন। 'মধ্যলোক' যাতে আমরা বসবাস করি, একে 'মধ্যলোক' ও মনুষ্যলোক অর্থাৎ মানবসংসার বা মানবজগৎ বলে অভিহিত করেন। মনুষ্যলোকে মানুষকে কাজ করতে হয়, ঊর্ধ্বলোকে তার প্রতিফল বা পুণ্যলাভ হয় ও অধোলোকে দণ্ডলাভ হয়। এমন মানুষ যারা স্বর্গলোক বা নাগলোকে প্রবেশপাত্র হয়, তারা সেখানে কিছুকাল যাবৎ নিজেদের সম্পূর্ণ কর্মফল ভোগ করে যা তাদের কৃতকর্মের অনুরূপ হয়। কিন্তু ঐ দুই লোকে কেবল তাদের আত্মাই বাস করে, যা শরীর থেকে একেবারেই মুক্ত।

যারা স্বর্গে যাওয়ার পাত্র নয় ; বরং তারা নামতে নামতে এতটাই নিচে যায় যে, তাদের স্থান শুধু নরকে হতে পারে, তাদের জন্য অন্য জগৎও আছে, যাকে 'তির্যকলোক' বলে। যা বনস্পতি ও পশুদের একটি অবিবেকি লোক, যেখানে প্রাণীদের অন্তর্গত হয়ে আত্মা ততদিন পর্যন্ত পুনর্জন্মের বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করে যতদিন পর্যন্ত না তারা মনুষ্য-স্তরে পর্যন্ত পৌঁছে যায় ; এই প্রকারে সে বনস্পতি জগতের ন্যায় নিম্নস্তরের লোক থেকে শনৈঃ শনৈঃ উপরে ওঠে সংবেদী জগতের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। নিম্নলিখিত কারণে আত্মা সেই লোকে বাস করে। হয় আত্মাকে প্রদানকারী প্রতিফল তাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় ; নতুবা আত্মা নরক থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে, কেননা, তাদের বিশ্বাস যে, আত্মা স্বর্গ থেকে মনুষ্যলোকের দিকে আসার সময় তাৎক্ষণিকভাবে মানবশরীর ধারণ করে নেয়।

আর আত্মাকে স্বর্গলোক থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বনস্পতি ও পশুদের মধ্যে বিচরণ করতে হয়। আর যখনই সে মানবশরীর লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই সে স্বর্গে যেতে পারে।

'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে উদাহরণ

হিঁদুরা তাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে অনেক নরক, তাদের বিশেষত্ব ও সেগুলোর নামের উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেক রকমের পাপের জন্য আলাদা আলাদা নরক নির্দিষ্ট রয়েছে। 'বিষ্ণুপুরাণ'[১১]-অনুসারে নরকের সংখ্যা ৮৮,০০০।

[আল বিরুনী মানুষের দ্বারা কৃত বিভিন্ন পাপ ও সে সমস্ত পাপের জন্য নির্ধারিত নরকগুলোর উদাহরণ এ পুস্তকের অন্যত্র পেশ করেছেন। ঐ পাপীদের মধ্যে আছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়... নির্দোষ লোকেদের হত্যা করে... গো হত্যা করে... (এবং)... ব্রাহ্মণ যে নিজের বোন বা কন্যার সঙ্গে কুকর্ম করে... বেদ ও পুরাণকে গালি দেয়... মাতাপিতার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়... তরবারি ও ছুরি তৈরি করে, মুরগি, বিড়াল, শূকর ইত্যাদি পালন করে, বৃক্ষ নিধন করে... এবং... সবচেয়ে বেশি... রীতি-রেওয়াজকে উপেক্ষা করে, নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে। আল বিরুনী বলেছেন যে, তিনি এগুলোকে 'হিঁদুরা কোন কোন কাজকে পাপ বলে অভিহিত করে তাকে ঘৃণা করে তা বোঝানোর জন্য এগুলো গণনা করেছেন।' [দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

কিছু হিঁদুর মতে, বনস্পতি ও পশুদের যোনিতে পুনর্জন্মকেই নরক বলা হয়

কিছু হিঁদুর মত যে, মধ্যলোক, যা পুণ্যার্জনের জন্য নির্ধারিত, বাস্তবিকই তা হলো মানবলোক আর মানুষ এতে এ জন্যই পথভ্রষ্টের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় যে, এখানে এমন পুরস্কার লাভ হয় যা তাকে স্বর্গে তো পৌঁছে দেয় না কিন্তু অবশ্যই তাকে নরক থেকে রক্ষা করে। তাদের বিবেচনা মতে, স্বর্গ এক উচ্চতর অবস্থা, যেখানে মানুষ পরমানন্দিত অবস্থায় বিরাজ করে। আর তার ঐ স্থিতি তার পুণ্যার্জনের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে। এর বিপরীতে আত্মার বনস্পতি ও পশুর মধ্যে অবস্থানকে তারা একটা নিম্নতর অবস্থা বলে গণ্য করে, যেখানে মানুষ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তিস্বরূপ অবস্থান করে আর ঐ সময়টিকে তার কাছে নিজের দুষ্কর্মের অনুরূপ মনে হয়। যারা মনে করে, তারা অন্য কোনো নরককে স্বীকার করেন না ; বরং তারা মনুষ্যদেহের সর্ব নিম্নস্তরের এই বিকৃতিকে নরক বলে মনে জ্ঞান করে।

পুনর্জন্মের নৈতিক সিদ্ধান্ত

প্রতিফলের এ সমস্ত অবস্থা এ জন্যই (জানা) প্রয়োজন, কেননা, ভৌতিক বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য ইচ্ছা সব সময় সরল রেখা ধরে চলে না। যা পরম জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায় এবং তার পথ অনুমান-আশ্রিত হয়ে থাকে অথবা তা এ কারণে গ্রহণ করা হয়, কেননা, অন্যান্য সত্তা তাকেই নির্বাচন করে থাকে। মানুষের কোনো কর্মই ব্যর্থ হয় না। এমনকি তার সর্বশেষ কর্মটিকেও তার পাপপুণ্যের তুলাদণ্ডে গ্রহণ করা হয় এবং তার তুলনাও করা হয়। কিন্তু প্রতিফল তার কর্ম অনুযায়ী পাওয়া যায় না ; বরং তা মানুষের নিয়ত বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী লাভ হয়। মানুষের কর্মফল হয় সেই যোনি (উৎস) থেকে লাভ করবে, যা এই পৃথিবীতেই থাকে, নতুবা সেই যোনি থেকে লাভ করবে যার আত্মা সেখানে পুনর্জন্ম লাভ করবে অথবা সেই মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে যেখানে সে নিজের আকার ত্যাগ করেছে এবং যোনিতে যে প্রবেশাধিকার পায়নি।

'সাংখ্য দর্শন' মতে পুনর্জন্মের আলোচনা

এখানে এসে হিঁদু দার্শনিকেরা কল্পনার পথ ত্যাগ করে দুটি স্থানের বিষয়ে, যেখানে পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়া হয়, পৌরাণিক কাহিনির প্রতি সংযোগ নিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাদের সিদ্ধান্ত যে, মানুষ এ স্থান দুটিতে অমূর্ত প্রাণীর ন্যায় অবস্থান করে এবং নিজের কর্মফল প্রাপ্তির পর পুনরায় তা মূর্তরূপ ও মানব যোনি ধারণ করে নেয় যাতে তার পরবর্তী প্রস্থানের জন্য সে প্রস্তুত হতে পারে। এ জন্য 'সাংখ্য' নামক গ্রন্থের লেখক স্বর্গপ্রাপ্তির রূপকে– পুরস্কারকে কোনো বিশেষ লাভ বলে স্বীকার করেন না। কেননা, তা শাশ্বত নয় ; বরং তার একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন যে, এ ধরনের জীবনের সঙ্গে আমাদের ইহলৌকিক জীবনের অনেক মিল রয়েছে। কেননা, তা আকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষের ঊর্ধ্বে নয়, আর তার মধ্যেও কয়েকটি শ্রেণী ও বর্ণ রয়েছে, যেখানে কেবল ঐ অবস্থা ত্যাগ করে পূর্ণ সমতা এসেছে, সেখানে অর্থলিপ্সা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো অন্ত নেই।

সুফি মতে সমানান্তর সিদ্ধান্ত

সুফিরাও স্বর্গবাসকে কোনো বিশেষ লাভ বলে স্বীকার করেন না কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁদের মতের ভিন্নতা রয়েছে। তাঁরা বলেন, সেখানে পৌঁছানোর পর আত্মা সত্য অর্থাৎ ঈশ্বরের চেয়ে ইতর বস্তু থেকে আনন্দ লাভ করে ; আর তাদের অভিমত, কিছু বস্তুর কারণে পরম শিব থেকে বিচ্যুত হয়ে ঐ বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় যা পরম শিব নয়।

প্রচলিত মতে আত্মার শরীর ত্যাগ

আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, হিঁদুদের বিশ্বাস মতে আত্মা এ দুই স্থানে অশরীরী রূপ ধরে অবস্থান করে। কিন্তু এ মত শিক্ষিত হিঁদুরা পোষণ করেন, যারা আত্মার স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ধারণা তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যারা আত্মার উপস্থিতি ছাড়া শরীরের কল্পনাই করতে পারেন না। তাদের মতে, মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হলো আত্মার দেহান্তর গ্রহণের প্রতীক্ষা, যা তার জন্য একান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমগুণসম্পন্ন সমজাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি না ঘটে– অর্থাৎ সেসবের মধ্য থেকে একটি প্রকৃতিতে, অথবা মায়ের গর্ভে ভ্রূণাকারে অথবা ধরণীর বুকে বীজের আকারে তৈরি করা হয়– আত্মা শরীর ত্যাগ করে না। এর পরে আত্মা তার নিবাসস্থল অর্থাৎ শরীরকে ত্যাগ করে।

অন্যাদের মত কিছুটা ঐতিহ্যগত। তাঁরা বলেন, আত্মা এ ধরনের ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করে না। না তারা কোনো দুর্বলতার কারণে কোনো শরীর ত্যাগ করে আর না এরই মধ্যেকার কোনো তত্ত্ব থেকে অন্য শরীর তৈরি হয়ে যায়। এই শরীরকে 'অতিবাহিকা' অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত বলা হয়। কেননা, এর আবির্ভাব জন্ম দ্বারা হয় না। আত্মা ঐ শরীরে পুরো এক বছর পর্যন্ত ছটফট করতে থাকে তা সে স্বর্গভাজন হোক বা নরকভাজন হোক। এ ইরানিদের 'বরজখ' ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত একটি সংকল্পনা, যা তাদের মতানুসারে কর্ম ও পুণ্যার্জন করা বা তার ফলপ্রাপ্তির একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এ কারণে মৃতের উত্তরাধিকারীকে হিঁদুদের প্রথানুসারে বছর-ভর নানা জপ-তপ ও নানা ক্রিয়াকর্মাদি পালন করতে হয়। কেননা, আত্মা এর পরে তার জন্য নির্মিত নিবাসস্থলে প্রস্থান করে।

[এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যার জন্য 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য দ্বাদশ অধ্যায় 'পুরাণের সূচি' ও 'স্মৃতি গ্রন্থের সূচি' নামক উপশিরোনাম।]

পুনর্জন্ম সম্পর্কে মুসলিম লেখকদের সিদ্ধান্ত

পুনর্জন্মকে স্বীকার করেন, এমন এক ব্রহ্মবেত্তা বলেন, পুনর্জন্ম চার শ্রেণীর হয়ে থাকে :

১। 'স্থানান্তরণ' অর্থাৎ, মানবজাতি পর্যন্ত সীমিত প্রজনন, কেননা, তা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির অস্তিত্বের মধ্যে 'স্থানান্তরিত' করে থাকে ; আর এর বিপরীত হলো–

২। 'কার্যান্তরণ' যার সম্পর্ক বিশেষরূপে মানুষের সঙ্গে হয়ে থাকে, কেননা, এ বানর, শূকর বা হাতির রূপে 'কার্যান্তরিত' হয়।

৩। 'বনস্পতি'র দশার সমান হলো অস্তিত্বের একটি স্থির দশা। এ 'স্থানান্তরণ' এর চেয়েও খারাপ দশা। কেননা, এ হলো জীবনের একটি স্থির দশা, যা সর্বদাই একইরূপে অবস্থান করে এবং এর আয়ু হয় পর্বতের ন্যায় প্রলম্বিত।

৪। 'বিসর্জন' তৃতীয় দশার বিপরীত, যা উপড়ে দেওয়া বনস্পতি ও বলি দেওয়া পশুর উপর প্রযোজ্য হয়, কেননা, তা বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি না হয়ে বরং বিনষ্ট হয়ে যায়।

সিজিস্তানের আবু ইয়াকুব তাঁর গ্রন্থ 'কাশফ-উল-মাহজুব' (রহস্যোদ্ঘাটন)-এ বলেছেন যে, প্রজাতি ও যোনি (উৎসস্থল) সুরক্ষিত থাকে এবং পুনর্জন্মের ক্রম সর্বদাই একই যোনিতে সীমাবদ্ধ থাকে, না সে তার নিজের সীমা অতিক্রম করে আর না সে অন্য যোনিতে চলে যায়।

প্রাচীন ইউনানিদেরও এই মত ছিল...।

[সক্রেটিসের 'ফাইডো' গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ; সেই সঙ্গে জোহানেস গ্র্যামেটিউআস দ্বারা উদ্ধৃত প্লেটোর মতও তুলে ধরা হয়েছে, দ্রষ্টব্য–দ্বাদশ অধ্যায় 'মহাভারত' উপনিষদ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ।]

সপ্তম অধ্যায়

ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির স্বরূপ ও সেই পর্যন্ত পৌছানোর পথ

প্রথম ভাগ : সাধারণ মোক্ষ

আত্মা সংসারের বন্ধনের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকলে তার এ ধরনের বন্ধনের কিছু কারণ থাকবে, আর এই কারণের বিপরীতে অন্য কোনো কারণ না থাকলে সে বন্ধন থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। হিঁদুদের এটাই মত এবং এ মতের ব্যাখ্যা আমরা এর আগে করেছি, আর এই বন্ধনের মূল কারণ হলো 'অজ্ঞান' আর এ জন্যই কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা অন্য সমস্ত বস্তুকে এভাবে বিবেচনা করে তাকে সাধারণ ও বিশেষ– এই দুইরূপে পরিভাষিত করা যেতে পারে এবং যে কোনো রকমের নির্গমনকে অনাবশ্যক সিদ্ধ করে এবং সমস্ত প্রকারের শঙ্কাকে বিদূরিত করেই তবে মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে। এর কারণ এটাই যে, আত্মা যে সমস্ত পরিভাষার মাধ্যমে বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে নিজে নিজেকে চিহ্নিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই একথাও জেনে নেয় যে, কীভাবে অমরত্ব লাভ করে পরম সৌভাগ্যবান হওয়া সম্ভব ; ঐ ধরনের পদার্থের এ পরম দুর্ভাগ্য যে, সে সদা পরিবর্তনশীল থাকে এবং সমস্ত রকমের যোনি ধারণ করেও নশ্বরদেহী হয়ে থাকে। এর পরে ঐ পদার্থকে পরিত্যাগ করে দেয় এবং এও দেখে নেয়, যাকে সে শ্রেয় ও আনন্দদায়ক বলে মনে করে ধারণ করেছিল বাস্তবে সে কতটা মন্দ ও কষ্টকর। এভাবে সে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে এবং পদার্থের সঙ্গে মিশে যেতে অস্বীকার করে। এভাবে কর্মের অন্ত হয়ে যায় এবং এ আত্মা ও পদার্থ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়ে যায়।

সুফিদের সমসিদ্ধান্ত

প্রবুদ্ধ (বুদ্ধিমান) প্রাণী ও তার বুদ্ধির অবস্থা পর্যন্ত পৌছানো সম্পর্কে সুফিদের মধ্যে একই মত প্রচলিত, কেননা, তাদের মতে, আত্মা দুই প্রকার– একটি শাশ্বত যাতে কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর সাধিত হয় না, যার মাধ্যমে সে লোকান্তর জগতের সমস্ত গুপ্ত বিষয়কে জেনে নেয় এবং আশ্চর্যজনক কাজ সম্পন্ন করতে

পারে এবং অন্যটি হলো মানবীয় আত্মা যা নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বার বার জন্ম নিতে থাকে।

হিংদুদের মতে, জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানার্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাতে যে সুখলাভ হয় তার সৃষ্টি মানুষের গবেষণা ও অন্বেষণের জন্য প্রেরিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পানাহারের মাধ্যমে যে আস্বাদন সুখ লাভ করা যায় তাকে ঐ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মানুষ পানাহারের মাধ্যমে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে পারে। এরকমই একটি সুখ হলো মৈথুন-সুখ, যা নতুন প্রাণীদের জন্ম দিয়ে নিজের প্রজাতিকে সুরক্ষিত রাখার কাজ করে। এই দুই ক্রিয়ার মধ্যে যদি বিশেষ সুখ না থাকত, তাহলে মানুষ ও পশু এ প্রয়োজনের জন্য তাদের ব্যবহার করত না।

এছাড়া হিংদুদের মত যে, মানুষ তিনভাবে (বুদ্ধিমান) প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে :

১। অনুপ্রাণিত হয়ে এবং এই প্রেরণা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাভ করা যায় না ; বরং জন্মের সাথে সাথেই এবং শৈশব কালেই লাভ করা যায়, যেমন, কপিলমুনি জন্মসিদ্ধ প্রবুদ্ধ ও জ্ঞানী ছিলেন।
২। একটি সময় বিশেষের (বা নির্দিষ্ট সময়ের) পরে তিনি প্রেরণা প্রাপ্ত হন।
৩। শিক্ষালাভের মাধ্যমে এবং কিছু সময় পরে, যেভাবে মানুষ শিক্ষালাভের পর কিছু প্রাপ্ত হয় এবং যখন তার মধ্যে মানসিক প্রৌঢ়ত্ব আসে।

কাম, ক্রোধ ও অজ্ঞান– মোক্ষ (মুক্তি) প্রাপ্তির পথে প্রধান বাধা

জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ তখনই সম্ভব যখন পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পাপের অনেক শাখা আছে কিন্তু আমরা তাকে কাম, ক্রোধ ও অজ্ঞান– এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যদি গোড়া কেটে দেওয়া হয় তাহলে গাছ আপনা-আপনিই পড়ে যাবে। এখানে সর্বপ্রথম আমরা কাম ও ক্রোধের শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব, যা মানুষের সবচেয়ে বড় ঘাতক শত্রু, কেননা, তা তাকে পানাহারের সুখ ও প্রতিশোধের আনন্দের লোভ দেখিয়ে তাকে প্রভাবিত করে। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো, সে তাকে সুখের লোভে কষ্টভোগ করতে ও তাকে অপরাধের দিকে চালিত (প্রবৃত্ত) করে। সে মানুষকে শুধু বন্য জীবজন্তুই নয় ; বরং তাকে রাক্ষস বানিয়ে ছাড়ে।

আমাদের প্রথম বিবেচনা করতে হবে যে, মানুষের কাম ও ক্রোধশক্তির তুলনায় নিজের মস্তিষ্কের বিবেচনা শক্তির উপরই নির্ভর করা উচিত, কেননা, তাকেই অনুসরণ করে সে দেবতার পর্যায়ে চলে যায়। শেষ কথা, যে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত, তা হলো সাংসারিক কার্যকলাপ থেকে

মানুষের পরাঙ্মুখ হয়ে যাওয়া উচিত। এসব কার্যকলাপ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা থেকে নিবৃত্ত হওয়া যাবে– অর্থাৎ বাসনা ও ইচ্ছা। এভাবে তিনটি মূল শক্তি থেকে অন্যসব কার্যকলাপও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধরনের কর্মের পরিহার দুটি ভিন্ন নিয়মে (প্রকারে) সম্ভব :

১। তৃতীয় শক্তি অনুসারে আলস্য, স্থান (নিবৃত্তি) ও অজ্ঞান দ্বারা। কিন্তু এ পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা, এর পরিণাম হয় নিন্দনীয়।

২। ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে চয়নের দ্বারা– অর্থাৎ ভালোমন্দের বিচার করে, (কোনটা মন্দ বা কোনটা ভালো), যার পরিণাম হতে পারে প্রশংসনীয়।

কর্ম থেকে আত্মরক্ষার সবচাইতে বড় পদ্ধতি হলো এই যে, যে বস্তু মানুষকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে তার প্রতি নিজেকে বিমুখ করে নেওয়া। এভাবে সে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্য-পদার্থের কবল থেকে এতটা পর্যন্ত বাঁচার সমর্থ হবে যে, এর ফলে, সে বুঝতেই পারবে না যে, তার চেয়ে ইতর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আছে এবং সে সমস্ত প্রকার ক্রিয়াকর্মকে এভাবে রোধ করতেও সক্ষম হয়ে যাবে। একথা স্পষ্ট যে, লোভী মানুষ তার লক্ষ্য পূরণের জন্য উদ্যম গ্রহণ করে আর যে উদ্যমই সে গ্রহণ করুক না কেন, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পরে সে হাঁপিয়ে ওঠে। এ থেকে এই ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, হাঁপানো লোভী হওয়ারই পরিণাম। যদি লোভের এসব তত্ত্ব নিপীড়িত করা হয় তাহলে মানুষের শ্বসন ঐ প্রাণীদের মতো হয়ে যাবে যারা সমুদ্রতলে বসবাস করে এবং যাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা নেই। এমনটি করার পর তারা কেবল এই বস্তুতেই সহবাসী হয়, আর তা হলো মুক্তির খোঁজ ও 'পরম' একাত্মতার সন্ধান।

... আমরা যা কিছু বলেছি, তা থেকেই এটা জরুরি হয়ে যায় যে, চিন্তা ক্রিয়া নিরন্তর জারি থাকা উচিত আর তার জন্য কোনো সংখ্যা নিশ্চিত করা যায় না, কেননা, সংখ্যার অর্থ হয় বারংবার আর বারংবারতার শর্ত এই হয় যে, তাতে অন্তরাল হওয়া উচিত, আর তখন চিন্তন লাগাতার না হয়ে তা দুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে, তার নিরন্তরতা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তা চিন্তনকে ঐ লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এ তো লক্ষ্যই নয় ; বরং এর বিপরীত লক্ষ্য হলো 'চিন্তনের নিরন্তরতা'।

এই লক্ষ্য হয় 'একই যোনিতে' অর্থাৎ পুনর্জন্মের একই অবস্থায় নতুবা 'অনেক যোনিতে'– এভাবে প্রমাণসিদ্ধ করা যায় যে, মানুষ নিরন্তর সদাচরণ করতে থাকে এবং নিজের আত্মাকে অভ্যস্ত করিয়ে নেয় যাতে তার এ সদাচরণ তার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে যায় ও এক বিশেষ রূপ লাভ করে।

হিংদু ধর্মের নয়টি নিয়ম

সদাচরণ হলো সেই বস্তু, ধর্মীয় বিধিবিধানে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর যে প্রধান বিধিগুলো আছে তাতে অনেক গৌণবিধিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা (নিম্নলিখিত) নয় প্রকার :

১। মানুষ কাউকে হত্যা করবে না।

২। মিথ্যা বলবে না।

৩। চুরি করবে না।

৪। বেশ্যালয়ে যাবে না।

৫। ধন সঞ্চয় করবে না।

৬। সে নিরন্তর পবিত্রতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখবে।

৭। তার বিহিত ব্রত পালন করতে হবে যাতে ব্যবধান থাকা উচিত নয় আর তার ন্যূনতম বস্ত্র ধারণ করতে হবে।

৮। সে ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন (স্থিরচিত্ত) থাকবে এবং ব্রত পালনের সময় মনে মনে ঈশ্বরের প্রতি স্তুতি ও কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করবে।

৯। তার মনে সর্বদা 'ওম' শব্দটি অনুচ্চারিত রূপে বিদ্যমান থাকবে যা সৃষ্টিবিষয়ক শব্দ।

পশু হত্যা সম্পর্কে যে বর্জনের আদেশ (ক্রম সংখ্যা ১) দেওয়া হয়েছে তা বস্তুত, 'যে কোনো রকমের দুঃখদায়ী কৃত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেওয়া সাধারণ আদেশেরই এক অঙ্গ মাত্র। এই শিরোনামের অধীন (ক্র. স. ৩) অন্য কোনো মানুষের সম্পত্তি অপহরণ ও মিথ্যাভাষণ (ক্র. স. ২)-এর প্রসঙ্গ এসে যায় এবং এরকম কৃত্য মন্দ ও অধর্মতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

ধনসঞ্চয় থেকে আত্মরক্ষার (ক্র. স. ৫) অর্থ হলো, ঐ পরিশ্রম করা, যাতে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করা যায়, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধৈর্যধারণ করলে অবশ্যই তাকে লাভ করা যাবে। এর অন্যতম অভিপ্রায় হলো ভৌতিক জীবনের অধম দাসত্ব থেকে নিজের জীবন শুরু করে স্বাধীন ও উদার চিন্তাধারার মাধ্যমে জীবনাতিবাহিত করে আনন্দ লাভ করতে পারা।

শুচিতা, শুদ্ধতা বা পবিত্রতার ব্যবহার (ক্র. স. ৬)-এর অর্থ হলো মানুষ তার নিজের শরীরে দুর্গন্ধ বোধ করে এবং তা থেকে আভাসিত (বুঝতে) হয় যে, ঐ দুর্গন্ধকে ঘৃণা করা উচিত এবং আত্মার শুদ্ধতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা উচিত। ন্যূনতম বস্ত্র ধারণ করে শরীরকে কষ্ট দেওয়ার অভিপ্রায় (উদ্দেশ্য বা অর্থ) (ক্র. স. ৭) এই যে, মানুষ যেন তার শরীরকে স্থূল (মোটা) হতে না দেয়, এর উত্তেজনাকে শান্ত করা এবং নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে সতেজ করা ...।

দ্বিতীয় ভাগ : মোক্ষ-প্রাপ্তির ব্যবহারিক মার্গ (পথ) পতঞ্জলি, বিষ্ণুধর্ম ও গীতা-অনুসারে

পতঞ্জলির পুস্তকে আমি পড়েছি, 'আমরা মুক্তিমার্গকে (পথ) তিনভাবে বিভক্ত করেছি :

১। ক্রিয়া-যোগ : ইন্দ্রিয়গুলোকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করার প্রক্রিয়া হলো যে, সে বাহ্য জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেকে অন্তর্জগৎমুখী করে নিক যাতে সে নিজে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হতে পারে। এ সাধারণত, সেই মানুষদের পথ যারা জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অতিরিক্ত আর কোনো বস্তুর অভিলাষী নয়।'

[বিষ্ণুধর্ম[২] ও গীতার সংগত উদাহরণ চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।]

গীতা অনুসারে আত্মত্যাগ মুক্তি-মার্গের দ্বিতীয় ভাগ

২। মুক্তি-মার্গের দ্বিতীয় অংশ হলো 'আত্মত্যাগ' যার আধার ঐ মন্দের বোধ জাগ্রত হওয়া, যা সৃষ্টির পরিবর্তনশীল বস্তু নিয়ে ও তার নশ্বরতার মধ্যে বিদ্যমান। যার ফলে, মন তার প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়, তার কামনা শেষ হয়ে যায় এবং মানুষ ঐ তিন মূল শক্তির ঊর্ধ্বে উঠে যায় যা কর্ম ও তার বিবিধতার মূল কারণ। এ জন্য সে তার সংসারের কার্যক্রমকে ঠিকমত বুঝে নেয় যে, সে সবের মধ্যে যেগুলোকে তার ভালো লাগে বাস্তবিকই তা মন্দ আর যে সুখ সে প্রদান করছে, সুখফল প্রাপ্তির সময় তা দুঃখে পরিণত হয়ে যায়। অতএব, সে ঐ সমস্ত বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করে যা তাকে সাংসারিক মায়াজালে আবদ্ধ করে দেয় এবং যার কারণে তাকে বেশিদিন যাবৎ ভব-বন্ধনের মধ্যে বাঁধা থাকতে হয়।

গীতা অনুসারে মুক্তিমার্গের তৃতীয় ভাগ উপাসনা

৩। মুক্তিমার্গের তৃতীয় ভাগ, যে বিষয়ে পূর্বোক্ত দুটি ভাগের সূত্র ধরে আলোচনা করা হচ্ছে, তা হলো উপাসনা, যা এই উদ্দেশ্যে করা হয় যে, তার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভে সহায়তা পাওয়া যায়, আর তা পুনর্জন্মে এমন যোনি প্রাপ্তির জন্য কৃপা করে যা থেকে সে নিজেকে স্বর্গসুখ লাভের যোগ্য করে তুলতে পারে।

গীতার রচয়িতা উপাসনা-কর্মকে শরীর, বাণী ও মন– এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

শরীরের কাজ হলো ব্রত রাখা, প্রার্থনা করা, বিধিবিধান পালন করা, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিদের সেবা করা, শরীরকে পরিষ্কার রাখা, যে কোনো পরিস্থিতিতে হত্যা থেকে বিরত থাকা এবং কখনো কারো সম্পত্তি ও স্ত্রীর প্রতি কু-দৃষ্টি না দেওয়া।

বাণীর কাজ হলো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা, ঈশ্বরের স্তুতি করা, সদা সত্য বলা, লোকেদের সাথে বিনম্র আচরণ করা, তাদের পথ দেখানো এবং তাকে বজায় রাখা, অহংকার না করা, সদা-সন্তোষের সঙ্গে কাজ করা, নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ মানানো ও সদাপ্রফুল্ল থাকা।

মোক্ষের (মুক্তির) স্বরূপ

... হিন্দুদের মতানুসারে পরমাত্মার সাথে মিলনই হলো মুক্তি (মোক্ষ) ; কেননা, তাঁরা ঈশ্বরকে এমন এক সত্তার রূপে বর্ণনা করেছেন, যিনি কোনো প্রতিফল চান না, আর তার পক্ষ থেকে কারো প্রতি কোনো বিরোধের ভয় নেই, তিনি বুদ্ধির অগম্য, কেননা, তিনি এতটা উদাত্ত যে, তার তুলনা কোনো শক্তির সঙ্গে করা যায় না, আর যে যতই ঘৃণিত ও বীভৎস হোক না কেন, কেউ তার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়। আর হিঁদুরা সেই ব্যক্তির বর্ণনা করে যে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েছে, কেননা, আদি ও অন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই সে ঈশ্বরের সমান, তা এজন্য যে তার অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে থাকে না আর দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, মোক্ষ প্রাপ্তির পূর্বে সে বন্ধনযুক্ত জগতেই ছিল এবং জ্ঞেয় পদার্থকে কেবল মায়াজালের রূপে জানত আর এ জ্ঞান সে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল, যখন তার জ্ঞান-পদার্থ তখনো পর্যন্ত, পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এর বিপরীতে মুক্তির জগতে সমস্ত পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত আচরণ সরিয়ে দেওয়া হয় আর সমস্ত প্রকারের বাধা দূর করে দেওয়া হয়। সেখানে প্রাণী সমস্ত প্রকারে প্রবুদ্ধ (বুদ্ধিমান) হয়ে যায়, তার কোনো অজ্ঞাত বিষয়ে আর জানার ইচ্ছা থাকে না, কেননা, ইন্দ্রিয়ের দূষিত জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে শাশ্বত সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

পতঞ্জলি-র উদাহরণ

এ জন্য 'পাতঞ্জল' পুস্তকের শেষে শিষ্য যখন মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন গুরু উত্তর দেন– 'যদি তুমি চাও তাহলে বলতে পারো যে, মোক্ষ তিন শক্তির কর্মের শেষ অংশ এবং সে সেই নিবাসমহলে প্রত্যাবর্তন করে, যেখান থেকে সে এসেছিল। অথবা যদি চাও তাহলে একথাও বলতে পারো যে, তা আত্মার প্রবুদ্ধ প্রাণীর রূপে নিজের স্বভাবে ফিরে যাওয়ার নাম।'

সুফিদের সমমত

... এই ধরনের মতবাদ সুফিদের মধ্যে প্রচলিত। জনৈক সুফি লেখক নিম্নোক্ত মত বর্ণনা করেছেন, 'সুফিদের একটি দল আমার কাছে আমার চেয়ে কিছু দূরে

উপবেশন করল। তারপর তাদের মধ্য থেকে উঠে একজন বলল : 'উস্তাদ, আপনার এখানে এমন কোনো জায়গা কি আপনার জানা আছে যেখানে আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি ?' আমি বুঝলাম, তাদের ইচ্ছা 'শোওয়া' সম্পর্কিত এবং আমি তাদের একটি জায়গার সন্ধান দিলাম। তারা সেখানে গিয়ে পিঠটা মাটিতে দিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। তারপর আমি উঠে তাদের কাছে গিয়ে তাদের পিঠ ফিরিয়ে দিলাম, কিন্তু দেখি তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সুফিরা কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, 'আমি তাদের জন্য জমিনকে বিছানাস্বরূপ সৃষ্টি করেছি' (সুরা– ১৮ : ৮৩) যে, 'তারা যদি চায় তাহলে জমিন তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে যায়, যদি তারা চায় তাহলে পানি ও হাওয়ার উপরেও চলতে পারে যদিও এ দুই বস্তু তাদের চলার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিন্তু যখন পাহাড়-পর্বত থেকে অতিক্রম করে তখন তাদের কেউ প্রতিরোধ করে না।'

সাংখ্যমতে যারা মুক্তিলাভ করতে পারে না তাদের বর্ণনা

এবার আমরা তাদের বিষয়ে চর্চা করব, যারা কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও মোক্ষলাভের পর্যায়ে (অবস্থায়) পৌছতে পারে না। এদের কয়েকটি শ্রেণী আছে :

[যারা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে পারবে না তাদের প্রসঙ্গে 'সাংখ্য' থেকে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। অ্যামোনিয়াস, প্লেটো ও প্রোকিউলাসের ন্যায় কতিপয় ইউনানি লেখকের মতও অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপশিরোনামে লিপিবদ্ধ হয়েছে।]

পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত 'সত্য' (অর্থাৎ ঈশ্বর)-এর সাথে সুফিদের মতের মিল আছে, কেননা, তাঁরা বলেন, 'যতক্ষণ যাবৎ তুমি কোনো বস্তুর প্রতি নিজের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অদ্বৈতবাদী হতে পারবে না। কিন্তু যখন সত্য সংকেতিত বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে নষ্ট করে দেয় তখন সংকেতিত ও সাংকেতিক– কারোর আর অবশিষ্ট থাকে না।

তাদের চিন্তাধারায় (সুফি মত) কিছু মহলে এমন আছে যারা একথা বলেন যে, সর্বেশ্বরবাদীরা (ঈশ্বর) বিলীন-তত্ত্বে বিশ্বাসী : উদাহরণস্বরূপ, তাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সত্য (ঈশ্বর) কী ? এর জবাব দিল, 'সেই সত্তাকে আমি কেন না জানব, যিনি তত্ত্বত, 'আমি' (অহম) আর অন্তরীক্ষ-তে 'আমি নেই' (অহম নাস্তি) ? যদি আমি পুনরায় একথার অস্তিত্বে এসে যাই তাহলে আমি তাতে বিলীন হয়ে যাই : আর যদি আমাকে উপেক্ষা করা হয় (অর্থাৎ আমি মিলিত হব না এবং আমি সংসারে আসব না) তাহলে বায়বীয় হয়ে যাই এবং বিলয়নে (বিলীন) অভ্যস্ত হয়ে যাই।...'

আবু-ইয়াজিদ আল-বিস্তামিকে একবার কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সুফি মতে সাধনায় এত উচ্চ স্থান কীভাবে লাভ করেছেন ? তখন তিনি উত্তর দেন : 'আমি অহংকে এভাবে পরিত্যাগ করেছি, যেভাবে সাপ খোলস ত্যাগ করে। তারপর আমি আমার অহং বিষয়ে চিন্তা করেছি আর দেখেছি যে, আমি 'তিনি' অর্থাৎ ঈশ্বর হয়ে গেছি।'

আল বিরুনী একথা বলে অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন যে, সুফিদের মত হলো : 'মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে আলো এবং অন্ধকারের হাজার হাজার অবস্থা রয়েছে। মানুষের স্বভাব হলো যে, সে যত্ন সহকারে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোয় আসতে চায় এবং একবার যখন সে আলোর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় তখন সে আর কখনো অন্ধকারে ফিরে আসে না।'

অষ্টম অধ্যায়
প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের নাম

'সাংখ্য' মতে প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণী

এ অধ্যায়ের বিষয়ে অধ্যয়ন করা আর তা সঠিকরূপে অনুধাবন অত্যন্ত কঠিন, কেননা, আমরা মুসলমানরা একে বাইরে থেকে দেখি আর হিংদুরা একে বৈজ্ঞানিক ঢঙে উপস্থাপন করেননি। কিন্তু যেহেতু আমরা এ বিষয়টিকে বিশদভাবে প্রতিপাদনের জন্য একে জানতে চাই সেহেতু এই পুস্তক সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে যা কিছু শুনেছি তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। প্রথমে 'সাংখ্য' নামক পুস্তক হতে উদাহরণ পেশ করছি :

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল, 'জীবিত প্রাণীর মধ্যে কতটা শ্রেণী আর প্রজাতি আছে?'

ঋষি উত্তর দিলেন 'তাদের তিনটি শ্রেণী আছে– অশরীরীগণ ঊর্ধ্বে, মানুষ মধ্যে ও পশু নিচে। তাদের প্রজাতির সংখ্যা চৌদ্দ, আটটি অশরীরী প্রাণী যাদের অন্তর্ভুক্ত : ব্রহ্ম, ইন্দ্র, প্রজাপতি, সৌম্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস আর পিশাচ। পাঁচটি প্রজাতি পশুদের অন্তর্গত : চতুষ্পদ, বন্য জন্তু, পক্ষী, বিসর্পী জীব (সরীসৃপ) ও উদ্গমিত পদার্থ অর্থাৎ বৃক্ষ। আর সবশেষে এক প্রজাতি আছে তা হলো মানুষ।'

উপরোক্ত পুস্তকের লেখক ঐ পুস্তকের অন্য ভাষার যে সূচি বিভিন্ন নামে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা নিম্নরূপ : ব্রহ্ম, ইন্দ্র, প্রজাপতি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ, পিশাচ।

হিংদুরা এমনই এক সম্প্রদায় যে, বস্তুর ক্রম সম্ভবত কোনকালে তারা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন আর সে সবের গণনা ছিল ইচ্ছামত। সে সব নামের সংখ্যা তারা ইচ্ছামত তৈরি করেন এবং তা ইচ্ছামত ব্যবহার করেন, তা থেকে কে তাদের নিবৃত্ত করতে পারে?

লেখক অশরীরী প্রাণীর আটটি শ্রেণী গণনা করেছেন

... অধিকাংশ হিংদুর সর্বাধিক জনপ্রিয় মতানুসারে অশরীরী শ্রেণীর সংখ্যা আটটি। নিম্নে তা বর্ণিত হলো :

১। দেব : অর্থাৎ ফিরিশতা, উত্তর অংশে যাদের নিবাস।

এরা বিশেষত, হিঁদুদেরই অংশ। লোকেদের ধারণা, জুরথুস্ট শ্রমণ ও বৌদ্ধদের এ জন্য নিজের শত্রু বলে বিবেচনা করেছিলেন যে, তাঁরা অসুরদের দেবতাদের শ্রেণীতে স্থান দিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টিতে দেবতাদের স্থান সবার ঊর্ধ্বে। আর এই প্রয়োগ সেই যুগ থেকে নিয়ে আমাদের যুগের ফারসি ভাষার যুগ পর্যন্ত প্রচলিত।

২। দৈত্য : দানব বা রাক্ষস। তাদের বসবাস দক্ষিণে। তারা হিঁদুধর্মের ঘোর বিরোধী এবং গো-হত্যাকারী। তাদের সঙ্গে দেবতাদের নিকট-সম্পর্কই বা থাকবে না কেন, কিন্তু হিঁদুদের মতে, তাদের মধ্যে ঝগড়া-লড়াই কোনদিন শেষ হবে না।

৩। গন্ধর্ব : এঁরা হচ্ছেন সংগীত রচয়িতা ও গায়ক যারা দেবতাদের জন্য সংগীত রচনা করেন। তাঁদের বেশ্যাদের তাঁরা অপ্সরা বলে অভিহিত করেন।

৪। যক্ষ : দেবতাদের ধনসম্পদের কোষাধ্যক্ষ।

৫। রাক্ষস : কুরূপ ও বিকলাঙ্গ অসুর।

৬। রাক্ষস : এদের আকৃতি মানুষের মতো কিন্তু মাথা ঘোড়ার মতো। এরা ইউনানিদের কিন্নরদের (সেনটোরো) সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা, তাদের অধোভাগ সম্পূর্ণ অশ্বাকৃতির হয় এবং উপরিভাগ হয় মনুষ্যাকৃতির। কিন্নরদের আকৃতির সঙ্গে নক্ষত্রের রাশিচক্রের অধিক মিল আছে।

৭। নাগ : সর্পাকৃতির হয়ে থাকে।

৮। বিদ্যাধর : অসুর-জাদুকর যারা, এক ধরনের জাদুটোনা করে থাকে কিন্তু তার স্থায়ী কোনো ফল হয় না।

এই সূচিক্রমের আলোচনা

যদি আমরা প্রাণীদের এই সূচিক্রমের উপর আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, সর্বোপরি রয়েছে দিব্যশক্তি এবং সর্বনিম্নে রয়েছে পৈশাচিক শক্তি– দুয়ের মধ্যে আবার কিছুটা সংমিশ্রণও রয়েছে। এ সমস্ত প্রাণীদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ রয়েছে ; কেননা, তারা তাদের জীবনের এসব অবস্থা পুনর্জন্মের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছে তবে তা কর্মের মূল শক্তির কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। তারা অনেক কাল ধরে জীবিত থাকে ; কেননা, তারা কায়া (শরীর) ত্যাগ করেছে, সে জন্য তাদের পরিশ্রম করতে হয় না ; আর তারা এমন কাজ করতে সমর্থ যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তারা মানুষের সমস্ত ইচ্ছা পূর্তি করে এবং যখনই প্রয়োজন হয় তখনই তারা তাদের সমীপেই অবস্থান করে।

কিন্তু 'সাংখ্য'-এর উদাহরণের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এ মত ঠিক নয়, কেননা, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও প্রজাপতি কোনো প্রজাতিবিশেষের নাম নয় ; বরং

তা ব্যক্তি বিশেষের নাম। ব্রহ্মা ও প্রজাপতি প্রায় একই অর্থবোধক শব্দ কি
কোনো-না-কোনো গুণের কারণে তাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। ইন্দ্র স
লোকের (সমস্ত জগতের) শাসক। এর সাথেই বাসুদেব যক্ষ ও রাক্ষসদেরও অসু
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেছেন। অথচ পুরাণানুসারে যক্ষ এক দেবযোনি থেকে আগ
এবং দেবতারাও সেই পর্যায়ভুক্ত।

দেবতাদের সম্পর্কে

এরপর আমরা একথা বলতে পারি, যে অশরীরী প্রাণীর কথা আমরা পূর্বে উল্লে
করেছি, তারা মানবযোনি মানবশরীরে অবস্থানের সময় কর্মের দ্বারা এই অস্তিত্ব
অবস্থা লাভ করেন। তারা তাদের শরীরকে ত্যাগ করে এসেছেন, কেননা, শরী
ভার হয়ে থাকে, যা তাদের শরীরকে ক্ষীণ ও জীবৎকালকে ছোট করে দেয়
তাদের গুণাবলি ও দশা (সমূহ) ঐ পরিমাণেই ভিন্ন হয় যেখানে 'তিন মূলশক্তি'
মধ্যেকার কোনো-না-কোনো শক্তি তাকে প্রভাবিত করে। প্রথম শক্তি দেবতাদে
যা শান্তি ও আনন্দের সাথে অবস্থান করে। তাদের প্রধান মানসিক শক্তি 'উপাদা
ছাড়া' কোনো সূক্ষ্মতত্ত্বকে অনুধাবন করে নেওয়া ; ঠিক এরকম, যেমন মানুষে
প্রধান মানসিক শক্তি হলো এই যে, সূক্ষ্মতত্ত্বকে অনুধাবনের জন্য যে 'উপাদা
এর প্রয়োজন হয়।

হিঁদুরা মনে করেন যে, তাঁদের দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি, যার মধ্যে
মহাদেব একাই এগারো। সেজন্য, এ সংখ্যা তাঁদের উপাদানগুলোর সঙ্গে
সম্পর্কিত এবং তাঁদের নাম (মহাদেব) থেকেও এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখা
আমরা দেবতাদের যে মোট সংখ্যা প্রদান করেছি, তা হলো এই সংখ
৩৩,০০,০০,০০০।

এছাড়া এরা দেবতাদের মতোই খায়, পান করে, সম্ভোগ করে, বেঁচে থা
এবং মৃত্যুবরণ করে ; কেননা, তারা প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করে ; যদি
তাদের অস্তিত্ব খুবই সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত সরল, আর তা তারা তাদের যোনি জ্ঞান দ্বা
নয় ; বরং কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। 'পাতঞ্জল'-এ এ সমস্ত বর্ণনাও এসেছে যে
নন্দিকেশর মহাদেবের নামে অনেক যজ্ঞ করেন আর তারই ফলস্বরূপ, তা
মানবশরীরের দ্বারা স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর রাজা ইন্দ্র যেহেতু নহুষ নাম
ব্রাহ্মণের পত্নীর সাথে যৌন সম্ভোগ করেছিলেন, সেহেতু তার দণ্ডস্বরূপ তা
সর্পদেহে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়।

পিতর ও ঋষি

দেবতাদের পরে পিতর অর্থাৎ পূর্ব পুরুষদের শ্রেণী আসে, তারপর ভূতের, অর্থ
সেই মানুষদের যারা নিজেদেরকে অশরীরী প্রাণীদের (দেবতা) সঙ্গে সম্পর্কি

করে নিয়েছে, আর তারা দেবতা ও মানুষদের মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। যারা এ অবস্থা ধারণ করেছে কিন্তু যারা শরীর থেকে মুক্ত নয়, তারা হচ্ছে ঋষি, সিদ্ধ অথবা মুনি, আর এদের নিজ-নিজ বিশেষত্বের কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। সিদ্ধ তারাই যারা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে এসব অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, যারা সংসারে যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে, কিন্তু যাদের এর পরে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই ; আর যারা মুক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য আর কোনো প্রয়াস চালায় না, তারা উঠে যান অর্থাৎ ঋষি পর্যায়ে উন্নীত হন। যদি এক ব্রাহ্মণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহলে তাকে ব্রহ্মর্ষি বলা হয়। আর যদি ক্ষত্রিয় প্রাপ্ত হন তাহলে তাকে রাজর্ষি বলা হয়। নিম্নশ্রেণীর কারো পক্ষে এ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। ঋষি সেই সিদ্ধ পুরুষকে বলা হয় যে মানুষ হয় কিন্তু নিজের জ্ঞান-বল (শক্তি) দ্বারা দেবতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এজন্য দেবতারাও তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে এবং ব্রহ্মা ছাড়া তাদের উর্ধ্বে আর কেউ স্থান পেতে পারে না।

ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষির পরে ঐ গণশ্রেণী আসে যারা আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, এসব জাতি-শ্রেণীর কথা আমরা ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ব্রহ্মা, নারায়ণ ও রুদ্রের ত্রিমূর্তি বিষ্ণু

পরে গণনাকৃত এ সমস্ত প্রাণীই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। এখন যেখানে এই ধারণার সম্পর্ক, যা প্রকৃতির উর্ধ্বে সেখানে আমরা একথা বলতে পারি যে, প্রকৃতি ও দিব্য ধারণার মধ্যে এক মহাতত্ত্ব আছে, যার স্থান প্রকৃতির উর্ধ্বে তিন মূলশক্তির মহাতত্ত্বের মধ্যে নিহিত থাকে আর যা গতিশীলও থাকে। এই প্রকার মহাতত্ত্বে আর যা কিছু তার অন্তর্গত– এর উপর ও নিচের মধ্যে একটা সংযোগ সেতু আছে।

যে জীবন আদি কারণের ঐকান্তিক প্রভাবের মধ্যে এসে মহাতত্ত্বে বিচরণ করে তাকে ব্রহ্মা, প্রজাপতি বলে এবং তার অন্য কোনো নামও আছে যা হিন্দুদের ধর্মসিদ্ধান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তার ক্রিয়াশীলতার প্রশ্ন, সেখানে তা জীবন-প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে থাকে, কেননা, সমস্ত সৃষ্টি, এমনকি জগৎ-সংসারের সৃষ্টিও হিন্দুদের মতে, ব্রহ্মার দ্বারাই (সম্পন্ন) হয়েছে।

যে জীবনই মহাতত্ত্বের দ্বিতীয় শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচরণ করে, হিন্দুদের লোককথাগুলোতে তাকে নারায়ণ বলা হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় তা প্রকৃতি, যে আপন ক্রিয়াশীলতাকে সমাপ্ত করে দিয়েছে এবং যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে তার সুরক্ষার জন্য তা সপ্রচেষ্ট থাকে। অতএব, নারায়ণ সংসারকে স্থায়িত্ব প্রদান করেন।

যে জীবনই মহাতত্ত্বের তৃতীয় শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘুরতে থাকে তাকে মহাদেব ও শঙ্কর বলে কিন্তু তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে রুদ্র। তার কাজ হলো

বিনাশ ও ধ্বংস। যেমন প্রকৃতি তার ক্রিয়াশীলতার অন্তিম পর্যায়ে তার শক্তি হারিয়ে ক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি।

এই তিন সত্তার পৃথক পৃথক নাম আছে যারা বিভিন্ন অবস্থায় উপর ও নিচে যাতায়াত করে এবং সেই অনুসারে তাদের কর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

কিন্তু এ সমস্ত সত্তার আগে আরও এক স্রোত (প্রবাহ বা ধারা) আছে যেখান থেকে প্রত্যেক বস্তুর উদ্গম হয়েছে আর সে-ই একত্বের মধ্যে এই তিন বস্তুকে একত্রিত করে এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। এই একত্বকে তারা বিষ্ণু বলে সংজ্ঞায়িত করে ; এ এমন একটা সংজ্ঞা যা মধ্যশক্তিকে আরও উচিত সঙ্গতভাবে প্রকাশ করে ; কিন্তু কখনো কখনো তো তারা এই মধ্যশক্তি ও আদি কারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না (অর্থাৎ নারায়ণকেই আদি কারণ বলে মনে করে)।

এখানে হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে মতের মিল লক্ষ করা যায়, কেননা, খ্রিষ্টানরা এই তিন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে এবং তাদের আলাদা-আলাদা নাম দিয়েছে– পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা– কিন্তু এরা তাকে একই তত্ত্ব বলে মনে করে।

হিন্দু ধর্মের সিদ্ধান্তগুলোকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করার পর এই পরিণাম (ফলাফল) আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। যেখানে তাদের লোককথার সম্পর্ক রয়েছে, তা হাস্যাস্পদ ধারণায় পরিপূর্ণ। এসব আলোচনা আমরা পরে করব। এ কথা জেনে আপনাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, হিন্দুরা দেবতাদের– যাদের আমরা ফিরিশতা বলি– তাদের সম্পর্কে রচিত কথা-কাহিনিতে সমস্ত রকমের কথাবার্তা (ধ্যান-ধারণা) আরোপিত করেছে ; তা তো অসঙ্গত বটেই কিন্তু তাতে এমনকিছু আছে যা আপত্তিকর নয় ; কিন্তু আরও কিছু আছে যা নিশ্চিতরূপে আপত্তিকর। এ দুই ধরনের ধ্যান-ধারণাকে– প্রকাশ্যতই, ইসলামবেত্তারা ফিরিশতাদের গরিমা ও প্রকৃতিকে বিপরীত বলে মনে করবেন।

ইউনানিদের সমত : জিউস সম্পর্কিত কাহিনি

যদি আপনি এসমস্ত লোককথাগুলোর সাথে ইউনানিদের ধর্ম-সংক্রান্ত লোক-কথাগুলোর তুলনা করেন তাহলে হিঁদুদের এ ব্যবস্থা আপনার কাছে মোটেই বিচিত্র বলে প্রতীত হবে না...।

[জিউস-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আল বিরুনী বলেছেন– যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে ; ইউনানিদের কাহিনিগুলোর তুলনায় হিঁদুদের কাহিনি কম বিচিত্র ছিল। দ্রষ্টব্য : সপ্তদশ অধ্যায়।]

নবম অধ্যায়

জাতিসমূহ, যাদের বর্ণ বলা হয় তাদের নিম্নতম শ্রেণী

সিংহাসন ও বলিকাঠ

যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ও মানবনির্মিত এমন কোনো ব্যবস্থার প্রচলন (স্থাপন) করা যায়, যিনি স্বভাবগতভাবেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবেন, যিনি নিজের চারিত্র-শক্তির জোরে বাস্তবে শাসক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, এমন মানুষের যার অটল বিশ্বাস রয়েছে এবং কৃতসংকল্পে যিনি সুদৃঢ়, যার বিপদের সময় ভাগ্য সহায় হয় অর্থাৎ লোকে যার গুণাবলির সাথে সুপরিচিত হয়ে তাকে সহায়তা দেয় তাহলে এমন ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যাদের জন্য তা স্থাপিত করা হয়েছিল। তা পর্বতের ন্যায় অটল ও সুদৃঢ় হবে। এই ব্যবস্থা তাদের এবং তাদের সমস্ত প্রজন্মের উপর সর্বমান্য নিয়মরূপে যুগ-যুগান্তর ধরে চলতে থাকবে। আর যদি রাজ্য অথবা সমাজের এই রূপের বুনিয়াদ কিছুটা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং এ দুটি– বাক্য ও ধর্ম-এর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে তাহলে ঐ দুয়ের সংযোগে মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে থাকলে মানুষের মধ্যে আর অন্য ইচ্ছা জাগবে না।

প্রাচীনকালের রাজ-রাজড়ারা বড় অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্যকর্ম নির্বাহ করতেন এবং নিজেদের মনোযোগ প্রজাদের বিভিন্ন শ্রেণীর ও তাদের বিভাজনের প্রতি কেন্দ্রীভূত রাখতেন এবং সর্বদাই চেষ্টা চালাতেন যে, তারা যেন পরস্পরে মিলেমিশে না থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো অব্যবস্থা সৃষ্টি না হয়। এ জন্য তারা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের একে-অন্যের সঙ্গে মেলামেশা (সংসর্গ) নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিশেষ ধরনের কাজ বা কলাকৌশল নির্ধারিত করে দিতেন। তারা কোনো শ্রেণীকেই তাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে দেননি ; বরং যারা নিজেদের শ্রেণীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাদের শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

প্রাচীন ইরানি জাতিসমূহ

এসব বৃত্তান্ত প্রাচীন খুসরো (ইরানের সম্রাট)-দের ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। তারা এ ধরনের অনেক বড় প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন যেখানে কোনো ব্যক্তি নিজের বিশেষ যোগ্যতার কারণে অথবা উৎকোচাদি দিয়েও সে প্রথা ভাঙতে পারত না। যখন আর্দশীর বিন বাবক পারস্য সাম্রাজ্য পুনরাধিকার করেন তখন তিনি প্রজাসাধারণকে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীতে পুনর্বিভাজন করেন। সে শ্রেণী ও জাতি ছিল নিম্নপ্রকার–

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সামন্ত রাজগণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল মঠবাসী, অগ্নিপূজক, পুরোহিত ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণ।

তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল বৈদ্য, জ্যোতিষী ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ।

চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল কৃষক ও শিল্পীগণ।

আর এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার উপশ্রেণীও যেমন ছিল তেমনি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীও ছিল। এই ধরনের প্রথা এক সময় বংশপ্রাধান্য বিস্তার করে বংশরক্ষার রূপ ধারণ করে এবং ততদিন পর্যন্ত তার গুরুত্ব থাকে যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের মূলভিত্তিকে স্মরণে রাখে ; কিন্তু একবার তারা তাদের মূলকে বিস্মৃত হয়ে গেলে, তারা সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে এসে যায়, আর তাদের মূলভিত্তি সম্পর্কে কারো আর কোনো সন্দেহ থাকে না এবং এ ধরনের বিস্মরণ এক দীর্ঘকাল– কয়েক শতাব্দী ও প্রজন্মের– পরিণাম হয়ে থাকে।

হিঁদুদের মধ্যে এ ধরনের অসংখ্য প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু যেখানে আমাদের মুসলমানদের প্রশ্ন আসে, সেখানে অবস্থা হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ধর্মপরায়ণতার নিরিখে সমস্ত মানুষকে আমরা সমান মর্যাদা দিয়ে থাকি। আর এটাই হলো হিঁদুদের সাথে সম্পর্ক, নৈকট্য ও মেলামেশার পথে প্রধান অন্তরায়...।

চারজাতি

হিঁদুরা তাদের জাতিসমূহকে 'বর্ণ' বলে অভিহিত করে। বংশাবলির দৃষ্টিতে তারা তাকে জাতক অর্থাৎ জনম বলে অভিহিত করে। শুরু থেকেই তাদের এ জাতি বিভাগ হলো চার প্রকার :

১। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি (বর্ণ) হলো ব্রাহ্মণ। যাদের সম্পর্কে হিঁদুশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এরা ব্রহ্মার মস্তক থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আর যেহেতু ব্রহ্মা প্রকৃতি নামক শক্তির অন্যতম নাম এবং মাথা প্রাণীর সবচেয়ে উঁচু অংশে অবস্থিত, সেহেতু ব্রাহ্মণদের মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে।

২। এর পরবর্তী জাতি ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার স্কন্ধরূপ হতে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেজন্য তাদের স্থান ব্রাহ্মণদের কিছু নিচে বলে গণ্য করা হয়।

৩। তৃতীয় জাতি বৈশ্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা এসেছে ব্রহ্মার জংঘা (উরু) থেকে।

৪। আর শূদ্ররা সৃষ্ট হয়েছে ব্রহ্মার পদদেশ হতে।

শেষোক্ত দুটি জাতির মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু নেই। যদিও এই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভেদাভেদ রয়েছে ; তা সত্ত্বেও নগর ও গ্রামগুলোতে তারা একই সাথে বসবাস করে এবং একই প্রকারের বাড়ি ঘরে তারা মিলেমিশে বসবাস করে।

নীচুজাতির লোক

শূদ্রদের পরবর্তী পর্যায়ের লোকেদের তারা অন্ত্যজ বলে অভিহিত করে। তারা বিভিন্ন ধরনের নীচু কাজকর্ম করে থাকে এবং কোনো জাতির মধ্যে তাদের গণ্য করা হয় না ; বরং কোনো বিশেষ শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য বলে মনে করা হয়। তাদেরও আটটি শ্রেণী রয়েছে। তাদের মধ্যে ধোপা, চামার ও জেলেদের বাদ দিয়ে– যাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক তারা রাখতে চায় না, তাদের পরস্পরের মধ্যে দৈহিক সম্পর্কও বিদ্যমান রয়েছে। এ আট শিল্পী হলো– ধোপা, চামার, বাজিকর, বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র নির্মাণকারী ও ঢাল-নির্মাতা, নাবিক বা মাঝিমাল্লা, জেলে, বেহারা ও জোলা। চার জাতের লোকেরা একই স্থানে তাদের সঙ্গে বসবাস করে না। এ শিল্পীরা চার জাতের বসবাসের স্থান নগর ও গ্রামেই বাস করে– কিন্তু তারা বাইরে বাস করে।

হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ও ব্যাধ নামক লোকেদের কোনো জাতি বা পেশার মধ্যে গণ্য করা হয় না। তারা নোংরা কাজগুলো করে, যেমন গ্রামগুলোকে পরিষ্কার করে ও অন্যান্য ছোট কাজ করে। তাদের সবাইকে একই শ্রেণীতে গণ্য করা হয় এবং তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পেশাগত পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিকই তারা তাদের অবৈধ সন্তান বলে গণ্য করে, কেননা, জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, তারা শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার জারজ সন্তান, সে জন্য এই নিম্ন কোটির লোকেরা অচ্ছুত, অস্পৃশ্য।

জাতিগুলোর পেশা ও তাদের বিভিন্ন নাম

হিন্দুরা এই চার জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে পেশাগত কারণে বিভিন্ন নাম দিয়ে রেখেছে, যা তাদের পেশারই পরিচয়বাহী। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাহ্মণকে তখন পর্যন্তই ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়, যতক্ষণ সে ঘরে বসে নিজের কর্মে লিপ্ত থাকে। যখন

সে এক অগ্নির পুজো করে, তখন তাকে বলা হয় 'ইস্টিন' আর সে যখন এ ছাড়া অগ্নিতে আহুতিও দেয় তখন তাকে বলা হয় 'দীক্ষিত'। আর যে ধরনের সংজ্ঞা ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয়, ঐ রকমই অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিচে যে শ্রেণীর নাম অন্তর্ভুক্ত, তাদের মধ্যে হাড়িরা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা, তারা সমস্ত রকমের দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে দূরে অবস্থান করে। এর পরে আসে ডোমদের নাম, এদের কাজ হলো বাঁশি বাজানো ও গান করা। এর চেয়েও নীচু জাতের লোকেদের পেশা হলো বধ করা ও রাজকীয় দণ্ডাদেশ কার্যকর করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জাতি হলো ব্যাধ, যারা শুধু মৃত জীবজন্তুর নয় ; বরং কুকুর ও অন্যান্য বন্যজন্তুদের মাংসও ভক্ষণ করে।

এই চার জাতির মধ্যে প্রত্যেক জাতির সদস্যরা যদি একই স্থানে বসে খাওয়া-দাওয়া করে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য দল বানানো আবশ্যক, যাতে এক দলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুই ব্যক্তি না আসতে পারে। এছাড়া ব্রাহ্মণদের দলভুক্ত দুজন ব্যক্তির মধ্যে যদি শত্রুতা থাকে এবং তারা যদি দুই হাত পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থলে একটি তক্তা খাড়া করে অথবা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে বা অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে তাদের মধ্যে একটি অন্তরায় সৃষ্টি করে, আর যদি তা-ও না হয় তাহলে দুজনের মধ্যে একটি রেখা বা দাগ কেটে দিয়ে তাদের পৃথক বলে গণ্য করে। কেননা, এঁটো খাওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে জন্য প্রতিটি ব্যক্তির এতটা পরিমাণ খাদ্য পাত্রে নেওয়া উচিত যাতে খাওয়ার পর আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। কারণ, কোনো ব্যক্তি তার খাদ্যপাত্রে মূল পাত্র হতে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে, তাতে যদি খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তাহলে অন্য ব্যক্তি তা থেকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এঁটো হাতে তা থেকে কিছু নিলে তা ঝুটা হয়ে যাবে এবং ঝুটা নিষিদ্ধ বস্তু।

এ চার জাতির এই হলো অবস্থা।

মোক্ষ ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

হিঁদুদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ প্রচলিত আছে যে, এই জাতিগুলোর মধ্যে কোন জাতি মোক্ষপ্রাপ্তির ক্ষমতা রাখে ? কিছু লোকের মত হলো, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই এর যোগ্য, কেননা, অন্য জাতির লোকেরা বেদাধ্যয়ন করতে পারে না, যেখানে হিঁদু দর্শনের মতে, সমস্ত জাতিই মুক্তি পেতে পারে ; বরং সমস্ত মানবজাতিই মুক্তির পাত্র হতে পারে, যদি তাদের মুক্তি পাওয়ার নিয়ত (উদ্দেশ্য) আগাগোড়া ঠিক থাকে। এই কথার উপর ভিত্তি করেই ব্যাস বলেন, 'পঁচিশটি কথা (কাজ) ঠিকমত শিখে নাও, তারপর যে ধর্ম ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো, তোমরা নিঃসন্দেহে মুক্তি পাবে।' এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে

যে, বাসুদেব শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এরই উপরে ভিত্তি করে তিনি অর্জুনকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'ভগবান কারো সঙ্গে কোনো প্রকার অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব না করেই তার কর্মফল প্রদান করেন। যদি লোক পুণ্যকর্ম করার সময় তাঁকে ভুলে যায় তাহলে তিনি পুণ্যকে পাপ ও পাপকে পুণ্য বলে গণ্য করেন, যদি লোক পাপ করার সময় তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁকে বিস্মৃত না হয়, তা সে বৈশ্য, শূদ্র, নারী যেই হোক না কেন (সবার ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য)। আর যদি তারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয় তাহলে তাঁর দয়ার পরিমাণ কতটা হবে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়।'

দশম অধ্যায়

হিন্দুদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলির মূল উৎস, তাদের একক আইন রদ

ইউনানিদের ধর্ম ও শাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন ঋষিগণ

প্রাচীন ইউনানিরা তাদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলির শিক্ষা তাদের ঋষিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সম্পর্কে সে দেশের জনগণের ধারণা ছিল যে, এরা এসব নিয়মাবলি দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। এই ঋষিরা ছিলেন সোলান, ড্রেকো, পিথাগোরাস, মিনোস প্রমুখ। তাদের রাজারাও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, কেননা, মুসা-র পরে লিওনাস প্রায় দুশো বছর যাবৎ সামুদ্রিক দূষণ ও ক্রেটিন শাসনকালে এই নিয়মের কথাই তাদের বলেছিলেন এবং আরও বলেছিলেন যে, এই নিয়ম তিনি জিউসের কাছ থেকে লাভ করেছেন। মিনোসও সেই যুগে একই নিয়মের কথা বলেছিলেন...।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রণেতারা ঋষি ছিলেন

ইউনানিদের ন্যায় একই অবস্থা ছিল হিন্দুদেরও। তাদের বিশ্বাস যে, তাদের ধার্মিক বিধিবিধান ও সে সবের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের মূল উৎসে ছিলেন মুনি-ঋষিরা, যারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের মূল স্তম্ভ; তাঁরা এসব নিয়মাবলি দেবদূত অর্থাৎ নারায়ণ থেকে গ্রহণ করেননি, কেননা, তিনি যখনই পৃথিবীতে আসেন তখনই মানুষের কাছে অবতার নিয়ে আসেন। তাঁর এ জগৎ সংসারে অবতরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেই সমস্ত কু-রীতিকে নষ্ট (বা ধ্বংস) করে দেওয়া যা জগৎ সংসারের জন্য বিনাশকারী, অথবা এ সংসারে যখনই কোনো দোষ উৎপন্ন হয় তখন তা উৎপাটনের জন্যই তিনি জন্ম নেন। এর অতিরিক্ত কোনো নিয়মকে অন্য কোনো কিছুর দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না, কেননা, সেখানে নিয়মের আবশ্যকীয় রূপটি সেখানেই রক্ষিত। সেজন্য যেখানে নিয়ম ও উপাসনার প্রশ্ন, সেখানে তারা দেবদূতদের সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করে না, যদিও সৃষ্টির অন্যান্য বিষয়াবলিতে তারা কখনো কখনো দেবতাদের প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে স্মরণ করে।

নিয়মাবলির পরিবর্তন করা যায় কি না

যেখানে নিয়মাবলির পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থিত হয়, তখন এমন মনে হয় যে, হিঁদুদের জন্য এটা অসম্ভব কিছু নয় ; কেননা, তাদের মতে, এমন অনেক জিনিস আছে যা বর্জনযোগ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। যেমন বাসুদেবের অবতরণের পূর্বে যা ভক্ষণের অনুমতি ছিল, যেমন গোমাংস। এ ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এ জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল, যখন মানুষের স্বভাব বদলে গিয়েছিল এবং তারা এতটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তাদের কর্তব্যের ভার বইতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এ সকল পরিবর্তনের সাথে 'বিবাহ পদ্ধতি' ও 'বংশগত সিদ্ধান্ত' ও সম্পর্কিত বিষয়ও জুড়ে রয়েছে, কেননা, প্রাচীনকালে কোনো বংশের বংশগত সম্পর্ক নির্ধারণের তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতি

১। কোনো মানুষের বৈধ পত্নী থেকে উৎপন্ন সন্তান পিতৃ-পরিচয়ের দ্বারা পরিচিত হয় ; যেমন– আমাদের মধ্যে যেমন প্রচলিত আছে, হিঁদুদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি।

২। যদি কোনো ব্যক্তি কারো স্ত্রীকে বিয়ে করে এবং তার থেকে কোনো সন্তান জন্মলাভ করে, এছাড়া যদি বৈবাহিক-সূত্রে এই শর্ত থাকে যে, স্ত্রীর বাচ্চা ঐ স্ত্রীর বলে মান্য করা হয় তাহলে ঐ বাচ্চা তার নানার সন্তান বলে গণ্য হবে, যে এই শর্ত আরোপ করেছিল, সে তার পিতার সন্তান বলে গণ্য হবে না।

৩। যদি কোনো পরপুরুষের বিবাহিত পত্নী থেকে কোনো সন্তান জন্মায় তাহলে সে সন্তান ঐ স্ত্রীর স্বামীর বলে গণ্য হবে, কেননা, স্ত্রী ক্ষেত্রের তুল্য, যা থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়েছে, তা স্বামীরই সম্পত্তি এবং তার জন্য তা প্রথম থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, বীজ-বপন অর্থাৎ সম্ভোগ স্বামীর স্বেচ্ছাক্রমেই সম্ভব হতে পারে।

... এ সমস্ত প্রথা সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তাকে রহিত রদ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এজন্য আমরা তাদের ঐতিহ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, সিদ্ধান্ত হিসেবে নিয়ম রহিত করা স্বীকৃতিযোগ্য কাজ।

তিব্বতীয় ও আরবীয়দের সাথে বিভিন্ন প্রকারের বিবাহের বিবরণ

যেখানে অস্বাভাবিক ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কের প্রশ্ন, সেখানে আমরা স্পষ্টভাবে বলে নিতে চাই যে, এ ধরনের বিবাহ আমাদের যুগে আজও ঠিক ঐরকমই বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি ইসলাম-পূর্ব (জাহেলিয়াতের যুগে বা মূর্খতার বা অন্ধকার) যুগে আরবীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এর কারণ এটাই হয়ে থাকবে যে

'পঞ্চীর' রাজ্য থেকে শুরু করে কাশ্মিরের আশপাশের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে বসবাসরত লোকেদের মধ্যে এ প্রথা আজও প্রচলিত আছে যে, কয়েকজন ভাই মিলে এক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে। ইসলাম-পূর্ব আরবেও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল :

১। এক আরব তার পত্নীকে আদেশ দিত যে, সে তার পছন্দমত যে কোনো পুরুষের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হোক ; এরপর স্ত্রী গর্ভধারণের সময়ে সে, তার থেকে পৃথক হয়ে যেত, কেননা, সে চাইত যে, সে তার গর্ভে এক কুলীন ও উদার সন্তান ধারণ করুক। এ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত তৃতীয় প্রকারের বিবাহের সঙ্গে সমতাপূর্ণ।

২। দ্বিতীয় রীতি ছিল যে, এক আরব অন্য এক ব্যক্তিকে বলত, 'তোমার পত্নীকে তুমি আমার দায়িত্বে দাও আর আমার পত্নীকে তুমি তোমার দায়িত্বে রাখো।' তারা এভাবে স্ত্রী আদান-প্রদান করত।

৩। তৃতীয় প্রকারের রীতি ছিল যে, কয়েকজন লোক মিলে একই স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করত। আর যখন সে কোনো সন্তান জন্ম দিত তখন সে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যেকার একজনকে তার সন্তানের পিতা বলে দেখিয়ে দিত, আর তা-ও মেনে নেওয়া না হলে জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হতে হতো, তখন জ্যোতিষী যা বলত তারা তা মেনে নিত।

৪। নিকাহ-আল মক্ত– অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার পিতা বা তার পুত্রের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করত– তখন এ ধরনের বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তানকে 'জিজান' বলা হতো। এটা ঠিক এরকমই, যেমনটি ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কেননা, ইহুদিদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মানুষের উচিত তার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা, যদি তার ভাই কোনো সন্তান দিয়ে না যায় তাহলে মৃত ভাইয়ের বংশধারা জারি রাখা উচিত, আর সে সন্তান তার আসল পিতার (অর্থাৎ যার ঔরসজাত) না হয়ে ঐ মৃত ব্যক্তির সন্তান বলে গণ্য করা হয়। এভাবে, তারা চায় যে, তাদের ভাইয়ের স্মৃতি সংসার থেকে যেন লুপ্ত না হয়ে যায়। হিব্রু ভাষায় এ ধরনের বিবাহিত ব্যক্তিকে 'ইয়ারহাম' বলা হয়।

[অগ্নিপূজকদের মধ্যে প্রচলিত এই ধরনের এক প্রথার বিবরণ অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে ও উনবিংশ অধ্যায়ের প্রথমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।]

আমরা এ ধরনের বিবরণ এখানে এ জন্য লিপিবদ্ধ করলাম, যাতে পাঠক বিষয়টি তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ইসলামের বিবাহপ্রথা এসবের তুলনায় কতটা শ্রেষ্ঠ আর এ ধরনের তুলনা থেকে ইসলামের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি রেওয়াজগুলো কী ধরনের মন্দ ও নিকৃষ্ট তা এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

একাদশ অধ্যায়

মূর্তিপূজার উদ্ভব ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির বর্ণনা

পূজার উদ্ভব : মানুষের স্বভাব

একথা সর্বজনবিদিত যে, জনসাধারণের প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়গোচর জগতের প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে আর অমূর্ত চিন্তনের প্রতি তার ঘোর অরুচি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ; কেননা, ঐ বিষয়টি কেবল সুশিক্ষিত মানুষেরাই অনুভব করতে পারে, সকল দেশে আর সকল কালে যাদের সংখ্যা খুবই কমই হয়ে থাকে। আর যেহেতু জনসাধারণ মূর্ত ও সাকার রূপকেই মৌনভাবে স্বীকার করে নেয় সেজন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অগণিত নেতা আজও তাদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন। কেননা, তারা তাদের পুস্তকসমূহ ও উপাসনা-গৃহগুলোতে এই ধরনের মূর্তি স্থাপন করেছেন, আর এদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তো আছেই, সেই সাথে মানিকিবাদীরাও আছে। আমার এসব কথার অর্থ একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যদি উদাহরণস্বরূপ আমাদের পয়গম্বর ও কাবাগৃহের একটি ছবি বানানো হয় এবং কোনো অশিক্ষিত নারী এবং পুরুষের সামনে তা পেশ করা হয় তাহলে তা দেখে তো তারা আহ্লাদিত হবেই, আর সেই সাথে সেই ছবিতে তারা চুমু খাবে, তাকে গালে গলায় সব জায়গায় রেখে আদর করবে এবং সামনে রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, যেন তারা কোনো ছবি দেখছে না ; বরং মূল ব্যক্তিকেই দর্শন করছে এবং এমন অনুভব করবে যেন মক্কা-মদিনায় হজের ছোট-বড় হুকুম-আহকামগুলো সে (সংস্কার) পালন করছে।

কারণ এটাই, যা তাকে মূর্তি তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করে আর তারা কিছু অত্যধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, পয়গম্বর, মুনি-ঋষি, ফিরিশতা ইত্যাদির সম্মানে স্মারক নির্মাণ করে, যার উদ্দেশ্য অনুপস্থিতির সময়ে বা মরণের পরে তাদের স্মৃতি তৈরি করে রাখা আর তাদের জন্য মরণের সময়ে মানুষেরও মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু ঐ স্মারক স্থাপনার পেছনে যখন অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অথবা একের পর এক প্রজন্ম ও শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন তাদের মূল ভাবনাকে বিস্মৃত করে দেওয়া হয় এবং তখন তার তা একটা উৎস

(মূল ভাবধারা, বা মিথ বা উৎসভূমি) হয়ে যায় এবং তার মর্যাদা ও রীতি জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়।

যেহেতু এর মূল ভিতটি জনসাধারণের স্বভাবের গভীরে প্রোথিত হয়ে যায় সেজন্য মহাকালের বিধি-নিয়মের প্রণেতারা তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের প্রভাবিত করার প্রয়াস চালায়। এভাবে তাদের চিত্র ও স্মৃতিচিহ্নগুলোকে সম্মান করাটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের অনিবার্য অঙ্গ বানিয়ে দেওয়া হয়। যেমনটি মহাপ্লাবনের পূর্বে এবং পরে দুই যুগের শিলালিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু লোক তো এ দাবিও করে যে, আল্লাহতায়ালা কর্তৃক পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে সমগ্র মানবজাতি মূর্তিপূজা করত।

মূর্তিপূজা নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

কিন্তু যেহেতু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হিঁদুদের ব্যবস্থাপনা ও তাদের সিদ্ধান্তগুলো নিরূপণ করা, সেজন্য আমরা তাদের হাস্যস্পদ ধ্যান-ধারণাগুলোও আলোচনা করব কিন্তু সেই সাথে আমরা একথাও স্পষ্ট করে দেব যে, এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত আছে। এর কারণ এই যে, এ সমস্ত লোকেরা, যারা মুক্তি পথের পথিক, বা যারা দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং যারা অমূর্ত সত্যকে লাভ করতে ইচ্ছুক, যাকে তারা 'সার' বলে, তারা ঈশ্বর ছাড়া আর কারোরই উপাসনা করে না, আর তারা ঐ ঈশ্বরকে মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করে তার উপাসনা করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

[এরপরে রাজা অম্বরিশের কথা এসেছে, যিনি তার সকল শাসনকার্যের পরে নিজেকে ধ্যান-জ্ঞান ও পূজাপাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তা দেখে ইন্দ্র তার সামনে প্রকাশ হয়েছিলেন এবং অম্বরিশের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যখনই মানবসুলভ বিস্মরণশীলতা তোমাকে অভিভূত করে তখন তোমাকে নিজের জন্য এমন একটা প্রতিমা বানিয়ে নেওয়া উচিত, যেমনটি আমি তোমার উপর প্রকাশ করেছিলাম, মূর্তিবেদির উপর সুগন্ধ ও ফুল ছড়িয়ে তেমনই তুমি আমাকে আরাধনা করবে। এভাবে তুমি আমাকে স্মরণ রাখবে।– দ্র. অধ্যায় ২০ ও ২১।

...হিঁদুরা বলেন যে, ঐ সময় থেকে মূর্তি নির্মাণ হয়ে আসছে। কিছুতে তো চারটি হাত তৈরি করে, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, আর কেউ বা তাতে দুটি হাতই তৈরি করে। আর এসব তাদের ধর্মের কাহিনি ও বর্ণনানুসারে অর্থাৎ যে দেবতাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাদের মূর্তি সেইভাবে নির্মিত হয়ে থাকে।

মুলতানের আদিত্য নামক প্রতিমা

হিঁদুদের একটি প্রতিমা আছে মুলতানে। সেটি সূর্যের উদ্দেশে নিবেদিত বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আদিত্য'। এটি কাঠ দিয়ে নির্মাণ করে তাকে লাল চামড়া দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তার দুই চোখে দুটি লাল মানিক বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে যে, এটি অন্তিম 'কৃতযুগ'-এ নির্মিত হয়েছিল। একথা যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এটি কৃতযুগের শেষে নির্মিত হয়েছিল, তাহলে তো তা নির্মাণের পরে ২১৬, ৪৩২ বছর অতীত হয়ে গেছে। মুহম্মদ ইবন-আল-কাসিম ইবন আল-মুনব্বী যখন মুলতান জয় করেন তখন তো তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, এ নগর কীভাবে এমন সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এত বেশি রাজস্ব এখানে কীভাবে জমা হয়েছে ? পরে তিনি জানতে পারেন যে, এর কারণ ছিল এই মূর্তি। কেননা, এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে তীর্থযাত্রীদের আগমন ঘটত। এজন্য তিনি মূর্তিকে এভাবেই রাখা হোক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ মূর্তির গলায় এক টুকরো গরুর মাংস ঝুলিয়ে দিলেন উপহাস করার জন্য। ঐ স্থানে একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়। পরে যখন কারামতিরা[14] মুলতান অধিকার করে তখন জালাস ইবনে শায়বান ঐ স্থানটি অবৈধভাবে অধিকার করে ঐ মূর্তিটিকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেন এবং তার পূজারিদের হত্যা করেন। তিনি ঐ স্থানে ইট দ্বারা নির্মিত উঁচু রাজপ্রাসাদ যা প্রকৃতপক্ষে একটি কেল্লা ছিল, পুরাতন মসজিদও ছিল, তাকে নতুন মসজিদে রূপান্তরিত করেন। বনি উমাইয়াদের শাসনকালে সেখানে যা কিছু হয়েছিল, তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি তা (মসজিদ) বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেন। পরে যখন শাহজাদা মাহমুদ উমাইয়া খলিফাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেন তখন তিনি পুরাতন মসজিদটি জুমআর নামাজের জন্য খুলে দেন এবং অন্য মসজিদটি বিরান হয়ে পড়ে থাকে। এখন তা কেবল একটি গুদাম ঘরে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে একটি মেহদি বাগান গড়ে উঠেছে...।

চক্রস্বামিন্ নামে অভিহিত থানেশ্বরের মূর্তি

থানেশ্বর নগরের প্রতি হিঁদুদের অপরিসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। সেখানে যে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে চক্রস্বামিন্ বলা হয়, যার অর্থ চক্র নামক অস্ত্রের প্রতিভূ...। এটি কাঁসা নামক ধাতু দিয়ে নির্মিত মানুষ-আকারের মূর্তি। এখন তা গজনার রঙ্গভূমির কাছে সোমনাথের মূর্তির সঙ্গে, যা শিবলিঙ্গের প্রতীক, পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সোমনাথ প্রসঙ্গে পরে আমরা (তথ্য সামগ্রীসহ) বিস্তারিত আলোচনা করব। কথিত আছে, চক্রস্বামিন্-এর মূর্তি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারকরূপে নির্মিত হয়েছিল।

কাশ্মিরের শারদার মূর্তি

কাশ্মিরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সে রাজ্যের রাজধানী থেকে দু-তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত 'বেলার'-এর পার্বত্য অঞ্চলে শারদা নামে একটি মূর্তি আছে যেটি দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রীরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে সমবেত হয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তা দর্শন করে।

বরাহমিহিরের 'সংহিতা'র উদাহরণ

এবার আমরা বরাহমিহিরের 'সংহিতা' নামক গ্রন্থের সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় উদ্ধৃত করব যাতে মূর্তিনির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, যার মাধ্যমে অধীত বিষয়টি বুঝতে অনেক সুবিধা হবে।

বরাহমিহির[১৫] বলেন, 'যদি আকৃতিতে দশরথের পুত্র রাম অথবা বিরোচনের পুত্র বালীর প্রতিমা হয় তাহলে তার উচ্চতা ১২০ আঙুল রাখো', অর্থাৎ মূর্তির মাপ নির্ণয়কারী আঙুল, যাকে 'সাধারণ' আঙুলের সমান করার জন্য ১/১০ কমাতে হবে, তাহলে এ বর্ণনানুযায়ী ১০৮ হয়ে যাবে।

'বিষ্ণুর মূর্তিতে আট অথবা চার অথবা দু'হাত লাগাও আর বামদিকে বক্ষস্থলের নিচে নারীর আকৃতি তৈরি করো। যদি তুমি তার আট হাত মূর্তি বানাও তবে ডান হাতে একটি তলোয়ার বা সোনার বা লোহার একখানি গদা ও একটি বাণ দাও আর চতুর্থ হাতটি এমনভাবে তৈরি করো যা দেখলে মনে হবে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে ; বামদিকের হাতগুলোতে একটি ঢাল, একটি ধনুক, একটি চক্র ও একটি শঙ্খ দিয়ে দাও।

'যদি তুমি তাতে দুটি হাত বসাও তাহলে ডান হাতকে পানি তোলা অবস্থায় এবং বাম হাতকে শঙ্খ ধরা অবস্থায় তৈরি করো।

'নারায়ণের ভাই বলদেবের আকৃতির প্রতিমা যদি নির্মাণ করতে চাও তাহলে তার কানে কানফুল পরাও এবং চোখ দুটো এমনভাবে বানাও দেখলে যেন মনে হবে মদপান করার পর সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

'যদি তুমি নারায়ণ ও বলদেবের যুগল আকৃতির মূর্তি বানাতে চাও তাহলে তাদের সাথে তাদের বোন ভগবতী (দুর্গা–দুর্গতিনাশিনী)-কেও শামিল করে নাও, যার বাম হাতগুলো তার কোমর থেকে নিতম্ব পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং তার ডান হাতে একটি পদ্মফুল থাকবে।

'যদি তুমি তার চার হাতওয়ালা মূর্তি তৈরি করতে চাও তাহলে তার ডানদিকের একটি হাতে একটি বল্লম তুলে দাও আর অন্য হাতকে পানি তোলার মতো করে বানাও ; আর বাম হাত দুটির একটিতে একটি পুস্তক ও অন্য হাতে একটি পদ্মফুল দিয়ে দাও।

'যদি তুমি এর আট হাতওয়ালা মূর্তি তৈরি করতে চাও তাহলে তার বাম হাতগুলোতে কমণ্ডল, পদ্মফুল, ধনুক ও পুস্তক লাগিয়ে দাও, আর ডান দিকের হাতগুলোতে একটি মালা, একটি দর্পণ, একটি বাণ এবং একটি হাত পানির অঞ্জলির মতো বানিয়ে দাও।

'ব্রহ্মার মূর্তিতে চারটি মুখ চারদিকে ফিরে থাকবে, তার আসন হবে পদ্মফুল। 'মহাদেবের পুত্র স্কন্দের মূর্তিতে একটি পুরুষ ময়ূরকে আরোহী হয়ে থাকতে দেখা যায়, তার হাতগুলোতে 'শক্তি' আছে যা 'দু'ধারী কৃপাণের মতো দেখতে, যার মধ্যস্থলে একটি মুষল আছে যেটি হামান-দিস্তার মতো দেখায়।

'ইন্দ্রের মূর্তিতে সে নিজের হাতে হীরের বজ্র ধারণ করে আছে। তার হাতল হবে বেশ শক্তিশালী, কিন্তু তার দুই দিকে দুটি কৃপাণ হাতলের সাথে জুড়ে থাকবে। তার সামনের অংশে তৃতীয় নয়ন তৈরি করো এবং তাকে সাদা হাতির পিঠে বসা অবস্থায় দেখাও, সে হাতির যেন চারটি দাঁত থাকে।

'এভাবে মহাদেবের মূর্তিতে সামনের অংশে উপরের দিকে তৃতীয় নয়ন তৈরি করো, মাথার উপর অর্ধচন্দ্র ও হাতে একটি শূল তুলে দাও, সেটি যেন দেখতে গদার মতো মনে হয় কিন্তু তার তিনটি শাখা ও একটি কৃপাণ হবে, আর বাম হাত গৌরীর কোমরে থাকবে, যে হিমালয়-কন্যা, যাকে সে পাশে নিয়ে বুকে বুক মিলিয়ে অবস্থান করবে।

'জিন অর্থাৎ বুদ্ধের মূর্তিতে অত্যধিক সুন্দর মুখ ও অঙ্গ নির্মাণ করো, তার হাত ও পায়ে কমলের মতো রেখা নির্মাণ করো এবং তাকে কমলার উপরে আসীন দেখাও ; তার চুল হবে সাদা, তার চেহারার উপর শান্ত ভাব ফুটিয়ে তোল, যেন দেখলে মনে হয় তিনি সৃষ্টিকর্তা...।

'দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মূর্তিতে মুকুট পরা থাকবে, তার চূড়া বেরিয়ে থাকবে, মুকুটের টোপর চওড়া হবে এবং সে মানুষের উপর আসীন থাকবে।

'সূর্যের মূর্তির মুখ হবে লাল-পদ্মের পরাগের মতো, যা হীরের মতো চমৎকৃত হবে, তার অঙ্গ হবে বিস্তৃত, কানে অলঙ্কার থাকবে, কণ্ঠদেশে রত্নমালা থাকবে যা বুক পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে, তার মাথায় মুকুট থাকবে, দুই হাতে দুটি কবচ থাকবে, তার বেশভূষা হবে উত্তর ভারতীয় নারীদের মতো, যা পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে।

'যদি তুমি সপ্তমাতার মূর্তি নির্মাণ করতে চাও তাহলে তাদের একটি আকৃতিতে নির্মাণ করো– ব্রহ্মাণীর চারটি মুখ চারদিকে ফিরিয়ে দাও, কৌমারীর ছ'টি মুখ হবে, বৈষ্ণবীর চারটি হাত হবে, বরাহীর মাথা হবে শূকরের মতো আর দেহ হবে মানুষের মতো, ইন্দ্রাণীর অনেকগুলো নেত্র থাকবে আর হাতে একটি গদা থাকবে, ভগবতী (দুর্গা)-কে ঐভাবে উপবেশনরতা দেখাও, যেমনভাবে

সাধারণ মানুষেরা বসে থাকে, চামুণ্ডা যেমন কুরূপা ও দাঁত বেরুনো তাকে ঐভাবে তৈরি করো, তার কোমর হবে পাতলা। তাদের মধ্যে মহাদেবের পুত্রদেরও দেখাও– ক্ষেত্রপালের চুল হবে উসকো-খুসকো, চেহারা হবে রুক্ষ আর শরীর হবে কুরূপ, কিন্তু বিনায়কের মূর্তির শরীর হবে মানুষের কিন্তু মাথা হবে হাতির, তার হাত হবে চারটি, পূর্বে যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে।'

এই মূর্তিদের উপাসকরা কুঠারের আঘাতে মহিষ ও ভেড়া বধ করে আর তাদের রক্ত পান করে আহার সম্পন্ন করে। সমস্ত মূর্তি মাপ অনুসারে তৈরি করা হয়, মূর্তি-আঙুল দ্বারা যার মাপ নির্ধারিত হয় কিন্তু কখনো-কখনো এ মাপের অঙ্গ বিশেষের ক্ষেত্রে পরিবর্তনও হয়। যদি কোনো শিল্পী (মূর্তিকার বা কলাকার) সঠিক মাপে মূর্তি তৈরি করেন, বা কোনো ক্ষেত্রে মাপ ছোট-বড় করেন তা হলেও তাতে কোনো পাপ হয় না। আর তারা একথা ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, সে যে শক্তির (বা দেবতার) মূর্তি নির্মাণ করছে, সে (দেবতা) তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তুলবে না।

...হিঁদুরা তাদের মূর্তিগুলোর সম্মান ঐ সমস্ত সামগ্রীর কারণে করে না যা থেকে তাদের নির্মাণ করা হয়েছে ; বরং তাদের কারণেই করে যারা তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে, মুলতানের মূর্তিটি ছিল কাঠের তৈরি। উদাহরণত, রাম রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (জয়লাভের) পরে যে লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন, সেটা ছিল বালি মাটির তৈরি, যা তিনি নিজের হাতে নাড়াচাড়া করে তৈরি করে বসিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু অনতিবিলম্বেই তা পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী ঐ স্মারক স্থাপন করার জন্য যে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট ছিল সে সময় পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। রামের নির্দেশানুযায়ী পূর্বেই শিল্পীরা এই লিঙ্গ নির্মাণ করেছিলেন। যেখানে মন্দির নির্মাণ ও তার স্তম্ভনির্মাণের কথা সেখানে রাম এক দীর্ঘ ও প্রেরণাদায়ক অনুদেশ দিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন প্রকারের চারটি বৃক্ষ নিধন করতে হবে, তার স্থাপনার জন্য ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে, ঠিক সেই সময়েই সংস্কারকার্য সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া তিনি এ আদেশও দিয়েছিলেন যে, মূর্তিদের সেবার জন্য অনুচর ও পূজারির ব্যবস্থাও করতে হবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে থেকে। 'বিষ্ণুমূর্তির পুজো করবে ভাগবত ; সূর্যের পুজো করবে অগ্নিপূজক ; মহাদেবের পুজো সাধু ও লম্বা কেশ ও জটাধারীরা করবে, যারা নিজেদের শরীরে ছাইভস্ম মেখে থাকে, মৃতদের হাড়গোড় গলায় ঝুলিয়ে রাখে এবং পুকুরে গোসল করে। ব্রাহ্মণরা অষ্ট মাতার ভক্ত, শ্রমণ বুদ্ধের ও অহর্তের ভক্ত 'নগ্ন' নামক শ্রেণীর লোক। সব মিলিয়ে প্রত্যেক মূর্তিকেই কিছু বিশেষ লোক পুজো করে, যারা তা বলে দিয়েছে, তারাই জানে যে, ঐ সব মূর্তিকে কীভাবে উত্তম রূপে সেবা করা যায়।

এ কথা বলার জন্য 'গীতা' থেকে উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে যে, ভগবানকে মূর্তিদের সাথে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়

এ সমস্ত বর্ণনা আপাদমস্তক এভাবে দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাঠকের সামনে মূর্তিগুলোর সঠিক বর্ণনা দেওয়া, যাতে তারা যে কোনো মূর্তি দেখলেই চিনতে পারেন এবং আমরা ঐ সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছিলাম, যা পূর্বেই বলেছি যে, এ সকল মূর্তি কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হতো, যাদের অধিকাংশই তা বুঝত না। একথা এখানে আবারো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিঁদুরা ভগবান তো দূরের কথা, কখনো কোনো অলৌকিক শক্তির মূর্তি বানাননি এবং সবশেষে এ ইঙ্গিত করাও আমাদের অভীষ্ট ছিল যে, জনসাধারণ কীভাবে এসব পুরোহিতদের ছলচাতুরী ও ধোঁকাবাজির খপ্পরে পড়ে নিজেরা ঠকে যেত।

['গীতা' থেকে এ কথা বোঝানোর জন্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের সাথে মূর্তিদের মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়, দ্র. ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ অধ্যায়।]

...এ কথা স্পষ্ট যে, মূর্তিপূজার প্রধান কারণ মৃতদের স্মরণ করা ও জীবিতদের সান্ত্বনা দেওয়ার মধ্যে নিহিত ছিল ; কিন্তু এর উপরে ভিত্তি করে তা বিকশিত হয়েছে এবং পরে তা এক দূষিত ও হানিকারক কুপ্রথায় পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন ধারণানুযায়ী এ সকল মূর্তি স্মারক বা স্মৃতিস্তম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়, সিসিলির মূর্তিগুলোর ব্যাপারে খলিফা মুআবিয়ারও এই ধারণা ছিল। যখন ৫৩ হিজরি সনের গ্রীষ্মকালে সিসিলি জয় করা হয় তখন বিজেতারা খলিফার কাছে সোনার মুকুট ও হীরার তৈরি অনেক মূর্তি প্রেরণ করেছিলেন, যেগুলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি সেগুলো সিন্ধু প্রদেশের রাজাদের কাছে এই ভেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেগুলো (তাদের দেবতা বিবেচনায়) তারা কিনে নেবেন। তাঁর মতে, এগুলো মূল্যবান বস্তু হিসেবে বিক্রি করে দেওয়াই ভালো ছিল, কেননা, বিনিময়ে অর্থমূল্য আসবে। এ দৃষ্টিতে তিনি তা করেননি যে, এ ঘৃণিত মূর্তি পুজোরই প্রতীক ; বরং তিনি এ ব্যাপারটি ধর্মীয় দৃষ্টিতে না দেখে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য শ্রেণীর দেশীয় সাহিত্য

বেদ সম্পর্কে বিবিধ টিপ্পনী

বেদের অর্থ এমন বিষয়ের জ্ঞান যা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। হিঁদুরা একে ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা এ ব্রহ্মার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ ছাড়াই তা বুঝে নেন, এভাবে তাঁরা মুখস্থ করে নেন এবং শ্রুতি পরম্পরায় তাঁরা তা মুখস্থ রাখেন। তাঁদের মধ্যেকার অল্প কিছু লোক আছে যারা টীকা সমেত বেদ পাঠ করেন, তবে এঁদের সংখ্যা খুবই কম। বেদের বিষয়বস্তু ও তার ভাষ্যের উপর এঁদের এতটা অধিকার আছে যে, তাঁরা তার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও করতে পারেন।

ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের বেদের শিক্ষা দান করেন। ক্ষত্রিয়রা তা অধ্যয়ন করতে পারেন কিন্তু কাউকে তা শিক্ষাদান করার অধিকার তাঁদের নেই, এমনকি তাঁরা কোনো ব্রাহ্মণকেও বেদ পড়াতে পারেন না। বৈদ্য ও শূদ্রদের বেদপাঠ শ্রবণ কঠোরভাবে নিষেধ, পাঠ বা উচ্চারণ করা তো দূরের কথা। যদি তাদের মধ্যে কেউ তা পাঠ করেছে বলে প্রমাণ হয় তাহলে ব্রাহ্মণ তাকে দণ্ডদাতার সামনে পেশ করেন, দণ্ডস্বরূপ তার জিভ কেটে দেওয়া হয়।

বেদে বিধিনিষেধের বর্ণনা রয়েছে এবং পুরস্কার ও দণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যার উদ্দেশ্য লোকেদের সৎকর্মের দিকে প্রবৃত্ত করা ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখা। কিন্তু বেদের অধিকাংশ মন্ত্রে প্রশংসাত্মক প্রার্থনা ও বিভিন্ন যজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে, যা এত বেশি এবং এত কঠিন যে, তা গণনা করাও দুঃসাধ্য।

স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমে বেদচর্চা

তাঁরা বেদকে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন না, কারণ, তার পাঠ স্বরের বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি বা আরোহ-অবরোহ (সু-স্বর) অনুসারে করা হয়ে থাকে, সে জন্য তাঁরা তাতে লেখনীর প্রয়োগ করেন না, কেননা, তাতে কোনো-না-কোনো প্রকারের ত্রুটি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়, আর দ্বিতীয় কারণ, তার পাঠে অন্য

কিছু জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, অথবা অন্য কোনো দোষত্রুটি তাতে এসে যেতে পারে। এর পরিণাম হয়েছে যে, তাঁরা অনেকবার বেদ বিস্মৃত হয়ে গেছেন আর তা নষ্টও হয়ে গেছে।

এছাড়াও হিঁদুরা বলে থাকেন যে, বেদ ও তাদের সংস্কার দেশ ও ধর্মের সমস্ত সংস্কার দ্বাপর যুগে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এ বিষয়ে যথাস্থানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং পরাসর-পুত্র ব্যাস বেদকে পুনরায় সৃষ্টি করেছিলেন...।

বসুত্র বেদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন

এরপর বেশিদিন অতিবাহিত হতে না হতেই বসুত্র নামক এক প্রসিদ্ধ কাশ্মিরি ব্রাহ্মণ বেদের ব্যাখ্যার সূত্রপাত করেছিলেন এবং তাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[১৬] তিনি এ কাজে উদ্যোগী হলেও অন্যেরা এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সাফল্যের সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন করেন। কেননা, তাঁর ভয় ছিল যে, বেদকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে এবং মানুষের স্মৃতি থেকে তা হারিয়ে যাবে। কারণ, তিনি দেখেছিলেন যে, দিনের-পর-দিন মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা সদাচরণ তো দূরের কথা কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কেও তাদের কোনো পরোয়া নেই।

বেদে এমন কিছু অংশ আছে, যার সম্পর্কে তাঁরা বলেন যে, এগুলো গৃহমধ্যে পাঠ করা উচিত নয়, কেননা, তাঁদের সন্দেহ ছিল যে, তার পাঠ কর্ণগোচর হলে গর্ভবতী স্ত্রী ও পশুদেরও গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য তারা তা প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে পাঠ করে। বেদে সম্ভবত এমন কোনো মন্ত্র নেই যেগুলো সম্পর্কে এ রকম কোনো বিধিনিষেধ নেই।

যেমন আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, হিঁদুদের গ্রন্থগুলো ছন্দোবদ্ধভাবে রচিত, যেমন আরবদের 'রজজ' কবিতাবলি। সেগুলোর অধিকাংশ রচনাই শ্লোক নামক ছন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনটি করার কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু বেদ রচনা সাধারণ শ্লোক-রচনার ছন্দে করা হয়নি ; বরং অন্য ছন্দে করা হয়েছে। কিছু হিঁদুর অভিমত যে, একই ছন্দে একটানা কেউ কবিতা রচনা করতে পারে না। কিন্তু তাদের পণ্ডিতদের মত হলো যে, এ তো অবশ্যই সম্ভব ; তবে বেদের প্রতি অপার শ্রদ্ধার কারণে তাঁরা এমনটি করতে সংকোচ বোধ করেন।

ব্যাসের চার শিষ্য ও চার বেদ

তাদের লোককথা অনুসারে ব্যাস বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন ; ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ...। চারটি ভাগ থেকে প্রত্যেকটি বেদের পাঠ একটি বিশেষ ঢঙে করা হয়।

ঋগ্বেদ

সর্বপ্রাচীন বেদের নাম ঋগ্বেদ। এতে ছন্দোবদ্ধ ঋচা অর্থাৎ পদ্য রয়েছে, যার আলাদা-আলাদা মাত্রা রয়েছে। এ কারণে একে ঋগ্বেদ বলা হয়, কেননা, তা ঋচা বা পদ্যেরই সংগ্রহ। এতে যজ্ঞ সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে এবং তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করা হয়। প্রথমে সাদামাটা ঢঙে পুরো পুস্তকটি পড়তে হয়। দ্বিতীয় নিয়ম হলো, প্রত্যেক শব্দের পরে বিরাম দিতে হয়। তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো এরকম, যেটি সবচেয়ে পুণ্যজনক এবং এর জন্য স্বর্গে-বিপুল পরিমাণ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে আপনি এক সংক্ষিপ্ত অবতরণ পড়ুন যার প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হবে, তারপর তাকে তার অবতরণের পরবর্তী ভাগের সাথে মিলিয়ে পুনরায় পড়ুন যেগুলো পড়া না হয়েছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এভাবে শেষ পর্যন্ত পড়ে যান এবং এভাবে আপনার সম্পূর্ণ পাঠটি দুবারে পড়ে নেবেন।

যজুর্বেদ

যজুর্বেদ 'কণ্ডি'তে অর্থাৎ শুকনো গোবরে লেখা হয়েছে। এ একটি বুৎপত্তিগত সংজ্ঞা এবং এর অর্থ হলো 'ঘুঁটের সংগ্রহ'। যজুর্বেদ ও ঋগ্বেদের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, এর পাঠ সন্ধির নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষর পাঠের মতো করে করা হয়, যার অনুমতি ঋগ্বেদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। এ দুটিতেই যজ্ঞ ও হোম সম্পর্কিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সামবেদ ও অথর্ববেদ

সামবেদে যজ্ঞ ও তার বিধিনিষেধের বর্ণনা রয়েছে। একে সংগীতের সুরে পাঠ করা হয় আর সেজন্য এর নাম হয়েছে 'সামন' অর্থাৎ গান-মাধুর্য। ...অথর্ববেদের পাঠ সন্ধির নিয়মের সঙ্গে যুক্ত। এতে এমন রচনা নেই যা ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদে আছে কিন্তু এতে তৃতীয় প্রকারের রচনা আছে, যাকে 'ভর' (ভর বা সম্পূর্ণ) বলা হয়। এর পাঠ স্বরানুক্রমিকানুসারে আনুনাসিক স্বরে করা হয়। এ বেদ হিঁদুদের অন্যান্য বেদের তুলনায় কিছুটা কম জনপ্রিয়। এতেও যজ্ঞ-সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে এবং মৃত ব্যক্তিদের ও তাদের সঙ্গে কৃত ব্যবহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ রয়েছে।

পুরাণের সূচি

পুরাণ সম্পর্কে আমাদের প্রথমেই বলে নেওয়া আবশ্যক যে, এই শব্দের অর্থ অনাদি, অনন্ত। পুরাণ-এর সংখ্যা আঠারোটি। এর অধিকাংশেরই নামকরণ হয়েছে– পশু, মানুষ ও দেবতাদের নামে, কেননা, ঐ সকল গ্রন্থে তাদের কথাই রয়েছে, নতুবা সেসব পুস্তকের কোনো-না-কোনো স্থানে তাদের নির্দেশ রয়েছে, নতুবা পুস্তকে এমন সব উত্তর আছে যা ঐ প্রাণীর প্রশ্নের উত্তরে এসেছে– আর ঐ প্রাণীর নামে পুস্তকের নাম রাখা হয়েছে।

'পুরাণ'[১৬ক] হলো মানব রচিত কাহিনি যা তথাকথিত ঋষিরা রচনা করেছেন।

নিচে ঐ সমস্ত পুরাণের নাম অনুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করছি যেমনটি তাদের মুখ থেকে শুনেছি :

১। আদি পুরাণ অর্থাৎ প্রথম।

২। মৎস্য পুরাণ অর্থাৎ মাছ।

৩। কূর্ম পুরাণ অর্থাৎ কচ্ছপ।

৪। বরাহ পুরাণ অর্থাৎ শূকর।

৫। নরসিংহ পুরাণ অর্থাৎ মানুষরূপী সিংহ।

৬। বামন পুরাণ অর্থাৎ বেঁটে।

৭। বায়ু পুরাণ অর্থাৎ হাওয়া।

৮। নন্দ পুরাণ অর্থাৎ সন্দ মহাদেবের অনুচর।

৯। স্কন্দ পুরাণ অর্থাৎ মহাদেবের পুত্র।

১০। আদিত্য পুরাণ অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র।

১১। সোম পুরাণ অর্থাৎ চন্দ্রমা।

১২। সাম্ব পুরাণ অর্থাৎ বিষ্ণুর পুত্র।

১৩। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অর্থাৎ এক মহর্ষি।

১৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অর্থাৎ এক মহর্ষি।

১৫। তর্ক্ষ পুরাণ অর্থাৎ গরুড় পাখি।

১৬। বিষ্ণু পুরাণ অর্থাৎ নারায়ণ।

১৭। ব্রহ্ম পুরাণ অর্থাৎ প্রকৃতি যার দায়িত্বে জগৎ সংসারকে সুরক্ষিত রাখে।

১৮। ভবিষ্য পুরাণ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী।

এ সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে আমি কেবল মৎস্য, আদিত্য, বায়ুপুরাণের কিছু অংশই দেখেছি...।

'স্মৃতি' গ্রন্থাবলির তালিকা

'স্মৃতি'[১৭]গুলো বৈদিক গ্রন্থাবলি হতে গৃহীত হয়েছে। এতে বিধি নিষেধগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্মার কুড়িজন পুত্র এই স্মৃতিগুলোর রচয়িতা :

১। আপস্তম্ব, ২। পরাশর, ৩। সত্প, ৪। সামবর্ত, ৫। দক্ষ, ৬। বশিষ্ঠ, ৭। আঙ্গির, ৮। যম, ৯। বিষ্ণু, ১০। মনু, ১১। যাজ্ঞবল্ক্য, ১২। অত্রি, ১৩। হারীত, ১৪। লিখিত, ১৫। শঙ্খ, ১৬। গৌত, ১৭। বৃহস্পতি, ১৮। কাত্যায়ন, ১৯। ব্যাস, ২০। উশনস।

এছাড়া হিন্দুদের অন্যান্য বিষয়ের উপরেও গ্রন্থাবলি রয়েছে। যেমন তাদের ধর্মের ন্যায়শাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্বী মানব-যোনি থেকে ঈশ্বরত্ব লাভ করার বিধি ও সংসার থেকে মোক্ষপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত, গৌড়মুনি [১৭ক] রচিত গ্রন্থ, যার নামও গৌড় সংহিতা। 'সাংখ্য' যেটি কপিল রচনা করেছেন, তাতে

লোকোত্তর বিষয়ের উপর আলোচনা রয়েছে ; পতঞ্জলী-র পুস্তক যাতে মুক্তির সন্ধান ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলন-সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে ; 'ন্যায়ভাষ'[১৮]-এর রচনা কপিল বেদ ও তার ভাষ্যকে অবলম্বন করে করেছেন ; তাতে বলা হয়েছে যে, বেদ মানবরচিত গ্রন্থ, আর বেদসমূহে ঐ সমস্ত বিধানগুলোর রহস্য ভেদ করা হয়েছে যা বিশেষ অবস্থায় বাধ্যতামূলক আর সাধারণ অবস্থায় বাধ্যতামূলক ; এই বিষয়ের উপরেই জৈমিনী 'মীমাংসা'[১৯] নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন ; 'লোকায়ত'[২০] গ্রন্থটি রচনা করেছেন বৃহস্পতি, যাতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত রকমের অনুসন্ধানে সর্বদাই আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনার প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত। অগস্ত্য রচিত গ্রন্থের নাম 'অগস্ত্যমত'[২০ক] যাতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত রকমের অন্বেষণে শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনাকেই প্রয়োগ করা উচিত নয় ; বরং ঐতিহ্যগত ধারার প্রতিও মনোযোগ রাখা উচিত, আর 'বিষ্ণুধর্ম', ধর্মবিষয়ক একটি গ্রন্থ। ধর্মের অর্থ পুণ্য কিন্তু সাধারণত, তা ধর্ম ও মতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, এই দৃষ্টিতে গ্রন্থের নামের অর্থ হয় ভগবদ্ধর্ম, আর এখানে ভগবানের মূল ভিত্তি হলেন নারায়ণ। এছাড়াও ব্যাসের ছয় শিষ্যের লেখা গ্রন্থাবলির নামও সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। এদের নাম– দেবল, শুক্র, ভার্গব, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু। হিঁদুদের এখানে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার উপরে অনেক গ্রন্থ আছে। অতএব, যে হিঁদু নয় ; বরং বিদেশি, তার পক্ষে সমস্ত গ্রন্থের নাম কীভাবে জানা সম্ভব ?

মহাভারত

এছাড়াও তাদের আরও একটি গ্রন্থ আছে যার প্রতি তাদের এতটা শ্রদ্ধা যে, তাঁরা দাবি করে, যা কিছু অন্য গ্রন্থে আছে, তা এতেও আছে কিন্তু এতে যা আছে তা আর কোনো গ্রন্থে নেই। এর নাম 'ভারত'। পরাশরের পুত্র ব্যাস এটি ঐ সময়ে রচনা করেন যে সময়ে পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ গ্রন্থের নাম থেকে ঐ যুগের আভাস পাওয়া যায়। এর আঠারোটি ভাগ আছে, এর প্রত্যেক ভাগকে 'পর্ব' বলা হয়, আর এতে ১,০০০,০০ শ্লোক আছে। নিচে এর সূচি প্রদত্ত হলো :

১। 'সভা পর্ব' অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ।

২। 'অরণ্য' অর্থাৎ পাণ্ডুপুত্রদের বনবাস।

৩। 'বিরাট' অর্থাৎ, একটি রাজার নাম, অজ্ঞাত বাসের সময় যার রাজত্বে তারা অবস্থান করতেন।

৪। 'উদ্যোগ' অর্থাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি।

৫। 'ভীষ্ম'।

৬। 'দ্রোণ', ব্রাহ্মণ।

৭। 'কর্ণ ; 'সূর্যপুত্র'।

৮। 'শূল্য' দুর্যোধনের ভাই ; যিনি বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে এক এক জনের সুদক্ষ পরে যুদ্ধে যেতেন।

৯। 'গদা'।

১০। 'সৌপ্তিকা' সপ্তজনকে হত্যা ; যখন দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাঞ্চাল নগরে রাত্রিকালে আক্রমণ করেছিলেন।

১১। 'জল প্রদানিকা' মৃত ব্যক্তিদের স্পর্শজনিত অপবিত্রতা ধুয়ে ফেলার পর মৃত ব্যক্তিদের নিরন্তর পানি দেওয়া।

১২। 'স্ত্রী' ; নারী বিলাপ।

১৩। 'শান্তি'-এর চারটি ভাগ আছে, যার ২৪,০০০ শ্লোক হৃদয় হতে ঘৃণা দূরীকরণ সম্পর্কিত : (ক) রাজধর্ম– রাজার কর্তব্য পালন শেষে লাভ করা পুণ্য। (খ) দানধর্ম– ভিক্ষা দান থেকে প্রাপ্ত পুণ্য। (গ) আপদ্ধর্ম– সেই লোকেদের জন্য কৃত পুণ্যকর্ম যারা বিপদগ্রস্ত এবং সাহায্যের পাত্র। (ঘ) মোক্ষধর্ম– ঐ ব্যক্তির পুণ্য যে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

১৪। 'অশ্বমেধ' অর্থাৎ, ঘোড়ার যজ্ঞ, যাকে সৈন্যসামন্তসহ সমস্ত বিশ্বে ঘোরানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এ ঘোড়া চক্রবর্তী রাজার, যে তাকে চক্রবর্তী সম্রাট বলে না মানবে সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোক। ঘোড়ার পিছন ধরে ব্রাহ্মণ চলতে থাকে এবং ঐ সকল স্থানে যজ্ঞ করে যেখানে ঘোড়া মলত্যাগ করে।

১৫। 'মুষল', অর্থাৎ যাদবদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। যাদব বাসুদেবের বংশের লোক ছিলেন।

১৬। 'আশ্রমবাস', অর্থাৎ স্বদেশ ত্যাগ।

১৭। 'প্রস্থান' অর্থাৎ রাজ্যত্যাগ ও মুক্তিপ্রচেষ্টা।

১৮। স্বর্গারোহণ' অর্থাৎ স্বর্গের দিকে প্রস্থান।

এই আঠারোটি অংশ ছাড়াও আরেকটি অংশ আছে যাকে 'হরিবংশ পর্ব' বলা হয়। এতে বাসুদেব সম্পর্কে লোককাহিনি প্রযুক্ত হয়েছে।

এই গ্রন্থে এমন অনেক অংশ রয়েছে যেগুলোকে প্রহেলিকাবৎ মনে হয়, যার অনেকটাই অংশ নির্বাচন করা যেতে পারে। এর কারণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণাগুলো প্রচলিত আছে। ব্যাস ব্রহ্মার কাছে এমন এক ব্যক্তিকে চেয়েছিলেন যে শুনে শুনে 'ভারত' লিপিবদ্ধ করতে পারে। ব্রহ্মা তার পুত্র বিনায়ককে এই কাজ সমাধা করার জন্য দিয়েছিলেন, যার দেহটা মানুষের কিন্তু মুখটা হাতির, তাকে আদেশ দেওয়া হলো যে, সে কোথাও না থেমে নিরন্তরভাবে লিখে যাবে। সাথে, ব্যাস শর্ত দিলেন যে, সে কেবল সেই কথাই লিখবে, যা সে বুঝতে পারবে। এভাবে ব্যাস কিছু বাক্য বলতেন, যা বুঝতে লেখকের সময় লেগে যেত, আর এভাবে ব্যাস বিশ্রাম লাভের জন্যও সময় পেয়ে যেতেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হিঁদুদের ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ

ব্যাকরণ সম্পর্কিত পুস্তকের সূচি

ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের সহায়ক। এর প্রথমে অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে ব্যাকরণের স্থানে প্রথম। যেমন– নাম থেকেই এ কথা স্পষ্ট যে, এ শাস্ত্রটি ভাষার শুদ্ধতা ও শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কিত নিয়ম নির্ধারণ করে, যার দ্বারা তারা লিখতে এবং পড়তে দুয়ের ক্ষেত্রেই অর্থপূর্ণ শাস্ত্রীয় শৈলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। আমরা মুসলমানরা এসব বিষয় থেকে কিছুই শিখতে পারব না, কেননা, তার শাখা-প্রশাখা এমন মূল থেকে নির্গত হয়েছে যে, তা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে– আমি একথা ভাষার ক্ষেত্রে বলতে চেয়েছি। এ সম্পর্কিত যে সমস্ত গ্রন্থের নাম আমাকে বলা হয়েছে, নিচে তা লিপিবদ্ধ করলাম :

১। 'ইন্দ্র'– দেবতাদের রাজা ইন্দ্র সম্পর্কিত।
২। 'চান্দ্র'– বুদ্ধের অনুসারী লাল বস্ত্র পরিহিত সম্প্রদায়ের নেতা চান্দ্র দ্বারা বিরচিত।
৩। 'শকট'– এর নাম লেখকের নামের সঙ্গে যুক্ত। এর বংশের নামও ঐ শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ, শকটায়ন।
৪। পাণিনি'[২১] লেখকের নামই গ্রন্থের নাম।
৫। 'কতন্ত্র'– শর্ববর্মন দ্বারা বিরচিত।
৬। 'শশিদেববৃত্তি'– শমিদেবকৃত।
৭। 'দুর্গাবিবৃত্তি'।
৮। 'শিশুহিতবৃত্তি'–উগ্রমূর্তি দ্বারা বিরচিত।

রাজা আনন্দপাল ও তার গুরু উগ্রমূর্তি

আমাকে বলা হয়েছে যে, শেষোক্ত লেখক জয়পালের পুত্র রাজা আনন্দপালের আচার্য ও গুরু ছিলেন যিনি আমাদের যুগে কাশ্মিরের রাজা ছিলেন। পুস্তক রচনার পরে তিনি তা কাশ্মিরে পাঠিয়ে দেন কিন্তু সেখানকার লোকেরা তা গ্রহণ করেনি,

কারণ, তারা ছিল ঘোর রুঢ়িবাদী। অতএব, তিনি রাজার কাছে সে ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলেন। আর রাজা একজন শিষ্য হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন হেতু তার ইচ্ছাপূর্তির আশ্বাস দিলেন। রাজা আদেশ দিলেন দু'লক্ষ দিরহাম আর অতটা মূল্যের উপহার কাশ্মিরে প্রেরণ করা হোক, সেই অর্থ ও উপহার কেবলমাত্র তারাই পাবে, যারা সেই গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত আছেন। এর পরিণাম হলো যে, সে পুস্তকের উপরে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর সেই সাথে তাদের ধর্মলিপ্সারও প্রমাণ হয়ে গেল, তারা এ পুস্তক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাকরণ গ্রন্থ আর গ্রহণ করতে রাজি হলো না। এ পুস্তক খুবই জনপ্রিয় ও পুরস্কৃত হলো।

ব্যাকরণের উৎপত্তি বিষয়ক ধারণা

ব্যাকরণের উৎপত্তি বিষয়ে তাদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে : সমলবাহন নামে তাদের এক রাজা ছিল– শাস্ত্রীয় ভাষায় সাতবাহন– সে একদিন তার পত্নীদের সাথে একটি দিঘিতে জলকেলি করছিল। সে তাদের মধ্যেকার একজনকে বলল– 'মৌদকম দেহি'– অর্থাৎ আমার উপর পানি নিক্ষেপ কোরো না। কিন্তু ঐ স্ত্রী এই বাক্যকে 'মোদকম দেহী' বুঝল, অর্থাৎ আমাকে লাড্ডু দাও অতএব, সে বাড়ি গিয়ে লাড্ডু নিয়ে এল। আর যখন রাজা তার এমন কাজের জন্য নিন্দা করল, সে তখন ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করল। উল্লেখ্য যে, এ কথা রাজার কাছে বড়ই খারাপ লাগে। আর তাদের প্রথানুযায়ী সে পানাহার ত্যাগ করে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে রইল, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন ঋষি এসে তাকে ডাকল। ঋষি এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিল– আমি লোকেদের ব্যাকরণ ও ভাষার রূপরচনার শিক্ষা দান করব। এরপর ঋষি মহাদেবের কাছে গেল, তার আরাধনা করল, স্তুতি করল ও ভক্তিব্রত পালন করল। মহাদেব তার সামনে প্রকাশ হয়ে ঋষিকে কিছু নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিলেন– কিছুটা এরকম, যেমনটি আবুল আসওয়াদ আদু আলী[২২] আরবি ভাষার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। ভগবান মহাদেব তাকে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা দানেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর ঋষি রাজার কাছে ফিরে এসে তাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিল। এই ছিল ব্যাকরণ শাস্ত্রের শুরু।

ছন্দোবদ্ধ রচনার প্রতি হিঁদুদের দুর্বলতা

ব্যাকরণ শাস্ত্রের পরে আর এক শাস্ত্রের প্রসঙ্গ আসে যা ছন্দশাস্ত্র নামে পরিচিত, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ কাব্য, যেমন আমাদের ছন্দশাস্ত্র এমনই একটি শাস্ত্র যা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল, কেননা, তাদের সমস্ত গ্রন্থই পদ্যে রচনা করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থগুলো ছন্দোবদ্ধভাবে রচনা করার মূল উদ্দেশ্য যে, এর ফলে তা মুখস্থ করতে

সুবিধা হবে, আর কোনো বিশেষ অবস্থা ছাড়া যখনই এমনটি করা আবশ্যক হবে, তখনই লোকেদের ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কিত সমস্যার জন্য লিখিত পাঠ দেখা থেকে বিরত রাখা যাবে। এ কারণে, তাদের ধারণা যে, মানুষের মন আর সমস্ত জিনিসের মতোই, যা ক্রমানুপাতকে অনুসরণ করে থাকে, আর যার মধ্যে ক্রমানুসারিতা নেই তার প্রতি সে মোটেও আকর্ষণ অনুভব করে না। সে জন্য প্রতিটি হিঁদু ছন্দের পাগল, আর তারা তাদের বক্তব্যকে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে, শুনতে ও শোনাতে খুব লালায়িত হয়ে থাকে, তা সে শ্রোতা বা পাঠক ছন্দোবদ্ধ শব্দের অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক ; আর শ্রোতাও তা শুনে এতটা আনন্দিত হয় যে, হাততালি দিয়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। গদ্য রচনাকে তারা পছন্দ করে না, যদিও গদ্যশৈলী অনুধাবন অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল।

তাদের অধিকাংশ গ্রন্থই শ্লোকবদ্ধভাবে রচিত, যার সাথে আমি অনবরত যুদ্ধ করে চলেছি। কেননা, এ সময়ে আমি হিঁদুদের জন্য 'ইউক্লিদিস' ও 'অলমজিস্তী'-র অনুবাদে এবং তারকার সঠিক স্থান নির্ণয় সম্পর্কিত (অ্যাস্ট্রোল্যাব) নির্মাণ কার্য ও এক গবেষণা নিবন্ধ রচনায় ব্যস্ত রয়েছি, আর এ কাজের প্রেরণা আমি আমার বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসার থেকে লাভ করেছি। যদি হিঁদুদের দৃষ্টি এরকম কোনো পুস্তকের উপর নিবদ্ধ হয় যা তাদের এখানে মজুদ নেই তাহলে তাকে আমি সাথে সাথে শ্লোকবদ্ধ করানোর কাজে আত্মনিয়োগ করব, যদিও তা দুরূহ, কেননা, ছন্দোবদ্ধ রচনার জন্য এক প্রকারের ভারি ও কৃত্রিম শৈলীর প্রয়োজন হয়। এ কথা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে যখন আমরা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে চিত্ররচনা প্রণালি নিয়ে আলোচনা করব। এরপর যদি পদ্য পর্যাপ্তরূপে কৃত্রিম না হয় তাহলে লোকেরা তাদের লেখকদের প্রতি ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখে থাকে, যেন তারা নিরামিষ গদ্যই লিখে দিয়েছে আর তা দেখে তারা বড়ই দুঃখিত হয়।

ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ

সর্বপ্রথম যারা এই শাস্ত্র বিষয়ে অন্বেষণ করেন তারা হলেন পিঙ্গল ও চলিত। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে, তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'গাইসিত', লেখকের নামানুসারে যার নামকরণ হয়েছে, তিনি এতটা বিখ্যাত ছিলেন যে, সমস্ত ছন্দশাস্ত্রই তাঁর নাম থেকেই জানা যায়। অন্য গ্রন্থগুলো 'মৃগলাঞ্ছন', 'পিঙ্গল' ও 'ঔসিয়ান্দেই'। কিন্তু এগুলোর মধ্যেকার কোনো গ্রন্থই আমি দেখিনি ; এমনকি 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' নামক পুস্তকের ঐ অধ্যায়টি সম্পর্কেও আমার বেশি জানা নেই। যাতে ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কিত গণনার বিবরণ রয়েছে। এ জন্য এ দাবি আমি করি না যে, ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে আমার সম্যক জ্ঞান রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি একথা উচিত বলে মনে করি না যে, এমন একটি বিষয়কে ত্যাগ করে আমি অগ্রসর হই, যে বিষয়ে আমার যতটা অধিকার রয়েছে তার চর্চা ব্যতীত এ বিষয়টির আমি স্থগিতও করতে চাই না, তাহলে সেটা আমার জন্য বঞ্চনার কারণ হবে।

লঘু ও গুরু নামক শব্দের অর্থ

বর্ণের (গণছন্দ) গণনা করার সময় তারা সেই সংখ্যাই প্রয়োগ করে যার প্রয়োগ আল-খলিল ইবনে আহমদ ও আমাদের অন্যান্য ছন্দশাস্ত্রবিশারদগণ করেছেন। যথা এই দুই চিহ্ন (।) এবং (>) যেগুলোকে প্রথম লঘু (হালকা) এবং দ্বিতীয় গুরু (ভারি) বলা হয়। গণনা (মাত্রা ছন্দ) করার সময় লঘু গুরুকে দু'গুণ বলে মান্য করা হয় এবং তার জন্য লঘুর প্রয়োগ করা হয়।

এর অতিরিক্ত তাদের এমন একটি বর্ণ আছে তারা যাকে দীর্ঘ (স্বর) বলে, যার পরিমাপ বা ছন্দগণনা এক গুরুর সমান হয়ে থাকে। আমার মতে, এটি এমন বর্ণ যাতে দীর্ঘ স্বর (যেমন, কা কী কু) জুড়ে রয়েছে। কিন্তু এখানে আমি একথাও স্বীকার করে নিই যে, এ সময় পর্যন্ত লঘু ও গুরু এ দুয়ের স্বরূপ সম্পর্কে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি যে, আরবিতে তার সমকক্ষ তত্ত্বের নির্দেশ করে তাকে স্পষ্ট করতে পারি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এ কথা বুঝতে পারি যে, লঘুর অর্থ স্বরবিহীন ব্যঞ্জন নয়, আর না গুরুর অর্থ স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ; বরং এর বিপরীতে আমার মতে, লঘুর অর্থ হ্রস্বস্বরযুক্ত ব্যঞ্জন (যেমন– ক কি কু) এবং গুরুর অর্থ এমন ব্যঞ্জন যা স্বরবিহীন ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত (যেমন– কত্, কিত্, কুত্)। যেমন আরবি ছন্দশাস্ত্রেও একটি তত্ত্ব আছে, যাকে 'সহব' বলা হয় (অর্থাৎ– অথবা 'ব' 'ওয়া' এক দীর্ঘ বর্ণ, যার স্থান দুই হ্রস্ব বর্ণ নিতে পারে)। আমার লঘুর পূর্বোল্লিখিত পরিভাষা সম্পর্কে যে সন্দেহ হয়েছিল, ঐ-টাই ছিল তার কারণ। কেননা, হিঁদুরা একের পরে অন্য অনেক লঘুকে নির্বোধের মতো প্রয়োগ করে। আরবরা দ্বি-স্বরহীন ব্যঞ্জনগুলোকে একের পরে দ্বিতীয় ক্রমানুসারে উচ্চারণ করতে অসমর্থ কিন্তু অন্যান্য ভাষায় তা সম্ভব।

...এছাড়া যদিও শব্দের প্রারম্ভে কোনো স্বরবিহীন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করা কঠিন মনে হয় কিন্তু হিঁদুদের অধিকাংশ সংজ্ঞা যদি স্বরবিহীন ব্যঞ্জনের সাথে না-ও নেওয়া হয় তা সত্ত্বেও তা এমন ব্যঞ্জন থেকে শুরু হয় যার পরে কেবল 'স্বও' এর মতো স্বর ধ্বনিত হয়। যদি এ ধরনের ব্যঞ্জন কোনো পদ্যের শুরুতেই আসে তাহলে তারা তার গণনা করে না, কেননা, গুরু নিয়মানুসারে তা স্বরবিহীন ব্যঞ্জনের স্বরের প্রথমে নয় ; বরং পরে আসা উচিত (কাট, কীট, কুট)।

মাত্রার পরিভাষা

আরও অগ্রসর হলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের লোকেরা যেমন চরণ থেকেই কিছু বিশেষ বর্ণ-যোজন বা প্রতীক বানিয়ে নিয়েছেন যে অনুসারে পদ্য রচনা করা হয় এবং এক চরণের পূর্ণতা নির্দেশ করার জন্য কিছু সংকেত নির্দেশ করে

নিয়েছেন যেমন স্বর ব্যতীত বা তার সাথে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার, ঐ রকমই হিঁদুরাও ঐ সমস্ত চরণের চরণ নির্দিষ্ট করার জন্য যা লঘু ও গুরুর সাথে মিলিত হয়ে তৈরি হয়, তা সে প্রথমে লঘু ও পরে গুরু বা এর বিপরীত ; কিন্তু নামের প্রয়োগ এভাবে করে যে, তার মাত্রা বিশেষ করে সমান হোক, তা সে সংখ্যা ভিন্ন হোক না কেন। এ সমস্ত নামের দ্বারা তারা এক বিশেষ পরম্পরাগত ছন্দশাস্ত্রীয় অন্তরের (অর্থাৎ এক বিশিষ্ট চরণ) নির্দেশ করে থাকে। মাপ বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, লঘুর এক মাত্রা এবং গুরুর দু'মাত্রা গণ্য করা হয়। যদি লেখার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য চরণ সম্পর্কিত হয় তাহলে এক বর্ণের মাপ সম্পূর্ণ বোঝা যায়, তার সংখ্যা নয়, যেমন (আরবিতে) দ্বিব্যঞ্জন (ক্ক)-কে স্বরবিহীন ব্যঞ্জন + স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন বলে গণ্য করা হয় আর তানবীন (কুন)-এর আগে প্রযুক্ত ব্যঞ্জন স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন + স্বরবিহীন ব্যঞ্জন বলে গণ্য (গণনা) করা হয়, যেমন লেখার সময় দুটিকেই একইভাবে দেখানো হয় (অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত ব্যঞ্জনের চিহ্ন দ্বারা)।

গুরু ও লঘুর বিভিন্ন নাম

যদি কেবলমাত্র লঘু ও গুরুর কথাই ধরি, তাহলে তাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে— প্রথম : ল, কলি, রূপ, চামর এবং গ্রহ ; পরে কা, গ, নিবৃ এবং অর্ধেক অ ম স ক। পরের নাম এটাই দেখায় যে এক পূর্ণ অ ম স ক দুই গুরু বা তার সমকক্ষের বরাবর। তারা এই নামগুলো শুধুমাত্র এজন্যই গড়ে নিয়েছে যে, তাদের ছন্দশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোর যাতে পদ্য বন্ধনযুক্ত করতে সুবিধা হয়। এই প্রয়োজনের জন্য তারা এর অধিকাংশ নাম তৈরি করে নিয়েছে যে, কেউ-না-কেউ তো ছন্দে তাদের ঠিকমত ব্যবহার করবেই।

[আল বিরুনী এক চরণকেই মাত্র পরিভাষিত করেছেন এবং চরণের বিন্যাস সম্পর্কে হরিভট্টের কোষ-এর উদাহরণ দিয়েছেন— দ্র. অষ্টাদশ— ঊনবিংশ অধ্যায়।]

পদ

যেভাবে আরবি ছন্দকে দুই অর্ধাংশ ভাগ করা হয়, এক অরুজ অর্থাৎ প্রথমটির দুই চরণ এবং দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্থের অন্তিম চরণ, ঐ রকমই হিঁদুদের পদ্যও দুটি অর্ধাংশে বিভক্ত, যেগুলোর প্রত্যেকটিকে পদ বলা হয়...।

আর্যছন্দ

ছন্দকে তিন বা সর্বোপরি চারটি পদে বিভক্ত করা হয়। কখনো কখনো তারা পদ্যমধ্যে পঞ্চম পদও জুড়ে দেয়। পদগুলোতে কোনো অন্ত্যমিল তো হয়ই না,

বরং এক প্রকারের ছন্দ অবশ্যই হয় যাতে ১ ও ২ পদ একই ব্যঞ্জন বা বর্ণে সমাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্ত্যমিলযুক্ত হয় এবং ৩ ও ৪-এ একই ব্যঞ্জন বা বর্ণে সমাপ্ত হয়। ছন্দের এই প্রকারকে 'আর্য' বলা হয়। পদ-এর অন্তে লঘু গুরু হয়ে যায়, যদিও সাধারণভাবে এ ছন্দ লঘুতেই সমাপ্ত হয়।

হিঁদুদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে অনেক ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পঞ্চপদীয় ছন্দে পঞ্চম পদ তৃতীয় ও চতুর্থ পদের মধ্যে রাখা হয়। ছন্দের নাম বর্ণের সংখ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু সাথে সাথে পরে প্রযুক্ত ছন্দের উপরেই তা নির্ভরশীল থাকে। এর কারণ, তারা চায় না যে, দীর্ঘ কোনো কাব্যে একই পদে ছন্দের প্রয়োগ হোক। সে জন্য তারা একই কবিতায় অনেক ছন্দের প্রয়োগ করে, যা দেখলে মনে হয় যেন রেশম কাপড়ের টুকরোয় নানা রকমের নকশা আঁকা হয়েছে।

[হিঁদু ও আরবদের পদ-অঙ্কনের পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে– দ্র. ঊনবিংশ অধ্যায়।]

আমি প্রথমেই একথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছি এবং সে কথা আবারো বলছি যে, এই শাস্ত্রে আমি স্বল্প জ্ঞানের কারণে পাঠককে পুরোপুরি তথ্য প্রদানে অসমর্থ। তা সত্ত্বেও প্রচুর পরিশ্রম করেছি, যদিও আমি ভালো করেই জানি যে, এ সম্পর্কে বেশি-কম তথ্য প্রদানে আমি যথেষ্ট সক্ষম।

বৃত্তছন্দ

বৃত্ত প্রত্যেক চতুষ্পদী ছন্দেই প্রযুক্ত হয়, যাতে ছন্দশাস্ত্রের সংকেত ও বর্ণের সংখ্যা পরস্পরের সমান হয়। এর মূল আধার পদগুলোতেও এক প্রকারের সমকক্ষতা পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে, আপনি এক পদ সম্পর্কে জানতে পারলে পরেরটাও জানতে পারবেন যে, কীভাবে এমনটি হয়। এছাড়া এও নিয়ম যে, একপদ চার বর্ণের কমে হতে পারবে না, কেননা, বেদে এমন কোনো পদ নেই যাতে এর চেয়ে কম বর্ণ আছে। এর কারণ এই যে, এক পদের জন্য বর্ণের ন্যূনতম সংখ্যা চার এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ছাব্বিশ। পরিণামস্বরূপ, বৃত্তছন্দ তেইশ প্রকারের।

[বৃত্তছন্দের আনুষঙ্গিক তেইশটি প্রভেদ গণনা করা হয়েছে। দ্র. ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়।]

... আমি ভারতীয় ছন্দশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতটা পরিশ্রম করেছি কেবলমাত্র শ্লোকের নিয়ম নিশ্চিত করার জন্যই। কেননা, তাদের অধিকাংশ গ্রন্থই শ্লোকবদ্ধভাবে রচনা করা হয়েছে।

শ্লোকসিদ্ধান্ত

শ্লোক চতুষ্পদ ছন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক পদে আটটি বর্ণ হয় যা প্রতিটি পদে ভিন্নতর হয়ে থাকে। প্রতিটি চার পদে প্রত্যেক পদের অন্তিম বর্ণ একই হওয়া উচিত, যেমন– গুরু। এছাড়া প্রত্যেক পদের পঞ্চম বর্ণ সর্বদাই লঘু আর ষষ্ঠটি গুরু হওয়া উচিত। সপ্তম বর্ণ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদগুলোতে লঘু ও তৃতীয় পদগুলোতে গুরু হবে। অন্য বর্ণের হওয়াটা সংযোগ অথবা লেখকের নিজস্ব ভাবতরঙ্গের উপর নির্ভর করে।

[হিংদুরা সংখ্যা গণনায় ছন্দবিধানকে যেভাবে প্রয়োগ করেন তা দেখাতে গিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত থেকে এক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণের শেষে আল বিরুনী এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, তিনি কেবল উপরোক্ত গ্রন্থের 'মাত্র দুটি পাতা' দেখতে পেয়েছিলেন এবং তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পরে অবগত হওয়া যাবে। তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, 'যতদূর পর্যন্ত আমার অনুমান' ইউনানিরাও তাদের কবিতায় এরকম পদের প্রয়োগ করতেন যেমনটি হিংদুরা করেন। দ্র. ত্রিংশৎ, একত্রিংশৎ ও দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়।]

চতুর্দশ অধ্যায়
গণিত-জ্যোতিষ, ফলিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি ও অন্য শাস্ত্র-বিষয়ে হিঁদুদের সাহিত্য

শাস্ত্রগুলোর উন্নতির জন্য সময় ছিল প্রতিকূল

শাস্ত্রের সংখ্যা অনেক বেশি আর জনসাধারণের মনোযোগ এমন যুগের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় যখন তাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়ে গেছে আর সকলের সে সবের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিকোণ রয়েছে– যখন লোকেরা শাস্ত্রের নয় ; বরং শাস্ত্রকারদের প্রতিও সমুচিত সম্মান জানায়– তখন তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সর্বপ্রথম কর্তব্য তো তাদের, যারা তাদের উপর শাসন কায়েম করে, অর্থাৎ রাজা ও রাজপুত্র। কেননা, কেবলমাত্র তাঁরাই বিদ্বানদের প্রয়োজনীয়তার জন্য দৈনন্দিন চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারেন এবং তাদের এজন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন যে, তাদের শক্তিকে অধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করুন, কেননা, ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা মানব-প্রকৃতির প্রধান তত্ত্ব।

কিন্তু আজকের যুগে এমনটি হয় না। এ যুগ পূর্ববর্তী যুগের একদম বিপরীত আর এ জন্য এ যুগে কোনো নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব বা তার নতুন প্রকারের অনুসন্ধান ও তার বিকল্প অসম্ভব। আজ শাস্ত্রের নামে যা কিছু তা বিগত যুগের অল্পকিছু অবশিষ্ট মাত্র।

যদি কেউ শাস্ত্র বা সিদ্ধান্ত কখনো সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত করে রাখতে পারতেন তাহলে সমস্ত জাতি তা থেকে লাভবান হতো। আর এটি হিঁদুরাও করেন। কালচক্রের আবর্তন সম্পর্কে তাদের যে ধারণা, তাতে বিশেষ কোনো কথা নেই ; বরং তা তো শাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণেরই পরিণামেই হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত

খগোল শাস্ত্র বা জ্যোতির্বিদ্যা তাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়, কেননা, তাদের ধর্মীয় বিধিবিধানগুলো তার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষশাস্ত্রী হতে চায়

তাহলে তার জন্য কেবল বৈজ্ঞানিক অথবা গণিত জ্যোতিষ নয় ; বরং ফলিত-জ্যোতিষ জানারও জরুরি। এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে 'সিন্দহিন্দ'[২৩] নামক যে পুস্তকটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, তাঁকে তাঁরা সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সিধা বা সরল– না টেরাবাঁকা আর না পরিবর্তনশীল বলে থাকেন। তাঁরা গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রত্যেকটি মানবগ্রন্থকে এই নামেই অভিহিত করেন– এমনকি সেই গ্রন্থকেই যা আমাদের মতানুসারে আমাদের তথাকথিত 'জিজ' গণিত– জ্যোতিষের পুস্তকাবলির সমকক্ষও নয়। ওদের এখানে পাঁচটি সিদ্ধান্ত আছে :

১। সূর্য সিদ্ধান্ত– অর্থাৎ সূর্যের সিদ্ধান্ত, যার রচয়িতা লতা।

২। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত– এ নাম সপ্তর্ষির একটি গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত, এর রচয়িতা বিষ্ণুচন্দ্র।

৩। পুলিশ সিদ্ধান্ত–এ নাম সাইন্দ্রা নগরের ইউনানি পৌলিশ[২৪]-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ; আমার মতে এ নগর সিকান্দারিয়া, রচনাকার পুলিশ।

৪। 'রোমকসিদ্ধান্ত'– এ নাম রোম অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, এর রচয়িতা শ্রী শ্রীষেণ।

৫। ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত-এর নাম ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কিত, এটির রচয়িতা ব্রহ্মগুপ্ত[২৫], যিনি বিষ্ণুর পুত্র ছিলেন এবং মুলতান ও আনহিলওয়াড়ার মধ্যবর্তী স্থান এবং আনহিলওয়াড়া থেকে ১৬ যোজন দূরে অবস্থিত ভিল্লমাল নামক নগরের অধিবাসী ছিলেন।

এই পুস্তকের লেখকরা একই স্রোত অর্থাৎ 'পিতামহ'কে অবলম্বন করেছেন, যার নাম আদি পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কিত।

বরাহমিহির জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন, এ নাম থেকেই প্রতীত হয় যে, পূর্ববর্তী পাঁচটি সিদ্ধান্তের সার এ গ্রন্থে এসে থাকবে। কিন্তু তা এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, ঐ পাঁচটির তুলনায় একে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ জন্য এই নাম ছাড়া সিদ্ধান্তের সংখ্যা পাঁচ হওয়ার আর কোনো কারণ জানা যায় না।

...আজ পর্যন্ত পুলিশ ও ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক দুটি ছাড়া এগুলোর মধ্যে আর গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইনি। আমি এ দুটোর অনুবাদ তো শুরু করে দিয়েছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে কাজ আমি শেষ করতে পারিনি। ততক্ষণে আমি এখানে 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'-এর পুরো তালিকা প্রণয়ন করছি যা নিশ্চয়ই উপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ হবে।

ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বিষয়

ব্রহ্মসিদ্ধান্তের চব্বিশটি অধ্যায়ের সূচি :

১। ভূমণ্ডলের প্রকৃতি ও আকাশ তথা পৃথিবীর আকার।

২। গ্রহ পরিক্রমা ; কাল গণনা অর্থাৎ বিভিন্ন অক্ষাংশ ও দেশান্তরের জন্য কীভাবে সময় নির্ধারণ করা যায় ; গ্রহসমূহের মাধ্যমে কীভাবে জানা যায় এবং বৃত্তাংশের জ্যা নির্ধারণের উপায় কী।

৩। গ্রহসমূহের স্থানের সঠিক স্থান।

৪। নির্ণেয় : ছায়া কীভাবে বোঝা যায়। দিনের অতিক্রান্ত হওয়া ও তার আরোহণের কথা কীভাবে জানা যায়, একের দ্বারা অন্যকে কীভাবে জানা যায়।

৫। গ্রহসমূহের ঐ সময়ে দৃষ্টিগোচর হওয়া যখন তারা সূর্যকিরণের বাইরে অবস্থান করে এবং সূর্যকিরণের মধ্যে প্রবেশের পর তাদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

৬। চন্দ্রোদয় ও তার ক্ষয়।

৭। চন্দ্রগ্রহণ।

৮। সূর্যগ্রহণ।

৯। চাঁদের প্রতিবিম্ব।

১০। গ্রহের অবস্থান।

১১। গ্রহসমূহের অক্ষাংশ।

১২। জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুস্তক পুস্তিকার পাঠে শুদ্ধ ও বিকৃত অংশের পার্থক্য করার জন্য আলোচনাত্মক অন্বেষণ।

১৩। গণিত, সমতল মাপ ও সমতুল্য বিষয়।

১৪। গ্রহসমূহের মধ্যাকর্ষণের বৈজ্ঞানিক গণনা।

১৫। গ্রহসমূহের সঠিক অবস্থানের বৈজ্ঞানিক গণনা।

১৬। তিন নিয়মের (দেখুন : চতুর্থ অধ্যায়) বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান।

১৭। (সূর্য-চন্দ্র) গ্রহণকালীন অবস্থান।

১৮। নবচন্দ্রের উদয়ের বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা।

১৯। কুট্টক অর্থাৎ কোনো জিনিসের চূর্ণীকরণ। এমন পদার্থ পেষাই করা যা থেকে তেল বেরোয়, এখানে তা অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত অনুসন্ধানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বীজগণিত ও তৎ-সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এতে মূল্যবান টিপ্পনীও সংযোজন করা হয়েছে, যা কম-বেশি গণিতের সাথে সম্পর্কিত।

২০। ছায়া বা প্রতিবিম্ব।

২১। কবিতা পরিমাপের পদ্ধতি ও ছন্দশাস্ত্র।

২২। কালচক্র ও তার প্রেষণযন্ত্র।

২৩। সময় ও তার চারটি মান– সৌর, নাগর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র।

২৪। এই প্রকারের ছন্দশাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

এই হলো লেখকের কথামত চব্বিশটি অধ্যায়ের নাম, কিন্তু আর একটি চতুর্বিংশতি অধ্যায়ও আছে যার নাম 'ধ্যান-গ্রহ-অধ্যায়' যাতে তিনি অনুমানের সাহায্যে নির্মাণ-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, গাণিতিক পদ্ধতিতে নয়। আমি এ অধ্যায়কে এ সূচির অন্তর্ভুক্ত এজন্য করিনি যে, তিনি যে দাবি করেছেন গণিতজ্ঞরা তা খণ্ডন করেছেন। আমার মতে, তিনি অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা এজন্যই করেছেন যে, তা থেকে সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পদ্ধতির তাত্ত্বিক অনুপাত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এ বিজ্ঞানের কোনো সমস্যা কি গণিত ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব ?

তন্ত্র ও করণ সাহিত্য

হিঁদুরা সেই সমস্ত পুস্তককে তন্ত্র বা করণ বলে অভিহিত করেন যা যুক্তিসিদ্ধ স্তরের মধ্যে পড়ে না। প্রথম শব্দটির অর্থ কোনো শাসকের অধীনে রাজত্ব করা আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা। শাসক বলতে তারা আচার্য বুঝিয়ে থাকে, অর্থাৎ ঋষি, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মার অনুচর।

'ভানুয়াশস'-এর 'রসায়ন-তন্ত্র'-এর অতিরিক্ত আরও দুটি প্রসিদ্ধ 'তন্ত্র' আছে– এর একটির রচয়িতা আর্যভট্ট[২৬] ও অন্যটির রচয়িতা বলভদ্র। রসায়ন-এর অর্থ-বিষয়ে আমরা আলাদা একটি অধ্যায়ে (সপ্তদশ অধ্যায়) আলোচনা করব।

'করণ'-এর সম্পর্কে একটি (শব্দ উল্লেখিত নেই) আছে যার তাঁরই নামে রচিত গ্রন্থ, আর অন্যটি হলো ব্রহ্মগুপ্ত রচিত 'করণ-খাণ্ড-খাদ্যক'। অন্তিম শব্দ 'খাণ্ড'-এর অর্থ এক প্রকারের মিঠাই বা মিছরি। তাঁর পুস্তকের এরূপ নামকরণ কেন করা হয়েছে, সে ব্যাপারে আমাকে যা বলা হয়েছে তা এ রকম :

সুগ্রীব নামক এক বৌদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন যার নাম রাখেন 'দধিসাগর' ; আর তাঁর এক শিষ্যও ঐরকমই একটি পুস্তক রচনা করেন যার নাম রাখেন 'কুরবাবয়' অর্থাৎ ধ্যান-পর্বত। পরে তিনি আর একটি পুস্তক রচনা করেন, যার নাম রাখেন 'লবণ-মুষ্টি' অর্থাৎ এক মুঠো লবণ। এ জন্য ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর পুস্তকের নাম রাখেন 'খাদ্যক'– যার উদ্দেশ্য ছিল এই কথা বলা যে, বিজ্ঞান সম্পর্কে যে গ্রন্থই রচনা করা হোক না কেন, তার নামের সাথে যেন খাদ্যসামগ্রীর (যেমন দই, ভাত, লবণ ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়।

'করণ-খাণ্ড-খাদ্যক' নামক পুস্তকে আর্যভট্টের সিদ্ধান্তের প্রতিপাদ্য পাওয়া যায়। এজন্য ব্রহ্মগুপ্ত পরে আর একটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি তার নামকরণ করেন 'উত্তর-খাণ্ড-খাদ্যক' অর্থাৎ 'খাণ্ডখাদ্যক' এর ব্যাখ্যা। এই পুস্তকের পরে আর এক পুস্তক লেখা হয় যার নাম দেওয়া হয় 'খাণ্ড-খাদ্যক-টিপ্প'– এটির প্রকৃত রচয়িতা ব্রহ্মগুপ্ত না অন্য কেউ তা আমার জানা নেই। তাতে 'খাণ্ড-খাদ্যক'-এ

প্রযুক্ত বিষয়াদি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। আমার মনে হয় এটি বলভদ্রের রচনা।

এরপর জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরে বিজয়নন্দিন-এর লেখা একখানি বই আছে, যার নাম 'করণতিলক'। এর লেখক বারানসি শহরের এক ভাষ্যকার ছিলেন। অন্য একটি গ্রন্থের নাম যার রচয়িতা নগরপুরার ভদত্ত (মিহদত্ত)-এর পুত্র বিত্তেশ্বর। ভানুয়্শস (?) কর্তৃক বিরচিত অন্য একটি গ্রন্থের নাম 'করণ-পরতিলক' এতে, আমাকে যেমনটি বলা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারকারা কীভাবে স্থান হতে স্থানান্তরে গমন করে।

কাশ্মির-এর উৎপল নামক এক লেখকের লেখা গ্রন্থের নাম 'রাহুনরা-করণ' (?), অর্থাৎ করণ-ভঙ্গ ; অন্যটির নাম 'করণ-পাত' অর্থাৎ করণ-হত্যা। এর অতিরিক্ত 'করণচূড়ামণি' নামেও একটি গ্রন্থ আছে, যার লেখক সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

এ ধরনের বই আরও অনেক আছে, যেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যেমন, মনু রচিত, 'মানস' এবং উৎপল কর্তৃক লিখিত (তার) টীকা ; লঘু 'মানস' যা পাঞ্চাল (দক্ষিণ ভারতীয়) কর্তৃক লিখিত প্রথমোক্ত 'মানস' গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ ; 'দশগীতিকা'– যার রচয়িতা আর্যভট্ট, ঐ লেখকের পুস্তক 'আর্যষ্টসত্' ; 'লোকানন্দ', যার নাম লেখকের নামের সাথে সম্পর্কিত ; 'ভটটিলা' (?) এটিও ব্রাহ্মণ লেখকের নামের সাথে নামাঙ্কিত। এ ধরনের পুস্তক আরও অনেক আছে।

ফলিত-জ্যোতিষ সাহিত্য, তথাকথিত 'সংহিতা' (সমূহ)

ফলিত-জ্যোতিষ-বিষয়ক সাহিত্যের উপরেও বই রয়েছে। নিম্নলিখিত লেখকদের প্রত্যেকের তথাকথিত সংহিতা রয়েছে :

মাণ্ডব্য	বলভদ্র
পরাশর	দিবাতত্ত্ব
গর্গ	বরাহমিহির
ব্রহ্মা	

'সংহিতা' শব্দের অর্থ সংগৃহীত। এগুলো এমন গ্রন্থ যাতে বিভিন্ন বিষয়ের রচনা সংকলিত হয়েছে। উদাহরণত, যাত্রা সম্পর্কিত বিষয় ; সেখানে মৌসুমি-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা পূর্বাভাস ; রাজবংশের ভাগ্যসম্পর্কিত লেখা ভবিষ্যদ্বাণী, শুভাশুভের বর্ণনা, হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করা ; স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং পাখিদের ওড়ার বা তার আওয়াজের পরিণাম নির্ণয় করা। এগুলো লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে লেখা। তাঁদের জ্যোতিষীদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাঁরা তাঁদের সংহিতাসমূহে সম্পূর্ণ আবহাওয়া-বিজ্ঞানে বিশ্বতত্ত্বের প্রভাব নিরূপণ করেন।

'জাতক' অর্থাৎ জন্মপত্রী সম্পর্কিত পুস্তক

নিম্নলিখিত লেখকেরা 'জাতক' যা জন্মপত্রী সম্পর্কিত পুস্তকাদি রচনা করেছেন :

পরাশর	জীবশর্মন
সত্য	মাউ, ইউনানি
মনিত্থ	

বরাহমিহির দুটি জাতকের রচয়িতা– একটি সংক্ষিপ্ত, অন্যটি বৃহৎ। এ থেকে বলভদ্র বৃহৎ জাতক-এর ব্যাখ্যা করেছেন আর সংক্ষিপ্তটি আমি আরবিতে অনুবাদ করেছি। ...বরাহমিহিরের কয়েকটি ছোট ছোট বই আছে, যথা– 'শতপঞ্চশিকা'-এর ছাপ্পান্নটি অধ্যায় ফলিত-জ্যোতিষের উপর ; 'হোরা পঞ্চহোত্রীয়' (?)টিও ঐ বিষয়ের উপর লেখা...।

যাত্রা-সম্পর্কিত গ্রন্থ 'যোগযাত্রা' এবং 'তিকমী' (?), বিবাহ ও বিবাহ-সংস্কার 'বিবাহ-পটল' ও 'বাস্তুশিল্প'-এর উল্লেখ ঐ পুস্তকে করা হয়েছে।

পাখিদের ওড়ার আওয়াজ শুনে শুভাশুভ নির্ণয় এবং কিছু পুস্তকে সুচ ফুটিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী নির্ণয়ের কলা 'শ্রুধব' (শ্রোতব্য) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এ গ্রন্থের তিনটি পাণ্ডুলিপি মজুদ আছে।

আয়ুর্বিজ্ঞান-সম্পর্কিত সাহিত্য

আয়ুর্বিজ্ঞান ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি শাখা, তবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, হিংদুধর্মের সাথে শেষোক্ত শাস্ত্রটির একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাদের একটি গ্রন্থের নাম চরক[২৭], সেটি তার রচয়িতার নামের সাথে নামাঙ্কিত। এটিকে তারা আয়ুর্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস যে, চরক দ্বাপর যুগের অন্তিম পর্যায়ের একজন ঋষি ছিলেন। ঐ যুগে তার নাম ছিল অগ্নিবেশ কিন্তু পরে যখন তিনি অন্য ঋষিদের দ্বারা তত্ত্ব ও সূত্রগুলোকে নির্ধারণ করে লিপিবদ্ধ করেন তখন তার নাম হয়ে গেল চরক, যার আক্ষরিক অর্থ 'বুদ্ধিমান', ঋষিরা এই জ্ঞান ইন্দ্রের কাছ থেকে লাভ করেন। ইন্দ্র দেবতাদের কাছ থেকে যে দুই বৈদ্য লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অশ্বিনী নামক এক বৈদ্য ছিলেন। তিনি প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মার (আদিপুরুষ) কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। বারমিসিডিজ[২৮] বংশের রাজারা এই গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করিয়েছিলেন।

'পঞ্চতন্ত্র'

হিংদুরা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানচর্চা করে থাকেন এবং তাঁদের সাহিত্যের কোনো সীমা নেই। কিন্তু আমি আমার জ্ঞানশক্তির দ্বারা তার সবকিছুকে

বুঝতে পারিনি। আমি 'পঞ্চতন্ত্র' নামক পুস্তকের অনুবাদ করতে পারতাম, যেটি আমাদের এখানে 'কালীলা ওয়া দিমনা'[২৯] নামে সুপরিচিত। বিভিন্ন ভাষায়– ফারসি, হিন্দি ও আরবিতে তা সহজলভ্য– কিন্তু যারা এর অনুবাদ করেছেন, একথা সহজেই অনুমেয় যে, তাঁদের অনুবাদ সন্দেহমুক্ত নয়, তাঁরা তার মূল পাঠ বদলে দিয়ে থাকবেন। উদাহরণত, আবদুল্লাহ আল মুকাফফা[৩০] তাঁর অনুবাদে একটি অধ্যায় পরিশিষ্ট স্বরূপ জুড়ে দিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য পাঠকমনে সংশয় সৃষ্টি করা, যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দুর্বল, আর নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি এবং মানিকীয়বাদীদের ধ্যান-ধারণাকে অনুকরণের উদ্দেশ্যে তাদের পরিচালিত করাই এর লক্ষ্য হয়ে থাকবে। এই সন্দেহের মূল কারণ হলো– তিনি মূল পাঠের সাথে কিছু কিছু জুড়ে দিয়েছেন, যা তার প্রতি সন্দেহকে আরও দৃঢ় করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় পরিমাপ-বিদ্যার বিবরণ

হিঁদুদের ওজন পদ্ধতি

গণনা মানুষের সহজাত গুণ। যে কোনো বস্তুর মাপ তার স্বজাতীয় বস্তুর সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় এবং জনসাধারণ তাকেই সঠিক বলে মেনে নেয়। এর দ্বারা বস্তু ও তার মানকের মধ্যেকার পার্থক্য জানা যায়।

ওজনের দ্বারা লোকেরা ভারী বস্তুর ওজন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। আর তা তখনই নির্ধারিত হয় যখন দুই দিকের পাল্লা সমান হয়ে যায়। হিঁদুদের দাঁড়িপাল্লা বা তুলা-যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তারা পাত্র দ্বারা মেপে সংখ্যার দ্বারা মান নির্ধারণ করেন, ওজন থেকে নয়, এত এত 'ফলস্' দ্বারা গণনার সাহায্যে তা মাপা হয়। তাদের 'দিরাম' এবং 'ফলস্'-এর মূল্যমান নগর ও গ্রামে দুভাবে নির্ধারিত হয়। তারা সোনার ওজন, যখন প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে তখন তারা অলঙ্কারাদি তৈরির ক্ষেত্রে তা মাপার জন্য তুলা-যন্ত্রের ব্যবহার করে, কিন্তু তা দ্বারা মুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে তারা এমনটি করে না। তারা যে সুবর্ণ (সোনার ওজন)-এর প্রয়োগ করে তার ওজন ১–১/৩ তোলা হয়। এদেশে ওজনের ক্ষেত্রে তোলার ব্যবহার হয় যেমন আমাদের দেশে হয় মিসকাল। এদের কাছ থেকে আমি এতটা জানতে পেরেছি যে, এদের তোলার ওজন আমাদের তিন দিরামের সমতুল হয়– অর্থাৎ দশ তোলা সমান সাত মিসকাল হয়ে থাকে।

এরকমই ১ তোলা = ২–/১০ মিসকাল।

তোলার সবচেয়ে বড় পার্থক্য ১/১২ হয়, যাকে তারা মাশা বলে।

অতএব, ১৬ মাশা = ১ সুবর্ণ।

এছাড়া

১ মাশা = ৪ আণ্ডি (আরাণ্ডা) অর্থাৎ গৌড় নামক বৃক্ষের বীজ।

৪ আণ্ডি = ৪ যব (জৌ)।

১ যব = ৬ কল।

১ কল = ৪ পাদ।

১ পাদ = ৪ মুদ্রি (?)।

... যেহেতু মাপের কোনো প্রাকৃত মাত্রক (নিয়ন্ত্রক বা মান্য হয় না ; বরং সাধারণ সহমতের দ্বারা স্বীকৃত এক ঐতিহ্যগত মাত্রক, সেহেতু তা ব্যবহারিক ও কাল্পনিক দু'ভাবেই বিভাজন করা যেতে পারে। এর উপবিভাজন ভিন্ন ভিন্ন কাল ও পরিবেশে ও একই দেশে ভিন্নতর হয়ে থাকে। দেশকালপাত্র নির্বিশেষে একই দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন নামও হয়ে থাকে) এসব ভিন্নতা ভাষাগত কারণেও হয়ে থাকে আবার স্থানগত কারণেও হতে পারে।

সোমনাথের নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল যে, ওদের মিসকাল আমাদের সমানই হয়ে থাকে :

১ মিসকাল ৮ রুবু ; ১ রুবু ২ পালি ; ১ পালি ১৬ যব,

সে অনুসারে ১ মিসকাল = ৮ রুবু = ১৬ পালি = ২৫৬ যব।

[বরাহমিহির ও চরকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বরাহমিহির কর্তৃক প্রদত্ত মূর্তি নির্মাণের জন্য দেওয়া পরিমাপের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। দ্র. চতুর্স্ত্রিংশৎ অধ্যায়।]

হিঁদুদের তুলাযন্ত্র

হিদুরা যে সমস্ত তুলাযন্ত্র দ্বারা বস্তুসামগ্রী ওজন করে... তা নির্দিষ্ট রেখার মধ্যে ওঠানামা করে কিন্তু বাটখারা ও মাপিত বস্তু স্ব-স্ব স্থানে থাকে। এজন্য একে তুলা বলে। প্রথম রেখার অর্থ হলো ১ থেকে ৫ পর্যন্ত এবং এভাবে দশ পর্যন্ত তার পরিমাপ করা হয় ; নিচের রেখাগুলো প্রতিটি দশ হিসেবে নির্ধারিত হয় অর্থাৎ ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি...।

হিঁদুদের বাটখারাকে 'ভার' বলা হয়, এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় সিন্ধুবিজয় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিতে। এভাবে ২০০০ পল এর সমতুল্য হয়ে থাকে, কেননা, একে ১০০ × ২০ পল এক বৈল (ষাঁড়)-এর সমতুল হয়ে থাকে।

হিঁদুদের পরিমাপ সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞাত হয়েছি তা এ পর্যন্ত বর্ণনা করা গেল।

শুষ্ক বস্তুর পরিমাপ করার সময় লোকেরা কোনো পিণ্ড বস্তুকে মাপক হিসেবে গ্রহণ করে। যদি কোনো বস্তু নিজস্ব আকারের মধ্যেই থাকে যে ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, এর পরিমাণ অনুযায়ীই কোনো বস্তুর পরিমাপ করা হয়। সেই মাপ অনুযায়ী বোঝানো হয় যে, ঐ বস্তুকে ঐ মাপ অনুযায়ী পূর্ণ করা হয়েছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সমস্তটাই মিলিয়ে বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যদি দুটি একই প্রকারের বস্তু পরিমাপের জন্য তুলাযন্ত্রে তোলা হয় তাহলে তা শুধু পরিমাণে নয় ; বরং ভারেও তার ওজন নির্ধারিত হয় ; কিন্তু যদি একই প্রকারের না হয় তাহলে তার আকারই একই হতে পারে কিন্তু ওজন বা ভার নয়।

তাদের ওখানে একটি মাপ প্রচলিত আছে, যাকে তারা বীসী (? সীবী) বলে, যা সোমনাথ ও কনৌজের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত।

বিস্তার কলন বা দূরত্বের মাপ

...বিস্তার কলনের রেখা দ্বারা ভিতরের এবং সমতলের দ্বারা বাইরের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়। সমতল স্থানের মাপ ওরই একটি ভাগ থেকে নির্ধারণ করা উচিত কিন্তু বিস্তার কলন যদি রেখাসমূহের দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তবুও ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে যেভাবে রেখাগুলো সমতলের সীমানাগুলো নির্ধারণ করে।

[বিস্তার পরিমাপের জন্য বরাহমিহিরকৃত এককে উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :]

জব-এর ৮ (আটটি)টি দানা একত্রিত করলে হয় = ১ আঙুল

৪ আঙুলে	= ৪ রোম।
২৪ আঙুলে	= ১ হাত বা দস্তা
৪ গজ	= ১ ধনু = ৬ ফুট
৪০ ধনু	= ১ নলবা
২৫ নলবা	= ১ ক্রোশ।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ১ ক্রোশ = ৪০০০ গজ ; আর যেহেতু আমাদের মাইলও এত গজ হয়ে থাকে এজন্য ১ মাইল = ১ ক্রোশ। ইউনানি লেখক পুলিশও বলেছেন যে, ১ ক্রোশ ৪০০০ গজের সমতুল।

গজ ২ মিকয়াস বা ২৪ আঙুলের সমতুল হয়, কেননা, হিঁদুরা শঙ্কু (মিকয়াস)-এর নির্ধারণ বুড়ি আঙুলের দ্বারা করে। সাধারণত, তারা মিকয়াসের বারো ভাগকে আঙুল মানে না, যেমন আমরা করি ; বরং তাদের মিকয়াস সাধারণত এক বিত্তা হয়। বিত্তা হলো সেই মাপ যা হাত ফেলে দিলে আংটি থেকে কনিষ্ঠ আঙুলের মাথা পর্যন্ত মান্য করা হয়, যাকে 'বিতস্তি' এবং 'কিস্কু'ও বলে থাকে।

চতুর্থ ও অনামিকা এবং মধ্যমাঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানের ফাঁকা জায়গাটিতে যে দূরত্ব তৈরি হয় তাকে বলে 'গোকর্ণ'।

তর্জনী ও অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানের ফাঁকা জায়গাটিতে যে দূরত্ব তৈরি হয় তাকে বলে 'গোকর্ণ'।

তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলের মাথার মধ্যবর্তী স্থানকে 'তাল' বলে। হিঁদুদের মতে, মানুষের উচ্চতা– তা সে লম্বা হোক বা বেঁটে হোক– তার তাল থেকে আট গুণ হয়ে থাকে ; একই কথা তারা মানুষের পা সম্পর্কেও বলে থাকে, অর্থাৎ তা লম্বায় মানুষের সাত ভাগের একভাগ হয়ে থাকে।

যোজন, মাইল ও ফারসাখের পারস্পরিক সম্পর্ক

ক্রোশের নাম নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার পর একথাও আমাদের নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়া দরকার যে, তা আমাদের মাইলের সমতুল, পাঠকের একথাও

ভালোভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, দূরত্ব মাপার এককও রয়েছে, যাকে তারা যোজন বলে, যা ৮ (আট) মাইল বা ৩২,০০০ গজের সমতুল হয়। সম্ভবত, কেউ কেউ মনে করে যে, 'ক্রোহ্ = ১/৪ ফারসাখ হয়' এবং সে হিসেবে তারা বলে যে, হিন্দুদের ফারসাখ ১৬,০০০ গজ লম্বা হয়। কিন্তু তা নয়। এর বিপরীত ১ ক্রোহ্ ১/২ যোজনের সমতুল হয়। এই পরিমাপ অনুসারে আল-ফাজারী তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থে পৃথিবীর পরিধির মাপ দর্শিয়েছেন। তিনি একে 'জুনু' বলেছেন, যার বহুবচন হয় 'আজওয়ান।'

বৃত্তের পরিধি সম্পর্কে হিন্দুদের পরিকল্পন সম্পর্কিত মূল ধারণা এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্যাসের মাপে তা হয় তিনগুণ। এরই ভিত্তিতে 'মৎস্যপুরাণ'-এ সূর্য এবং চন্দ্রের ব্যাসের পরিমাপ যোজন সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'পরিধির মাপে ব্যাসের তিনগুণ হয়।'

['মৎস্যপুরাণ', আদিত্য-পুরাণ' ও 'বায়ুপুরাণ' থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, দ্র. পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।]

ষোড়শ অধ্যায়

হিঁদুদের লিখন-সামগ্রী তাদের গণিত সম্পর্কিত বিষয় ও তাদের বহুবিচিত্র রীতি রেওয়াজের বিবরণ

বিভিন্ন প্রকারের লিখন-সামগ্রী

জিহ্বা হলো সেই মাধ্যম যার দ্বারা বক্তা তার আপন মনের ভাব শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ জন্য তার ক্রিয়া হয় ক্ষণিকের আর এজন্য অতীত ঘটনাবলির বিবরণ মৌখিক পরম্পরার দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছায়, এভাবে পৌঁছানোর একটি পর্যায়ে দীর্ঘ সময় একটা বিশাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আর তার ফলে তারও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মানব-মস্তিষ্ক দ্বারা উদ্ভাবিত এক নতুন মাধ্যম দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে। কেননা, লিখন-কলা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তারা এই অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যার দ্বারা তাদের সংবাদ দূর-দূরান্তে বাতাসের মতো পৌঁছে যায়, আর যুগ-যুগান্তরের মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়, যেভাবে মৃতের আত্মারা ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য শোকর আল হামদুলিল্লাহ* যিনি বিশ্ব ভুবনের সৃষ্টিকর্তা, যার সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণের জন্য।

হিঁদুরা চামড়ার উপর লিখতে অভ্যস্ত নয়, যেমন, প্রাচীনকালের ইউনানিরাও ছিল না। একবার সক্রেটিসকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কেন বইপত্র রচনা করেন না ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : 'আমি জ্ঞানকে মানুষের জীবিত মন থেকে বের করে ভেড়ার মৃত চামড়ায় পৌঁছে দিতে চাই না।' মুসলমানরাও ইসলামের প্রাথমিক যুগে চামড়ার উপরে লিখতেন। উদাহরণত, ইসলামের মহান পয়গাম্বর সাহেব ও খয়বরের ইহুদিদের মধ্যেকার সন্ধিপত্র এবং কিসরাকে লেখা পত্রগুলোও চামড়ার উপরে লেখা হয়েছিল, কুরআনের প্রতিলিপিগুলো হরিণের চামড়ার উপরে লেখা হয়। কুরআন (সুরা : ৯১)– এ উক্ত হয়েছে : 'তারা একে কারাতিস তৈরি

---

* আল্লাহকে অযুত প্রশংসা।

করে।' কিরতাস (বা Charta) মিশরের প্যাপিরাস নামক গাছের ডাল থেকে তৈরি করা হয়। এসব সামগ্রীর উপরে লিপিবদ্ধ করে খলিফাদের আদেশ আমাদের পূর্ববর্তী যুগের প্রথম দিকে সারা দুনিয়ায় প্রেরণ করা হতো। প্যাপিরাস চর্মপত্রের চেয়ে ভালো এই কারণে যে, আপনি তাতে লিখে তা না মুছতে পারেন আর না লিখে তা বদলাতে পারেন, কেননা, এমনটি করলে তা কেটে যায়। সর্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়েছিল চীন দেশে। চীনা বন্দীরা কাগজ সমরকন্দে নিয়ে গিয়েছিল আর তারপর বিভিন্ন স্থানে তা প্রয়োজন মতো প্রস্তুত হতে লাগল।

হিঁদুদের ওখানে, ওদের দক্ষিণ প্রদেশে খেজুর ও নারকেল গাছের মতো দেখতে, তাতে ফলও হয় এবং তা খাওয়া হয়, তার পাতা একগজ লম্বা হয় ও তিন আঙুল চওড়া হয়, ওরা একে তাড় (তাল) বলে, ওরা তাতে লেখে। তারা সেই পাতাকে এক সাথে বেঁধে পুস্তক বানিয়ে নেয়, আর মাঝখানে ছিদ্র করে তা সেলাই করে নেয়।

উত্তর ও মধ্য ভারতে লোকেরা 'তজ' বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করে, যার এক প্রকার ছাল ধনুকের আবরণ হিসেবেও ব্যবহার করে, যাকে ওরা বলে 'ভূর্জ'। তারা এর এক গজ লম্বা ও এক বিঘৎ বা তার চেয়ে কম চওড়া করে টুকরো করে এবং তাকে অনেক রকমভাবে তৈরি করে নেয়। তারপর তারা তাতে তেল লাগিয়ে রগড়ে নেয় যাতে ওটা শক্ত ও চকচকে হয়ে ওঠে, তারপরে তাতে লেখে। প্রতিটি পাতায় তারা সংখ্যা লিখে রাখে এবং একই আকারে দুটি পট্টির মধ্যে রেখে বেঁধে দেওয়া হয়। এ ধরনের পুস্তককে তারা 'পুঁথি' বলে (তুলনীয় পুস্ত, পুস্তক)। পত্র ও অন্যান্য যা কিছু তারা লেখে সে সব ক্ষেত্রে 'তজ' বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করে।

হিঁদুদের বর্ণমালা

হিঁদুদের বর্ণমালা বা লিপি প্রসঙ্গে এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তা কোনো এক সময়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু সে বিষয়ে আর কেউ মনোযোগ দেয়নি, সেহেতু লোকেরা নিরক্ষর হয়ে গিয়েছিল, বলা উচিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল এবং বিজ্ঞান থেকে তো তারা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কালান্তরে পরাশর-পুত্র ব্যাস ঈশ্বরের প্রেরণায় পঞ্চাশ বর্ণের সন্ধান পান। বর্ণকে অক্ষর বলা হয়।

কিছু লোকের মতে, মূলত, তাদের অক্ষরের সংখ্যা কম ছিল এবং ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। এটা অসম্ভব কিছু নয় ; বরং আমি তো বলব তার প্রয়োজনও ছিল।

হিঁদুদের বর্ণমালায় বহু সংখ্যক অক্ষরের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমে তো বলা হয়েছে যে, তাদের ওখানে প্রত্যেক অক্ষরের জন্য যদি তার স্বর বা দ্বিস্বর বা

হামজা (বিসর্গ) বা স্বরকে সামান্য পরিমাণেও টান দিলে– আলাদা আলাদা সংকেত হয় এবং দ্বিতীয়ত, একথা বলা হয়েছে যে, ওদের ওখানে এমন ব্যঞ্জন আছে যা অন্য কোনো ভাষার সাথে মেলে না, আর অন্য কথায়, তা অন্যান্য ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে মিলতে পারে– অর্থাৎ এমন সব ধ্বনি যে, আমাদের জিহ্বার সাথে তার কোনো পরিচয়ই নেই, সে সব উচ্চারণ করতে পারে না। সেই সাথে আমাদের কানও তাদের ঐ সমস্ত ধ্বনির অর্থ গ্রহণে সমর্থ হয় না।

হিঁদুরাও ইউনানিদের মতো বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখে যায়। তারা রেখা টেনে লেখে না, অনেকটা আরবির মতো, অক্ষরের উপরের অংশ উপরে তুলে দেয়, নিচের অংশ নিচে টেনে দেয়। এর বিপরীতে তাদের অধোরেখা উপরে হয়– প্রত্যেক অক্ষরের উপরে এক সিধা-রেখা– আর এই রেখার নিচে অক্ষরগুলো লটকিয়ে দেওয়া হয়। রেখার উপর যে চিহ্নই লাগিয়ে দেওয়া হয়, তা কেবলমাত্র বৈয়াকরণিক সংকেত, যা অক্ষরের উচ্চারণ নির্দেশ করে, যার উপরে তা লাগানো হয়েছে।

হিঁদুদের স্থানীয় বর্ণমালা

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণমালাকে তারা 'সিদ্ধমাত্রিক' বলে অভিহিত করে, যার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু লোকের অভিমত, তা কাশ্মির থেকে এসেছে, কেননা, কাশ্মিরের লোকেরা তা ব্যবহার করে। কিন্তু তার প্রয়োগ বা বারানসিতেও হয়ে থাকে। হিঁদুশাস্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হলো বারানসি ও কাশ্মির। ঐ একই বর্ণমালা মধ্য ভারতেও ব্যবহৃত হয়। দেশের এই মধ্যভাগটি কনৌজের আশপাশে অবস্থিত, তাকে তারা 'আর্যবর্ত'ও বলে।

মালবের বর্ণমালাকে তারা 'নাগর' বলে, যা প্রথমোক্ত বর্ণমালার চেয়ে ভিন্ন।

এর পরবর্তী লিপিকে তারা 'অর্ধ-নাগরি' বলে। এই নামে অভিহিত করার কারণ হলো এটি পূর্ববর্তী দুই বর্ণের মিশ্রণ। এর প্রয়োগ ভাটিয়া ও সিন্ধুর কিছু অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। অন্য লিপিগুলো হলো যথাক্রমে : 'মালওয়ারি' যা দক্ষিণী সিন্ধুর তটবর্তী এলাকায় অবস্থিত 'মালাবাশাউ'তে ব্যবহৃত হয় ; 'সৈন্ধব' যা বহমনওয়া বা আল-মনসুরা এলাকায় ব্যবহৃত হয় ; 'কর্ণাটা' কর্ণাট দেশে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তাদের সেই সৈন্যরা রয়েছে যাদের 'কন্নড়' বলা হয় ; 'আন্ধ্রি' লিপি অন্ধ্রদেশে ব্যবহৃত হয় ; দিরওয়াড়ি'র (দ্রাবিড়ি) ব্যবহার দিরওয়াড়ি (দ্রাবিড়)-তে ব্যবহৃত হয় ; 'লাড়ি' লিপি নাড়দেশ (লাটদেশ)-এ ব্যবহৃত হয় ; 'গৌরি' (গৌড়ি) লিপি পূর্বদেশে অর্থাৎ দেশের পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত হয় ; 'ভৈক্ষুকি' পূর্বাঞ্চলের উদুনপুরে[৩০৮] ব্যবহৃত হয়। এ হলো বুদ্ধ প্রবর্তিত সর্বশেষ লিপি।

'ওম্' শব্দ

আমরা যেমন গ্রন্থারম্ভে বা কোনো কর্মের শুরু 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে করি, তেমনি তারা 'ওম' দিয়ে শুরু করে। এটি তাদের একটি স্বস্তি বাচন। তারা 'ওম্' শব্দটি এই ওঁ আকৃতিতে লেখে। এই আকৃতির কোনো অক্ষর হয় না ; এ হলো একটি বিম্ব যা ঐ শব্দটি প্রকাশ করার জন্য তৈরি করে নেওয়া হয়েছে ; এটি তারা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে যে, এর ফলে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে। এই ধ্বনিচিহ্ন দ্বারা তারা ঈশ্বরের একত্বকে স্বীকার করে...।

তাদের সংখ্যাসূচক চিহ্ন

হিঁদুরা তাদের সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলোর জন্য নিজস্ব অক্ষর ব্যবহার করে না, যেমনটি আমরা ইব্রানি অক্ষরের ক্রমে আরবি অক্ষরের প্রয়োগ করে থাকি। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হয় সেহেতু সংখ্যাসূচক চিহ্ন– যাকে অঙ্ক বলা হয়, তাও ভিন্ন-ভিন্ন। যে অঙ্ক বা সংখ্যা এখানে আমরা ব্যবহার করেছি, তা হিঁদুদের শ্রেষ্ঠতম চিহ্নসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহারে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা জনসাধারণের বোধগম্য হয়। কিন্তু কাশ্মিরের অধিবাসীরা তাদের গ্রন্থাবলির পত্রসংখ্যা নিরূপণে যে সমস্ত সংখ্যাসূচক চিহ্ন ব্যবহার করে তা আরেখন বা চীনা লিপির মতো দেখতে, যার অর্থ অনুধাবনের জন্য দীর্ঘ কালব্যাপী অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তারা তার প্রয়োগ জমিন পরিমাপের সময় করে না।

পাটীগণিতের ব্যাপারে সমস্ত দেশই সমমত পোষণ করে যে, সমস্ত ঘাত (যেমন– একক, দশক, শতক, হাজার)-এর দশ (দহাই)-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ; আর প্রত্যেক ঘাত পরবর্তী ঘাতের ১/১০-ম ভাগ আর পূর্ব ভাগের দশগুণ হয়। আমি সব রকমের লোকের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমি বিভিন্ন ভাষার অংকের ঘাতসমূহের নাম জানার চেষ্টা করি ; এবং আমি লক্ষ করি যে, কোনো দেশের (বা অঞ্চলের) সংখ্যা হাজারের চেয়ে অগ্রসর হয় না। আরবরাও হাজারে গিয়ে থেমে যায়, যা অবশ্যই সঠিক এবং স্বাভাবিক। আমি এ বিষয়ে আলাদা নিবন্ধ রচনা করেছি।

যারা হাজারের অধিক সংখ্যা গণনা করে তারা হিঁদু, পাটীগণিতের শব্দাবলিতে তো এমনটাই হয়। তাদের মধ্যে হাজারের অধিক সংখ্যাপদ্ধতি প্রচলিত, তার (বা তারা স্বতন্ত্রভাবে তার অন্বেষণ করেছে, অথবা তার) ভিত্তি কোনো বিশেষ ব্যুৎপত্তির মধ্যে নিহিত হয়ে থাকবে ; অন্য দিকে ভিন্ন শব্দে যা সম্ভব– এ দুই পদ্ধতিই সেখানে অবলম্বন করা হয়। তারা তাদের অঙ্কের

ঘাতসমূহকে ১৮শ তম ঘাত পর্যন্ত নিয়ে যায়, যার ধর্মীয় কারণ রয়েছে। যেখানে ব্যুৎপত্তির প্রশ্ন সেখানে বৈয়াকরণরা গণিতজ্ঞদের সাহায্য করেছেন।

অষ্টাদশ ঘাতকে তারা 'পরার্ধ' বলে অভিহিত করে, যার অর্থ অর্ধাংশ, বা আরও সঠিক হবে, উপরে যা কিছু আছে তা 'অর্ধাংশ'।

অঙ্কের আঠারো ঘাত

১। একম, ২। দশম, ৩। শতম, ৪। সহস্রম, ৫। অযুত, ৬। লক্ষ, ৭। প্রযুত, ৪। কোটি, ৯। ন্যর্বুদ, ১০। পদ্ম, ১১। খর্ব, ১২। বিস্বর্ব, ১৩। মহাপদ্ম, ১৪। শংকু, ১৫। সমুদ্র, ১৬। মধ্য, ১৭। অন্ত্য, ১৮। পরার্ধ।

এবার আমি তার ব্যবস্থানুযায়ী তাদের মতভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আঠারো ঘাতের মধ্যে প্রযুক্ত ভিন্নতা

কিছু হিঁদুর মতে, পরার্ধের পরেও একটি উনিশতম ঘাত রয়েছে যাকে 'ভূরি' বলা হয় আর এটাই গণনার শেষ সীমা। কিন্তু বাস্তবিকই গণনা অসীম ; যদি তার কোনো সীমা থেকেও থাকে তাহলে তা কেবল শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাকে অঙ্কে শেষ-সীমারূপে পরম্পরাগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কদাচিৎ গণনা শব্দের প্রয়োগ উপরের নাম পদ্ধতির জন্য করা হয়েছে, অর্থাৎ তারা বলতে চায় যে, ভাষার ১৯তম ঘাতের পরবর্তীতে গণনার জন্য কোনো শব্দই নেই। এরা সবাই জানে যে, এই ঘাতের একক অর্থাৎ এক ভূরি 'মহা দিবসের' পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয় কিন্তু এ বিষয়ে তাদের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। তাদের পদ্ধতিতে 'মহাদিবস'-এর সঞ্চয়ের কেবল সংকেত পাওয়া, বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে করা হবে। এ থেকে সিদ্ধ হয় যে, এ ১৯তম ঘাত যা জোড়া হয়েছে, তার স্বরূপ কেবল কৃত্রিম নয় ; বরং আত্যন্তিকভাবে শুদ্ধ।

অন্য কিছু লোকের মত যে, গণনার শেষ সীমা হলো 'কোটি' ; আর কোটি থেকে শুরু করে অঙ্কের ঘাতের ক্রম হবে– কোটি, হাজার, শতক, দশক ; কেননা, দেবতাদের সংখ্যা কোটিতেই প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস মতে, তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে যার এগারো-এগারো ব্রহ্মা, নারায়ণ ও মহাদেব– তিন অঙ্কের করে আছে।

আঠারো ঘাতের পরের ঘাতটি বৈয়াকরণিকদের সংযোজন, যে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দ্রষ্টব্য– ত্রয়োশ্চত্বিংশ অধ্যায়।

এছাড়া আমরা দেখেছি যে, পঞ্চম ঘাতের প্রচলিত নাম 'দশসহস্র' সপ্তমের 'দশ লক্ষ' কিন্তু এ দুই নাম ('অযুত', 'প্রযুত') যা আমরা পূর্বের সূচিতে উল্লেখ করেছি, তা খুব কমই প্রযুক্ত হয়।

কুসুমপুরাবাসী আর্যভট্টের পুস্তকে দশ হাজার কোটি পর্যন্ত ঘাতের নাম দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

অযুতম	কোটি পদ্ম
নিযুতম	পর পদ্ম
প্রযুতম	

এছাড়া একথা বিশেষভাবে মনোযোগের বিষয় যে, কিছু লোক বিভিন্ন নামের মধ্যে এক প্রকারের ব্যুৎপত্তিমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেন ; এজন্য তারা ঘাতকে 'নিযুত' বলে অভিহিত করেন, যা পঞ্চম সাদৃশ্যের উপর রাখা হয়েছে, কেননা, তারা তাকে পঞ্চম 'অযুত' বলে অভিহিত করে। অষ্টম ঘাতকে তারা নবম-এর সাদৃশ্য মোতাবেক 'অর্বুদ' বলে, কেননা, এই নবম অর্বুদকেই তারা 'ন্যর্বুদ' বলে উল্লেখ করে।

এই প্রকারের সম্বন্ধ 'নিখর্ব' ও 'খর্বের' মধ্যে রয়েছে যা বারো ও এগারো ঘাতের নামান্তর এবং 'শঙ্কু' ও 'মহাশঙ্কু'র মধ্যে যা আসে তা হলো ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ ঘাতের নাম। এই সাদৃশ্যানুসারে মহাপদ্ম পদ্মের কিছু পরেই আসা উচিত কিন্তু পদ্ম তো ১০ম ঘাতের নাম আর মহাপদ্ম হলো ১৩শ ঘাতের নাম।

এতে এই পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় যার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে ; কিন্তু এই সাথে এ পার্থক্যও আছে যার কোনো কারণ নেই আর তা এমন লোকেরা সৃষ্টি করেছে, যারা এ সকল নামকে কোনো ক্রম ছাড়াই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, অথবা এর কারণ এও হতে পারে যে, তারা তাদের অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে চাইত না যে– 'জি হ্যাঁ', 'আমি জানি না' এবং এ এমন এক উক্তি, যার প্রয়োগ কোনো প্রসঙ্গেও তারা করতে পারত না... ।

সংখ্যা অঙ্কন

হিঁদুরা পাটীগণিতে অঙ্কের প্রয়োগ এভাবেই করে যেভাবে আমরা করি। আমি একটি পুস্তক লিখেছি, যাতে একথা উল্লেখ করেছি যে, এ বিষয়ে হিঁদুরা আমাদের চেয়ে কতটা অগ্রণী। একথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হিঁদুরা তাদের পুস্তক শ্লোকবদ্ধ রচনা ব্যবহার করে। এখন তারা যদি চায় তাহলে তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিতে বিভিন্ন ঘাতের কিছু অংকের নির্দেশ হেতু তারা এ সবের জন্য ঐ সমস্ত শব্দাবলির প্রয়োগ করবে যেগুলোর প্রয়োগ কিছু অঙ্কে, অথবা কেবল একটি ঘাতে অথবা এক সাথে দু'ঘাতের নির্দেশের জন্য করে থাকে (উদাহরণস্বরূপ, এমন শব্দ যার অর্থ হয় ২০, নতুবা ২০, নতুবা ২০০ দুই-ই)। প্রত্যেক অঙ্কের জন্য তারা একাধিক শব্দের ব্যবহার করেছে। এর কারণ হলো, ছন্দোগত প্রয়োজনে একটি শব্দ অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে, সেই শব্দের সার্থক প্রতিশব্দরূপে সেখানে তারা উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ করে। ব্রহ্মগুপ্তের মতে,

"যদি আপনি 'এক' লিখতে চান তাহলে একার্থবোধক যা একশব্দবাচক শব্দের প্রয়োগ করবেন, যেমন, চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ; যদি দুই বোঝাতে চান তাহলে তার জন্য দ্ব্যর্থবোধক এমন বস্তু নির্বাচন করেন, যার অর্থ হয় দুই, যেমন, সাদা ও কালো, তিনের জন্য এমন শব্দ নির্বাচন করুন যা হবে তিন-বস্তুর সমাহার ; শূন্যের জন্য এসব শব্দে প্রয়োগ করতে চাইলে তা করুন আকাশ হতে আর ১২ সংখ্যার জন্য সূর্যের নাম থেকে।"

নিচের দিককার সারণির অঙ্ক বা সংখ্যাগুলোর জন্য তারা সমস্ত অভিব্যক্তি একত্রে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন আমি শুনতাম যে, এ সমস্ত বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তিকাবলির সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। যখনই আমি সেই শব্দগুলোর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হব তখনই ইনশাল্লাহ সেগুলোকে এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেব।

[০ থেকে নিয়ে ২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্কের (সংখ্যা) জন্য প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দের তালিকা... দ্রষ্টব্য দ্বিচত্বিংশৎ অধ্যায়।]

হিঁদুদের বিচিত্র রীতি-রেওয়াজ

এবার আমরা হিঁদুদের কিছু রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে আলোচনা করব। যে কোনো জিনিসের ভিন্নতা স্পষ্টত, বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তা কদাচিৎই নজরে পড়ে, আর কখনো বা চেষ্টা করলে জানার সুযোগ পাওয়া যায়। আর এ সকল বৈচিত্র্য যদি খুবই প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে তা জানার জন্য কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায় ; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা চমৎকারিত্বের রূপ গ্রহণ করে ; আর যা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের অনুরূপ না হয় তাহলে যতক্ষণ তা প্রত্যক্ষ করা না যায়, ততক্ষণ তা কল্পনার বিষয় হয়েই থেকে যায়। হিঁদুদের অনেক রেওয়াজ আমাদের দেশ ও কালের রেওয়াজ থেকে এতটাই বিপরীত যে, তা আমাদের কাছে বড়ই বিকট বলে মনে হয়। বরং একথাও কেউ ভাবতে পারে যে, তারা জেনে বুঝেই আমাদের বিপরীতাচরণ করে। কেননা, আমাদের রীতি-রেওয়াজ তাদের সাথে একেবারেই মিল খায় না ; বরং সর্বথায় তাদের সম্পূর্ণই বিপরীত ; আর যদি তাদের কোনো রেওয়াজ আমাদের রেওয়াজের সাথে মেলেও, তবুও তার অর্থ হবে সম্পূর্ণ বিপরীত।

তারা শরীরের কোনো অংশের কেশ মুণ্ডন করে না। মূল রূপে তো গরমকালে তারা উদোম হয়ে চলাফেরা করত আর তাদের মাথার চুল না কাটার এটাই ছিল মূল কারণ যে, তারা সূর্যালোক থেকে বাঁচতে চাইত।

তারা গোঁফদাড়িও কামাত না। আর তো গুপ্তাঙ্গের কেশ মুণ্ডনের প্রশ্নই ওঠে না। তারা জনসাধারণকে এই বলে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, গুপ্তাঙ্গের কেশ মুণ্ডন

করলে কামপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বিষয়-বাসনাও বেড়ে যায়। এজন্য এ সমস্ত লোকের সহবাসের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গুপ্তাঙ্গের কেশ মুণ্ডন করে না।

তারা নখ বৃদ্ধি করে এবং নিজেদের অলসতার গুণগান করে। কেননা, তারা নখ দিয়ে কোনো কাজ করে না। আর সুখদায়ক অলস জীবন অতিবাহিত করার জন্য তারা অন্যকে দিয়ে মাথার চুলের মধ্যে উকুনের সন্ধান চালায়।

হিঁদুরা আলাদা আলাদা বসে পানাহার করে, তাদের খাওয়ার জায়গা গোবর দিয়ে লেপা মোছা হয়। তারা উচ্ছিষ্ট ফেলার জন্য আলাদা পাত্র ব্যবহার করে না এবং যে পাত্রে তারা খায়, তা মাটির তৈরি হলে খাওয়ার পরে তাকে ফেলে দেয়।

যেহেতু তারা চুন ও সুপারি দিয়ে পান খায় সেহেতু তাদের দাঁত সর্বদাই লাল থাকে।

তারা খালি পেটে মদিরা পান করে এবং তার পরে ভোজন করে। তারা গরুর দুধ প্রচুর পরিমাণে খায় কিন্তু তার মাংস খায় না।

তারা ঝাঁঝ, করতাল ইত্যাদি কাঠের ছড়ি দিয়ে বাজায়।

তারা পাজামার (স্থলে) জন্য ধুতি ব্যবহার করে। যারা স্বল্প পোশাক পরতে চায় তারা দু'আঙুল চওড়া কাপড় তলপেটের নিচ দিয়ে গুপ্তাঙ্গকে আড়াল করে কাছা দিয়ে কোমরের সাথে বেঁধে নেয় ; কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বেশি কাপড় পরতে চায় তারা ধুতি পরে, যাতে একটা কাপড় লাগে যা দিয়ে একটি চাদর ও কম্বল বানিয়ে নেওয়া যায়। এ ধুতি এতটা লম্বা এবং চওড়া যে, তা পা পর্যন্ত পড়ে এবং পুরো শরীরকে ঢেকে দেওয়া যায়। তা কোমরে পেঁচিয়ে পিছনে কাছা দিয়ে পরা হয়।

এর একটি অংশ দিয়ে মাথা, বুক ও শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বা ঘাড় ঢেকে নেয়, দেখলে মনে হয় তা পাজামার মতো করে বানানো, এর পিছনে আলাদা বোতাম লাগানো হয়।

তাদের কুর্তা (যা স্ত্রীদের পোশাক এবং কাঁধ থেকে শরীরের মধ্যভাগ ঢাকা এবং হাতাওয়ালা) ডান এবং বাম দু'দিকেই দেওয়া থাকে।

জুতো তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পরতে শুরু করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শক্ত হয়। তারা বাছুরের চামড়া থেকে জুতো তৈরি করে।

হাত-মুখ ধোয়ার সময় প্রথমে তারা পা ধোয়, তারপরে মুখ। তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পূর্বে গোসল করে...।

ব্রত পালনের দিন তারা শরীরের সুগন্ধাদি মাখার পর সারা শরীরে গোবর লেপন করে।

পুরুষরা স্ত্রীদের পরিধানসামগ্রী পরিধান করে। তারা ভূষণাদি পরিধান করে, কানে দুল, বাহুতে কড়া, অনামিকা এবং পায়ের আঙুলে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে...।

তারা জিন ছাড়াই অশ্বারোহণ করে, আর যদি জিন তারা লাগায়ও তবুও তারা ঘোড়ার ডানদিক থেকে গিয়ে ওঠে। আর ঘোড়ার পিঠে উঠে কোথাও গেলে তারা পিছনে একজনকে বসিয়ে নেয়।

তারা তাদের কোমরের ডানদিকে কুঠার বেঁধে নেয়।

তারা একটি মেখলা পরে, যাকে যজ্ঞোপবীত বলে, সেটি বাম কাঁধ থেকে ডানদিকের কোমর পর্যন্ত ঝোলানো থাকে। সমস্ত প্রকার কাজের পূর্বে এবং আপৎকালে তারা স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে।

সন্তান জন্মালে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুরুষ সন্তানের দিকে তারা বেশি মনোযোগী হয়।

তাদের জমজ সন্তান জন্মালে ছোট সন্তানটির প্রতি তাদের মনোযোগ বেশি থাকে। বিশেষ করে দেশের পূর্বাঞ্চলে এটা বেশি করে লক্ষ করা যায়। কেননা, তাদের মতে, প্রথমটির জন্ম মূলত কামপ্রবৃত্তির ফসল কিন্তু দ্বিতীয়টি পরিণত চিন্তন ও প্রশান্ত সহবাসের পরিণাম।

কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে তারা অনুমতি নেয় না কিন্তু ফিরে আসার সময় অনুমতি চায়।

বসার সময়ে তারা হাত বা অন্য কিছু দিয়ে এলোমেলো করে ঝাড় দিয়ে বসে।

থুথু ফেলার বা নাক ঝাড়ার সময় আশপাশে বসে থাকা লোকেদের প্রতি তারা কোনো পরোয়া করে না। তারা প্রকাশ্যে লোকের সামনে মাথা থেকে উকুন বেছে তাকে মারতে দ্বিধা করে না। তারা পশ্চাদদেশ হতে বায়ু নিঃসরণ ও তার গন্ধ নাকে আসাটাকে অশুভ লক্ষণ বলে বিবেচনা করে।

তারা জোলাদের নোংরা এবং নাপিত ও মুচিকে স্বচ্ছ বা পবিত্র জ্ঞান করে, যারা মরণাপন্ন পশুকে পানিতে ডুবিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে মারে তাদের অর্থ গ্রহণ করে।

তাদের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে লেখার জন্য কালো তক্তা (শ্লেট) ব্যবহার করে এবং চওড়ার দিক থেকে নয় ; বরং লম্বায় বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখে যায়। নিচের পংক্তিটি পড়ে কারো ধারণা হতে পারে যে, কবির এ বক্তব্য মূলত হিঁদুদের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকবে।

'কত না লেখক কয়লার মতো কালো কাগজের ব্যবহার করে। তারা তার উপর লেখনীর মাধ্যমে সাদা কালি দিয়ে লেখে, মনে হয় যেন অন্ধকারকে দিবালোকে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছে : মনে হয় যেন তার উপরে তারা কিছু বুনে দিয়েছে, কিন্তু তার সীমানা ছাড়িয়ে যায়নি।'

তারা তাদের পুস্তকের শিরোনাম গ্রন্থের শুরুতে দেয় না ; বরং নিচে দেয়।

তারা তাদের ভাষার সংজ্ঞাসমূহকে স্ত্রীলিঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকে, যেভাবে আরবরা সেগুলোকে স্বল্পার্থের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। তাদের

মধ্যেকার কোনো ব্যক্তি কাউকে কিছু দিতে গেলে সে আশা করে যে, সেটি এমনভাবে তার দিকে নিক্ষেপ করবে, যেমনটি একটি কুকুরকে নিক্ষেপ করে কিছু দেওয়া হয়।

যদি দুজন ব্যক্তি 'নার্দ' (পাশা বা ঐ জাতীয় কোনো খেলা) খেলে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি দুয়ের মাঝখানে পাশা নিক্ষেপ করে।

তারা সেই লালাকে খুব পছন্দ করে যা কামোত্তেজনার সময় বড় বড় হাতির মুখের মধ্যে প্রবাহিত হয়, যা অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়ে থাকে।

ভারতীয় শতরঞ্জ (দাবা)

দাবা খেলার সময় হাতিকে তারা সোজা চালনা করে, ডাইনে-বামে নয়, আর সেও পেয়াদার মতো চলতে থাকে, চারটি কোণের মধ্যে সে একটি ঘরেই চলে, যেমনটি চলে উজির (ফিরজোন)। তাদের মতে, এর ঘর পাঁচটি (অর্থাৎ একটি সোজা ও চারটি কোণ), যার একটি হাতির শুঁড় থাকে আর অন্য চারটিতে তার চারটি পা থাকে।

তারা শতরঞ্জের একজোড়া পাশা থেকে চারটি মিলিয়ে খেলে। ঘর অনুযায়ী তার বিন্যাস এরূপ :

রুখ	ঘোড়া	হাতি	শাহ			পেয়াদা	রুখ
পেয়াদা	পেয়াদা	পেয়াদা	পেয়াদা	পেয়াদা			ঘোড়া
						পেয়াদা	হাতি
						পেয়াদা	শাহ
শাহ	পেয়াদা						
হাতি	পেয়াদা						
ঘোড়া	পেয়াদা		পেয়াদা	পেয়াদা		পেয়াদা	পেয়াদা
রুখ	পেয়াদা		শাহ	হাতি		ঘোড়া	রুখ

যেহেতু এ ধরনের শতরঞ্জ বা দাবা খেলার প্রচলন নেই সেজন্য আমি এদের সম্পর্কে যতটা জানি তা বর্ণনা করছি।

এরা চার ব্যক্তি গোলাকার হয়ে বসে খেলা করে এবং প্রতিবারেই প্রত্যেক ব্যক্তি দুটি করে পাশা ফেলে। পাশার পঞ্চম ও ষষ্ঠটি খালি (কেননা, তা গণনা করা যায় না) থাকে। এমতাবস্থায় পাশার পাঁচ বা ছয় পড়লে তাকে চার বলে গণ্য করা হয়, কেননা, এ দুই অঙ্কের মোহরকে নিম্নলিখিত গণনা করা হয় :

৬			৫
৪	৩	২	১

যাতে ৪ ও ১ এ এক প্রকারের সাম্যতা ভারতীয় সংকেতগুলোতে প্রদর্শন করা যেতে পারে।

এখানে 'শাহ'—ফর্জি বা উজিরকে বলা হয়।

পাশা যতবার ফেলা হবে ততবার কোনো-না-কোনো মোহরা চলতে থাকবে। ১ পড়ার পর পদক্ষেপ (পায়দল) বা শাহ চলবে। তাদের চালসমূহ সাধারণ শতরঞ্জের মতো হয়। শাহ যখন কিস্তিমাৎ করে তখন তার আপন স্থান থেকে হটানো যায় না।

২ পড়ার পর রথ চালতে থাকে। তা তেরচাভাবে চলার পর তৃতীয় ঘরে চলে যায়, যেভাবে আমাদের এখানে শতরঞ্জের হাতি চলে।

৩ আসার পর ঘোড়া চলে। এর চাল সাধারণভাবে যেমনটি হয় অর্থাৎ আড়াই ঘর।

৪ আসার পর হাতির চাল চলে। তা সোজা চলে, যেমনটি আমাদের দেশে রথ চলে, তবে তার চালকে রুখে না দিলে তারপর, অথবা তার উপযুক্ত ঘর না থাকলে। যদি এমন অবস্থা এসে যায়, যেমনটি কখনো-কখনো আসে তাহলে একই পাস-এ তার বাধা দূর হয়ে যায় এবং তার চালের ঘর খুলে যায়। তার সবচেয়ে ছোট চাল হয় এক ঘর আর সবচেয়ে বড় চাল হয় ১৫ ঘর, কেননা, কখনো-কখনো পাশগুলো থেকে দুই অথবা ৪, অথবা দুই অথবা ৬ অথবা এক অথবা ৬ পড়ে যায়। এই সংখ্যাগুলোতে পড়ে যাওয়ার পর হাতি দাবার ছকের আড়াই বা বাম-এর দিকে চালতে থাকে আর যদি সংখ্যা আরও কিছু থাকে তাহলে তা ছকের অন্যদিকে চলে। তবে শর্ত যে, সে পথে কোনো বাধা যেন না আসে। এ দুই সংখ্যার ফলস্বরূপ হাতি তার চালসমূহের মধ্যে তির্যকের দুটি মাথার উপরে বসে যায়।

প্রত্যেকটি ঘুঁটির কিছু বিশেষ মূল্য আছে আর সেই অনুসারে খেলোয়াড় হার অথবা জিতের সংখ্যা লাভ করে, কেননা, ঘুঁটি উঠিয়ে নেওয়া হয় আর তা খেলোয়াড়ের হাতে এসে পড়ে। শাহের মূল্য ৫, হাতির ৪, ঘোড়ার ৩, রুখের ২ এবং পেয়াদার ১ হয়। যে শাহকে নিয়ে নেয় সে ৫ পায়। আর যদি সে দুই শাহ নিয়ে নেয় তাহলে তো ১০, আর তিন নিলে ১৫, তবে শর্ত যে, বিজেতার কাছে নিজের শাহ থাকতে পারবে না। কিন্তু যদি তার নিজের শাহ জীবিত থাকে আর সে তিন শাহের সবটিকে নিয়ে নেয় তাহলে সে ৫৪ সংখ্যা (অঙ্ক) লাভ করবে। এ এমন একটা সংখ্যা যার প্রতি সবাই সহমত পোষণ করে ; একে বীজগণিতের নিয়মানুসারে স্থির করা হয়নি।

[আল বিরুনী হিঁদুদের রীতি-রেওয়াজগুলো সম্পর্কে তাঁর বিবরণ সমাপ্ত করতে গিয়ে এ মতও ব্যক্ত করেছেন যে, হিঁদুরা নিজেদেরকে মুসলমানদের চেয়ে

ভিন্ন ও তাদের চেয়ে 'শ্রেষ্ঠতর' বলে দাবি করে কিন্তু সেই সাথে একথাও বলেছেন যে, আত্মশ্লাঘার এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানরাও গ্রহণ করেছিলেন। হিঁদুদের অদ্ভুত সব রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কিত সন্দর্ভে তিনি এমন কিছু অনৈতিক প্রথার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের মধ্যে ছিল ইসলামের উত্থানের পরে এ সমস্ত কু-রীতি বা কুপ্রথাগুলো আরব থেকে এবং ভারতের ঐ সমস্ত প্রদেশগুলো থেকে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছে, যেখানকার লোকেরা ইসলাম ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছিল।' দ্রষ্টব্য : চতুশ্চত্তারিংশৎ ও পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়।]

সপ্তদশ অধ্যায়

হিঁদুদের শাস্ত্রসমূহ, যাতে সাধারণভাবে অজ্ঞানতার প্রশ্রয় পাওয়া যায়

সাধারণ হিঁদুদের কিমিয়ো বা অপরসায়ন-সম্পর্কিত ধারণাসমূহ

ডাকিনীবিদ্যা বা জাদুটোনা বলতে আমরা বুঝি যে, কোনো বস্তু দ্বারা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রভাবিত করে এমনভাবে দেখানো যার বাস্তব রূপ সম্পর্কে মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। এই অর্থেই তা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে প্রচারিত। যদি একে এমনভাবে বোঝানো যায়, যেভাবে সাধারণ মানুষেরা বুঝতে অভ্যস্ত, কোনো অসম্ভব বস্তুকে যদি সম্ভব করে দেখানো যায় তাহলে তা এমন হবে যে, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কারণ, প্রকৃত তথ্য এই যে, যা কিছু অসম্ভব, তা করে দেখানো সম্ভব নয়, আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য জাদুটোনা এমনই একটি বস্তু বিজ্ঞানের সাথে যার সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

জাদুটোনারই একটি প্রকার হলো কিমিয়া, যদিও এ নাম থেকে তা বোঝা যায় না। কিন্তু যদি এক ব্যক্তি একগাছি সুতাকে সোনার টুকরো হিসেবে দেখায় তাহলে আমরা তাকে জাদুটোনা ছাড়া আর কী বলে অভিহিত করতে পারি ? এ ঠিক এরকমই যে, কোনো রুপার টুকরোকে হাতে নিয়ে যদি তাকে সোনার টুকরো করে দেখানো হয়, তাহলে তো বোঝাই যায় যে, তার উপরে এমন এক রং চড়ানো হয়েছে যে, তা সোনার মতো মনে হয়েছে, যদিও প্রথমে তা সোনা ছিল না।

হিঁদুরা কিমিয়ার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায় না, কিন্তু একথাও সত্য যে, তা থেকে তারা একেবারে মুক্তও নয় ; বরং অবস্থা এই যে, একটি দেশ যদি অন্য দেশের তুলনায় এদের প্রতি বেশি আগ্রহ পোষণ করে তাহলে আমরা তাকে বুদ্ধিমান এবং অন্যকে বুদ্ধিহীন বলতে পারি না, কেননা, আমরা দেখেছি যে, অনেক বুদ্ধিমান লোক কিমিয়ার পিছনে দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর অজ্ঞানী লোকেরা এতে এবং এদের বিশেষজ্ঞদের উপহাস করে। কিন্তু ঐ বুদ্ধিমান লোকেদের এদের কোনো দোষ নেই যে, তারা এরকম মিথ্যা বিজ্ঞানের প্রতি কেন

এতটা আকর্ষণ অনুভব করে। কেননা, তাদের তো উদ্দেশ্য এটাই যে, তা থেকে তারা ধনোপার্জন করবে আর জীবনের দুর্ভাগ্যের দিনগুলোকে তারা রুখে দেবে, এ কারণে তারা এ বিষয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। একবার কোনো এক ধুরন্ধরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, বিদ্বানরা ধনবানদের দরজায়-দরজায় ধর্না দিয়ে বেড়ায় কেন, অথচ ধনীরা বিদ্বানদের পথ দিয়েও তো পা বাড়ায় না ! তিনি জবাব দেন, 'বিদ্বান ধনের সঠিক ব্যবহার জানে কিন্তু ধনবান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সব সময়েই অজ্ঞ।' কিন্তু অন্য দিকে, অজ্ঞানী লোকেদের প্রশংসা শুধুমাত্র এ কারণে করা উচিত নয়– যদিও তারা খুবই শান্তিপূর্ণ ব্যবহার জানে– তারা কিমিয়া থেকে দূরে অবস্থান করে, কেননা, তাদের উদ্দেশ্য আপত্তিকর, এর অন্য কোনো কারণ নেই ; বরং তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাই এর কারণ।

এই কলার বিশেষজ্ঞরা এ তথ্য গোপন রাখেন এবং ঐ লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য আগ্রহী থাকেন অথচ তারা তাদের পক্ষের লোক নয়। এর কারণ এটাই যে, আমি হিঁদুদের কাছ থেকে এ কথা জানতে পারিনি যে, এই সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা কী জিনিস ব্যবহার করেন– খনিজ, জান্তব না উদ্ভিজ্জ ? আমি তাদের কেবল ঊর্ধ্বপাতন, ভস্মীকরণ ও অভ্রের উপর প্রলেপ লাগানোর প্রক্রিয়ার কথাই বলতে শুনেছি, যাকে তারা নিজেদের ভাষায় 'তালক' বলে অভিহিত করে, এ থেকেই আমার অনুমান যে, তারা কিমিয়ার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

রসায়ন শাস্ত্র

কিমিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য একটি বিজ্ঞান তাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত, একে তারা বলে 'রসায়ন শাস্ত্র', যার ব্যুৎপত্তি 'রস' অর্থাৎ সোনা থেকে এসেছে। এ এমন একটি শাস্ত্র বা কতিপয় ক্রিয়াপ্রক্রিয়া, বা ঔষধি ও যৌগিক ওষুধসমূহ পর্যন্ত সীমিত, যার অধিকাংশই বনস্পতি হতে গৃহীত। এ সকল ঔষধ সেবন করে তারা অধিকাংশই সুস্থ হয়ে যায়, এমনকি অনেক কঠিন রোগব্যাধি থেকেও তারা সুস্থ থাকে। এসব ব্যবহারের ফলে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা কমে যায়, যৌবনের সতেজতা ফিরে আসে, যেমনটি তারা তরুণ বয়সে থাকে। সাদা চুল পুনরায় কালো রূপ ধারণ করে, ইন্দ্রিয়শক্তি কিশোর বয়সের মতো চেতন অবস্থায় ফিরে আসে। এমনকি তাদের সম্ভোগশক্তি বেড়ে যায় এবং লোকেদের আয় বৃদ্ধি পায়।

[রসায়ন শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে কিছু অবিশ্বাস্য কাহিনিও লিপিবদ্ধ হয়েছে, যার নাম : 'সোমনাথের নিকটে দুর্গ ডিহক' এর নাগার্জুন : ব্যাদি যিনি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে উজ্জৈন-এ বসবাস করতেন ; এক অখ্যাত ব্যক্তি যিনি মালব-এর রাজধানী ধার-এর অধিবাসী ছিলেন, আর এক ব্যক্তি ছিলেন দরিদ্র ফল-বিক্রেতা, যার নাম ছিল র‍্যাংকা এবং বল্লভি নামক নগরে বাস করতেন রাজা বল্লভ।

তাদের মধ্যেকার কিছু লোক এক গোপন সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা অতিপ্রাকৃত শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। আরও এমন কিছু লোক ছিল যাদের দুঃখজনক পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। দ্র. ষষ্ঠ ও সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়।]

অজ্ঞ হিঁদু রাজাদের সোনা তৈরির আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। তাদের মধ্যে কেউ কিমিয়া তৈরির পরিকল্পনা করতে চাইলে লোকেরা যদি তাদের পরামর্শ দিত যে, এত সংখ্যক বালককে হত্যা করো, তাহলে তারা রাক্ষসদের ন্যায় এমন জঘন্যতম অপকর্ম করতেও দ্বিধা করত না– তারা তাদের আগুনে নিক্ষেপ করত। যদি এমন মূল্যবান রসায়ন শাস্ত্রকে এমন দূরবর্তী সীমান্তে গিয়েও ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে কেউ পৌঁছাতে না পারে, তাহলে তা হবে বড়ই পুণ্যের কাজ...।

গরুড় পাখি

যেখানে সম্মোহন ও মন্ত্রাদির সম্পর্ক, সেখানে তার প্রতি হিঁদুদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে, আর সাধারণত, তারা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। যে পুস্তকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মতে তার রচয়িতা গরুড় যা একটি পাখি নামে পরিচিত, যা ছিল নারায়ণের বাহন...।

সাপে কাটা মন্ত্রের প্রভাব

তাদের অধিকাংশ মন্ত্রই সাপে কাটা রোগীদের জন্য রচনা করা হয়েছে। [মন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।]

শিকার

আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, হরিণ শিকার করতে গিয়ে তাকে হাতে করে ধরা হয়েছে। এক হিঁদু তো আমাকে একথাও পর্যন্ত বলেছিল যে, সে হরিণকে না ধরে তার পিছু পিছু তাকে রান্নাঘরের মধ্যে নিয়ে চলে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে সে এটা করত আমি পরে তা জানতে পেরেছি এবং আমি তা এতটাও বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, তারা কোনো রাগ-বিশেষের দ্বারা পশুদের প্রভাবিত করে ; যে রাগ শুনে পশুরা মোহিত হয়ে যায়, আর সেই সুযোগে তারা তাকে বশ করে থাকবে।

কতা-পক্ষী– (বা কাঠঠোকরা) শিকারের ক্ষেত্রেও এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, রাতের বেলা তারা তামার বাসনপত্র একই তালে বাজিয়ে তাদের আকর্ষণ করে। পাখিদের হাত দিয়ে ধরে ফেলে। কিন্তু তাল কেটে গেলে পাখিরা চারদিকে উড়ে যায়।

এ সমস্ত রীতি-রেওয়াজের সঙ্গে সম্মোহনী বিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। কখনো-কখনো হিঁদুদের জাদুকর বলেও মনে করা হয়। কেননা, উঁচু উঁচু কড়িকাঠে অথবা টাঙানো দড়ির উপরে দাঁড়িয়ে তারা বল নিয়ে খেলা করে, কিন্তু এ ক্রীড়া সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তাদের দেশ, তাদের নদনদী, সাগর-মহাসাগর, বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের সীমানা থেকে তাদের দূরত্বের বিবরণ

বাসযোগ্য ভূখণ্ড ও সমুদ্র

পাঠক ! বাসযোগ্য সেই ভূখণ্ডের কল্পনা করুন, যেটি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ; বরং ঐ গোলার্ধের অর্ধভাগে অর্থাৎ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশে অবস্থিত। এ ভূখণ্ড সমুদ্র বেষ্টিত যা পূর্ব এবং পশ্চিম দুই অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইউনানিরা এর পশ্চিম অংশকে তাদের দেশ উকিয়ানুমের সীমানাবর্তী বলে মনে করে। এ সমুদ্র বসবাসযোগ্য ভূখণ্ডকে ঐ সমস্ত মহাদেশ বা বসবাসযোগ্য দুর্গগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যা তার ওপারে পূর্ব-পশ্চিম দু'দিকেই অবস্থিত, কেননা, এ অন্ধকারময় পরিবেশ ও জলাভূমি জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত নয়, আর সেখানে সড়ক যোগাযোগও নেই। এছাড়া এখানে প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার আর তাতে কোনো লাভও নেই। এই কারণে প্রাচীনকালের লোকেরা সমুদ্র ও তার তটবর্তী স্থানগুলোতে বিশেষ সংকেতের ব্যবস্থা রাখত, যাতে লোকেরা এ সমস্ত জায়গায় প্রবেশ না করে।

বসবাসযোগ্য ভূখণ্ডে অতিমাত্রায় শীতলতার কারণে মানুষ উত্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয় না, কিন্তু কিছু অন্তরীপ ও উপসাগরে তারা প্রবেশ করতে পেরেছে। দক্ষিণ দিকে এ ভূখণ্ড মহাসাগরের তট পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পশ্চিম ও পূর্বদিকে সাগর দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ মহাসাগর নৌ-চলাচলের যোগ্য, কিন্তু এ দক্ষিণের বসবাসযোগ্য ভূমির সংলগ্ন ভয় ; বরং এর বিপরীতে বসবাসযোগ্য ভূমি দক্ষিণ দিকে দ্বীপের আকারে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যেগুলো মহাসাগরের বুকে গড়ে উঠেছে। এই সুদূরস্থিত দক্ষিণী প্রদেশগুলোতে জল ও স্থলের মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে কিছু বিবাদও আছে, যার পরিণামে এক স্থানে মহাদেশ সমুদ্রকে অতিক্রম করেছে, আবার অন্য স্থানে সমুদ্র মহাদেশের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

মহাদেশ পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে সমুদ্রমধ্যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার তট দক্ষিণ দিকেও অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এই মহাদেশের বড় বড় প্রান্তরগুলোর পশ্চিম হাবসিদের বসবাস, যেখান থেকে দাস আমদানি করা হয়, আর ঐ মহাদেশের কোহে-মাহ নামক স্থানটি- যা নীলনদের উৎস। এর তটগুলোতে এবং তটের সম্মুখবর্তী দ্বীপগুলোতে জঞ্জ-এর বিভিন্ন গোত্রের লোকেদের বসবাস। কিছু উপসাগর তো পৃথিবীর এই পশ্চিমী গোলার্ধের মহাদেশে প্রবেশ করেছে- বেরবেরা উপসাগর, লোহিত (কিলিসমা) সাগর ও পারস্য উপসাগর- আর এই তিন উপসাগরের মধ্যে পশ্চিমী মহাদেশ কমবেশি সমুদ্রমধ্যবর্তী স্থানে অগ্রসর হয়েছে।

পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে সমুদ্র উত্তরী মহাদেশে এতটাই গভীরে প্রবেশ করেছে যতটা মহাদেশ পশ্চিমি গোলার্ধে দক্ষিণ সমুদ্রে চলে গিয়েছে এবং কিছু স্থানে তা এমন উপসাগর ও মোহনা তৈরি করে নিয়েছে যা মহাদেশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত- যেখানে উপসাগরগুলো তো সমুদ্রের অংশ আর মোহনাগুলো নদীর সমুদ্রে পতিত হওয়ার স্থান। এ সমুদ্রের নাম অধিকাংশই ঐ সমস্ত দ্বীপের সঙ্গে সম্পর্কিত যেগুলো ঐ তটের সংলগ্ন অথবা ঐ তটের সীমার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখানে আমাদের সম্পর্ক সমুদ্রের ঐ ভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত যেখানে তা ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা সংলগ্ন, আর এজন্য একে 'ভারত মহাসাগর' বলা হয়।

এশিয়া ও ইয়োরোপের পার্বত্য নক্শা

বসবাসযোগ্য ভূখণ্ডের পর্বতের আকৃতি ও তার উত্তুঙ্গ পর্বতমালাগুলো দেবদারু বৃক্ষের কশারুর মতো পৃথিবীর মধ্যবর্তী অক্ষাংশ থেকে দেশ হতে দেশান্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এবং চীন, তিব্বত, তুর্কিস্তান, কাবুল, বদখশান, তাখারিস্তান, বামিয়ান, আলগোর, খুরাসান, মিদিয়া, আজারবাইজান, আরমানিয়া, রোমান সাম্রাজ্য, ফ্রান্স ও জালালিক এলাকা অতিক্রম করে গিয়েছে। এই পর্বতমালা দীর্ঘ তো বটেই, এর প্রস্থও অনেক বেশি আর এছাড়া এটা কিছুটা বাঁকাভাবে বিস্তৃত, যা ঐ বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে বেষ্টন করে রয়েছে, আর যেখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণের নদীগুলোতে পানি প্রবাহিত হয়। এই বিস্তৃত সমতলভূমিগুলোর একটি হলো ভারত, যার দক্ষিণে উপরোক্ত ভারত-মহাসাগর অবস্থিত। আর তার বাকি তিনদিক সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত আর নদীগুলো এদেশের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ভারত, এক নবনির্মিত বাসযোগ্য ভূমি

ভারতভূমির আকৃতি ও তার গঠন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন আকৃতির পাথর জমিনের অতি গভীর খাদের মধ্য থেকে পাওয়া

যায়, পাথর পাহাড়ের আশপাশে পাওয়া যায়, নদীর প্রচণ্ড ধারাপ্রবাহের সঙ্গেও পাথর পাওয়া যায়, যেখানে নদীর গতি কমে গেছে সেখানে পাথর ক্ষয়ে গিয়ে ছোট আকার ধারণ করেছে, পাথর সেখানেও অতি ক্ষুদ্রাকারে পাওয়া যায় যেখানে নদী তার মোহনায় গিয়ে যাত্রাভঙ্গ করে, তবে সেখানে পাথর প্রচণ্ড স্রোত ও ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়ে গিয়ে বালুকার আকার ধারণ করে– যদি এ সমস্ত বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে একথা কখনো কল্পনাও করা যায় না যে, ভারত কোনো সময়ে সমুদ্রমধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, যা নদীর পলি জমে এই ভূখণ্ডের রূপ ধারণ করেছে।

মধ্যপ্রদেশ, কনৌজ, মথুরা ও থানেশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত দিক-নির্দেশ

ভারতের মধ্যবর্তী স্থান কনৌজের আশপাশে অবস্থিত প্রদেশটি মধ্যপ্রদেশ নামে পরিচিত ; কেননা, এটি সমুদ্র ও পাহাড়-পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং এর উপর ও নিচে ঠাণ্ডা ও গরম এলাকা অবস্থিত আর এটি ভারতের পূর্ব পশ্চিম সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, সেজন্য ভৌগোলিক দৃষ্টিতে তা ভারতের মধ্যভাগ বা কেন্দ্র। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও তা একটি কেন্দ্রই ; কেননা, সুদূর অতীতকাল থেকে এই স্থানটি হিঁদুদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নায়ক ও রাজ-রাজড়াদের বাসস্থান।

কনৌজের পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধুদেশ অবস্থিত। যদি আমরা আমাদের দেশ থেকে সিন্ধু দেশের দিকে যাত্রা করি তাহলে আমাদের তিমরোজ দেশ থেকে রওনা হতে হয়, যা সিজিস্তান নামে পরিচিত আর ভারতের দিকে যেতে চাইলে কাবুল থেকে যাত্রা শুরু করতে হয়। কিন্তু ভারতে প্রবেশের এটাই একমাত্র পথ নয়। আপনি যে কোনো দিক থেকে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করতে পারেন, তার শর্ত যে, পথের বাধা অতিক্রম করতে হবে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যে পর্বতমালা রয়েছে, সেখানে হিঁদুদের সঙ্গে সম্পর্কিত উপজাতি শ্রেণীর লোকেরা বসবাস করে– বিদ্রোহী বন্য ও বর্বর জাতি– যারা হিঁদুদের অতি-দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

কনৌজ গঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটি বড় নগর আছে, তবে তা নষ্টভ্রষ্ট ও উজাড় হয়ে গিয়েছে। রাজধানী সেখান থেকে বাড়ি[৩১] নামক স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ফলে এমনটি হয়। এখন তা গঙ্গা নদীর পূর্ব তটে অবস্থিত। এ দুটি নগরের পরস্পরের দূরত্ব তিন-চারদিনের পথ।

পাণ্ডবদের কারণে যেমন কনৌজ বিখ্যাত হয়ে ওঠে, তেমনি বাসুদেবের কারণে মহুরা (মথুরা)-ও খ্যাতনামা হয়ে ওঠে। এটি জৌন (যমুনা) নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। মহুরা ও কনৌজের দূরত্ব ২৮ ফারসাখ।[৩২]

থানেশ্বর (স্থানেশ্বর) দুই নদীর মধ্যবর্তী এবং কনৌজ ও মহুরার উত্তরে অবস্থিত, কনৌজ থেকে এর দূরত্ব ৪০ ফারসাখ এবং মহুয়া থেকে ৫০ ফারসাখ দূরে।

পর্বতমালা থেকে উৎসারিত গঙ্গা নদীর কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তার উৎস কেন্দ্রকে বলা হয় গঙ্গাদ্বার। দেশের অধিকাংশ নদীই ঐসকল পর্বতমালা হতে উৎসারিত, যা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

হিঁদুদের দূরত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি

যেখানে ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের দূরত্বের প্রশ্ন, এ দূরত্বের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, সেখানে তার জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, সে জনশ্রুতি এমনই যে, টলেমি প্রায়শই এই জনশ্রুতি সঠিক নয় বলে অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতে, তাঁরা নিরন্তর মনগড়া কাহিনি প্রচার করে। সৌভাগ্যবশত, আমি এ ক্ষেত্রে এমন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করি, সঙ্গে সহজেই মিথ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। হিঁদুরা প্রায়শই ভারের অনুমান এমন বেল (ষাঁড়) থেকে করে, যারা সাধারণত ২০০০ থেকে ৩০০০ মন ভার ওঠাতে পারে (কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, একটি বেলের (ষাঁড়) পক্ষে এক সঙ্গে এত ভার ওঠানো সম্ভব নয়।) এরই পরিণামস্বরূপ, তাদের নিজেদের গাড়িকে কয়েক দিন যাবৎ স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া ও পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ ফাঁপরে পড়ে যেতে হয়। প্রকৃত সত্য এই যে, ষাঁড়ের উপর বোঝা চাপিয়ে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে তারপর দূরত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয় ; দ্বিতীয়ত, গাড়িতে করে 'স্থান হতে স্থানান্তর' গমনের দিনের সংখ্যা নির্ধারণ করে দূরত্ব নিরূপণ করে। হিঁদুদের বর্ণনাকে নিশ্চিতভাবে জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বড়ই পরিশ্রম ও সাবধানতার সঙ্গে করতে হয়। কিন্তু এছাড়াও আমি তাদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জেনে ফেলার কারণে তারা প্রকৃত সত্যকে গোপন করার সুযোগ পায়নি। তবে, একথাও ঠিক যে, তাদের এমন অনেক কিছুই আছে যার সম্পর্কে আমি পুরো তথ্য অবগত হতে পারিনি। যদি এরও মধ্যে কোনো ভুলক্রুটি পাঠকের সামনে পড়ে তাহলে তা আমার অনবধানতা বিবেচনা করে পাঠকের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং আরও অগ্রসর হচ্ছি।

কনৌজ থেকে প্রয়াগ (ইলাহাবাদ) এবং পূর্ব সমুদ্রতট অবধি বিবরণ

কোনো ব্যক্তি কনৌজ থেকে যাত্রা করে দক্ষিণা পথে যমুনা ও গঙ্গা নামক নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অগ্রসর হলে তাকে নিম্নলিখিত স্থানগুলো অতিক্রম

করতে হবে– জাজ্জামাউ, যা কনৌজ থেকে ১২ ফারসাখ দূরত্বে অবস্থিত– প্রত্যেক ফারসাখ চার মাইল বা এক কুয়োহের (ক্রোশ) সমতুল্য ; আভাপুরী ৮ ফারসাখ, কুরাহা ৪ ফারসাখ ; বরহমশীল ৮ ফারসাখ ; প্রয়াগ বৃক্ষ ৮ ফারসাখ ; এটি সেই স্থান যেখানে যমুনা নদীর পানি গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হয়, যেখানে হিন্দুরা নিজেদেরকে খুবই যাতনা দিয়ে থাকে, যার বিবরণ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রয়াগ বৃক্ষ থেকে গঙ্গার মোহনার দূরত্ব ১২ ফারসাখ।

দেশের অন্য প্রদেশ প্রয়াগ বৃক্ষ থেকে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত। 'অরকুতীর্থ' প্রয়াগ থেকে ১২ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ; অবোহর রাজ্য ৪০ ফারসাখ ; সমুদ্রতটবর্তী স্থানে অবস্থিত উদরাবিশৌ ৫০ ফারসাখ দূরত্বে অবস্থিত।

ওখান থেকে সমুদ্রতট ধরে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকলে যে দেশ পড়বে যেটি জৌর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ; প্রথমে পড়বে দারৌর যেটি উদরাবিশৌ থেকে ৪০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ; কাঞ্চি ৩০ ফারসাখ ; মলয় ৪০ ফারসাখ ; কুর্ক ৩০ ফারসাখ– যেটি ঐ প্রান্তের শেষ রাজ্য যার উপরে জৌর-এর আধিপত্য রয়েছে।

বাড়ি থেকে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত

গঙ্গার তীর বরাবর যদি আপনি বাড়ি থেকে পূর্বদিকে চলতে থাকেন তাহলে আপনাকে এই স্থানগুলো অতিক্রম করতে হবে। অজোধা (অযোধ্যা) বাড়ি থেকে ২৫ ফারসাখ ; প্রসিদ্ধ বারানসি ২০ ফারসাখ।

সেখান থেকে দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ দিক ত্যাগ করে যদি আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হন তাহলে বারানসি থেকে ৩৫ ফারসাখ দূরে শরবারে পৌছাবেন ; পাটলিপুত্র ২০ ফারসাখ ; মুঙ্গের ১৫ ফারসাখ ; জনপ ৩০ ফারসাখ ; দুগুমপুর ৫০ ফারসাখ ; গঙ্গাসায়র (গঙ্গাসাগর) ৩০ ফারসাখ দূরে এবং গঙ্গা ওখানেই সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

কনৌজ থেকে নেপাল হয়ে ভোটেশ্বর

কনৌজ থেকে পূর্ব দিকে যাওয়ার পথে আপনি বাড়ি পৌছাবেন, যার দূরত্ব ১০ ফারসাখ ; দুমুম ৪৫ ফারসাখ ; শিলাহাল সাম্রাজ্য ১০ ফারসাখ ; বীহট নগর ১০ ফারসাখ। এর আগে দক্ষিণ দিকে তিলবে দেশ অবস্থিত, এখানকার অধিবাসীদের তারু বলা হয়, যাদের গায়ের রং কালো এবং নাক তুর্কিদের মতো চ্যাপ্টা। সেখান থেকে অগ্রসর হলে সামনে কামরূপ পর্বতমালা পড়বে– এই পর্বতমালা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

তিলবটের বাম দিকের প্রদেশটিই হলো নেপাল। ঐ দেশ ভ্রমণকারী এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছিল : 'সে তিলবটে অবস্থানকালে পূর্ব প্রান্ত ত্যাগ করে বাম দিকে যাত্রা করে। তারপর সেখান থেকে ২০ ফারসাখ দূরে এর পুরো রাজ্যটাই পাহাড়ি উপত্যকা। সে নেপাল থেকে ভোটেশ্বর পৌঁছেছিল ৩০ দিনে, যার দূরত্ব ছিল ৪০ ফারসাখ, প্রায় পুরো পথই ছিল পাহাড়ি-চড়াই, উতরাই খুব কম। সেখানে নদীও আছে, যার উপরে একটি সাঁকো রয়েছে, যার দুই দিকে বাঁশ আর দড়ি দিয়ে বাঁধা, যেটি পাহাড়ি পথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই প্রান্তেই আবার তাকে ভারী পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকেরা তাদের মাথায় ও পিঠে করে ভারী মালপত্র নিয়ে এই সাঁকো পারাপার করে। এর ১০০ গজ নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। তার পানি বরফের মতো সাদা। তার প্রবাহের গতি দেখে মনে হবে যে সে এই পাহাড়ি উপত্যকাকে চূর্ণ করে দেবে। সাঁকোর অপর পারে পৌঁছে সে সব ভার ছাগলের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়...।

ভোটেশ্বর থেকে তিব্বতের সীমা শুরু হয়েছে। সেখানে গেলে দেখা যাবে, সেখানকার লোকেদের ভাষা ও বেশভূষা শুধু নয় ; বরং তাদের স্বরূপও বদলে গেছে। এখান থেকে সর্বোচ্চ শিখরের দূরত্ব ২০ ফারসাখ। এই পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর ভারতের কোল ঘেঁষে এমনভাবে ঢেকে রয়েছে যে, সেখান থেকে শুধুমাত্র আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এই শিখরের নিচে ছোট ছোট পাহাড়, তিব্বত ও চীনের লাল রেখাটুকুমাত্র দেখা যায়। এখান থেকে উৎরাই পথে তিব্বত ও চীনের দূরত্ব এক ফারসাখের চেয়েও কম।

কনৌজ থেকে বনবাস পর্যন্ত

কনৌজ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর চলতে থাকলে আপনি জুভান্তি নামক প্রদেশে এসে পৌঁছাবেন যেটি ৩০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত। এই প্রদেশটির রাজধানী খাজুরাহো। এই নগর ও কনৌজের মধ্যে ভারতের দুটি অতি প্রসিদ্ধ দুর্গ রয়েছে যে দুটির নাম গোয়ালির ও কালিঞ্জর। দাহাল (...ফারসাখ) এমন একটি প্রদেশ যার রাজধানী তিরৌরি, এখন সেখানে গাঙ্গেয় নামক একটি রাজ্য রয়েছে। কন্নকারা প্রদেশ ২০ ফারসাখ, তারপর অপসুর ও বনবাস রয়েছে যে দুটি সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত।

কনৌজ থেকে বাজানা পর্যন্ত

কনৌজ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে আপনি আসি নামক স্থানে পৌঁছাবেন, যা কনৌজ থেকে ৮০ ফারসাখ ; সহন্য ১৭ ফারসাখ ; জান্দ্রা ১৮

ফারসাখ ; রাজৌরি ১৫ ফারসাখ ; গুজরাটের রাজধানী বাজানা ২০ ফারসাখ। এই নগরের লোকেদের নারায়ণ বলা হয়। এই নগরের পতনের পর এখানকার অধিবাসীরা জাদুরা নামক স্থানে চলে গিয়েছিল।

মহুরা থেকে ধার পর্যন্ত

কনৌজ ও মহুরার মধ্যে ততটাই দূরত্ব যতটা কনৌজ থেকে বাজানা অর্থাৎ ২৮ ফারসাখ। যদি কোনো ব্যক্তি মহুরা থেকে উজ্জৈন যায় তাহলে মাঝখানে যে গ্রামটি পড়বে এ দুয়ের মধ্যে তার দূরত্ব কেবল ৫ ফারসাখ। ৩৫ ফারসাখ যাত্রার পর সে এক বড় গ্রামে গিয়ে পৌছাবে যার নাম দুদ্‌হি ; ওখান থেকে বমহুর ১৭ ফারসাখ ; ভেলেঙ্গা ৫ ফারসাখ ; এটি হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই নগরের নামে সেখানে একটি মূর্তি রয়েছে, সেখানে তার পুজো হয়। ওখান থেকে অরদিন ৯ ফারসাখ। সেখানে যে মূর্তিটির পুজো করা হয় তা মহাকাল নামে পরিচিত। ওখান থেকে ধার ৭ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

বাজানা থেকে মন্দাগি পর্যন্ত

বাজানা থেকে দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে আপনি মেবার পৌছাবেন, বাজানা থেকে যার দূরত্ব ২৫ ফারসাখ। এর রাজধানীর নাম জহরুর। এখান থেকে মালব ও তার রাজধানী ধারের দূরত্ব ২০ ফারসাখ। উজ্জৈন ধারের পূর্বদিকে ৭ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

উজ্জৈন থেকে ভেলেঙ্গা যা মালবেই অবস্থিত, দূরত্ব ১৯ ফারসাখ।

ধার-এর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আপনি ভূমিহার পৌছাবেন যার দূরত্ব ধার থেকে ২০ ফারসাখ ; কান্ত ২০ ফারসাখ ; নর্মদা তীরে অবস্থিত নামওয়ার ১০ ফারসাখ, অলিসপুর ২০ ফারসাখ ; গোদাবরি নদীর তীরে অবস্থিত মন্দাগির ৬০ ফারসাখ।

ধার থেকে থানা পর্যন্ত

ধার থেকেই দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নামাইয়্যা উপত্যকা, ধার থেকে যার দূরত্ব ৭ ফারসাখ ; মারাঠা দেশ ১৮ ফারসাখ ও কোঙ্কণ প্রদেশ ও সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত তার রাজধানী থানা ২৮ ফারসাখ।

ভারতের জন্তু জানোয়ার সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী

ভারতে প্রচুর পরিমাণে গণ্ডার দেখা যায়, বিশেষ করে গাঙ্গেয় ভূমিতে। তার দেহ মহিষের মতো, তার চামড়া কালো ও মোটা আর তার গলার নিচে তা কম্বলের

মতো পাকানো। এই চতুষ্পদ প্রাণীটির প্রতিটি পায়ে তিনটি করে ছোট ছোট খুর রয়েছে, তবে, সামনের পা দুটোর খুর সামনের দিকে বেরুনো, আর ছোট কান দুটি ডানে-বামে বেরুনো। তার গলা লম্বা হয় না ; তার চোখ দুটি তার গালের অনেক নিচে অবস্থিত ; এমনটি আর কোনো পশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তার নাকের উপরিভাগে একটি শিং রয়েছে যা উপরের দিকে মুড়ানো। ব্রাহ্মণদের গণ্ডারের মাংস খাওয়ার বিশেষ অধিকার রয়েছে। আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি যে, একটি হাতি এক জওয়ান গণ্ডারের সামনে এসে পড়লে গণ্ডারটি তাকে আক্রমণ করে। গণ্ডার হাতির দু'পায়ের সামনের অংশে শিং বাগিয়ে তাকে চিরে ফেলে এবং গুঁতো মেরে মেরে তাকে মেরে ফেলে।

আমার ধারণা ছিল যে, গণ্ডার রাইনাসারাসই (বা কারকাদান) হবে, কিন্তু হাবসিদের দেশ ভ্রমণকারী এক ব্যক্তি, আমাকে বলেছিল যে, বার্ক–যাকে হাবসিরা ইম্পিলা বলে অভিহিত করে এবং তার শিং দিয়ে আমাদের দেশে অস্ত্রের বাঁট তৈরি করে, রাইনাসারাসের চেয়ে গণ্ডারের সঙ্গে তার চেহারার বেশি মিল দেখা যায়।

ভারতের নদনদীগুলো নীলনদের মতোই, তবে তার সংখ্যা অনেক বেশি। এই সমরূপতা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আল-জাহিজ, যেহেতু নদীসমূহের গতি ও তাদের সমুদ্রে গিয়ে মিশে যাওয়ার সম্পর্কে কিছু জানতেন না, সেহেতু তিনি এই কথাই ভেবেছিলেন যে, মুহরণ (সিন্ধু) নদী নীলনদেরই একটি শাখা। এছাড়াও ভারতের নদনদীগুলোতে অসংখ্য-অগণিত জন্তু বা কুমির প্রজাতির– যেমন, কুমির, অদ্ভুত রকমের সব মাছ ইত্যাদি দেখা যায় ; এদেরই মধ্যে এমন একটি জন্তু আছে, যার চামড়া হয় থলির মতো– যা জাহাজের সামনেও আসে, সাঁতার কাটে এবং খেলাও করে। একে তারা শশক বলে। আমার মনে হয়, শশক ঐ শ্রেণীরই একটি জন্তু। লোকেরা বলে যে, ওদের মাথার ওপরে একটি ছিদ্র আছে, তা দিয়ে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে বিষয়ান্তরে গিয়ে আলোচনা হবে।

বাজানা থেকে সোমনাথ পর্যন্ত

যদি আপনি বাজানা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে চলতে থাকেন তাহলে আনহিলওয়াড়ায় পৌঁছাবেন, বাজানা থেকে যার দূরত্ব ৬০ ফারসাখ ; আর সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত সোমনাথের দূরত্ব ৫০ ফারসাখ।

আনহিলওয়াড়া থেকে দক্ষিণাভিমুখে চলতে থাকলে লাড়দেশের দুই রাজধানী ভিরোজ ও রিহানজুড়ে পৌঁছে যাবেন, যার দূরত্ব আনহিলওয়াড়া থেকে ৪২ ফারসাখ। এ দুটিই থানার নিকট পূর্বদিকে সমুদ্রোপকূল অবস্থিত।

আনহিলওয়াড়া থেকে লোহারানি পর্যন্ত

বাজানা থেকে পশ্চিমাভিমুখে চলতে চলতে আপনি মুলতানে পৌছাবেন, বাজানা থেকে যার দূরত্ব ৫০ ফারসাখ ও ভাটি ওখান থেকে ১৫ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

ভাটি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে চলতে চলতে আপনি আরোড় পৌছাবেন, ভাটি থেকে যার দূরত্ব ১৫ ফারসাখ, এটি সিন্ধু নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি জনবসতি ; বহমানওয়া আল মনসুরা ২০ ফারসাখ ; সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত লোহারানি ৩০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

কনৌজ থেকে কাশ্মির

কনৌজ থেকে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলতে চলতে আপনি শীর্ষরোহ নামক স্থানে পৌছাবেন, যা কনৌজ থেকে ৫০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ; পিঞ্জোর পাহাড়ি ভূমিতে অবস্থিত আর তারই সম্মুখভাগে সমতল ভূমিতে অবস্থিত বানেশ্বর নগর, দহমালা যেটি জলন্ধরের রাজধানী এবং যেটি তালহাটির সমানবর্তী, তার দূরত্ব সেখান থেকে ১৮ ফারসাখ ; বল্লওয়ার ১০ ফারসাখ ; ওখান থেকে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হলে আপনি লাদ্দায় পৌছাবেন, যা ১৩ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ; তারপর রাজগিরের দুর্গ পড়বে যার দূরত্ব ৮ ফারসাখ আর ওখান থেকে চলতে চলতে আপনি কাশ্মির পৌছাবেন, যা ২৫ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

কনৌজ থেকে গজনা

কনৌজ থেকে পশ্চিম দিকে চলতে চলতে আপনি দিরামাউ নামক স্থানে পৌছাবেন, যা কনৌজ থেকে ১০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ; ওখান থেকে কুটি ১০ ফারসাখ ; মিরাত ১০ ফারসাখ এবং পানিপথ ১০ ফারসাখ। শেষের দুটি শহরের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে জৌন (যমুনা) নদী বয়ে গিয়েছে ; দবিতাল ১০ ফারসাখ ও সুন্নাম ১০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

ওখান থেকে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলতে চলতে আপনি আদিত্যাহোর-এ পৌছাবেন যা ১০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ; ভজ্জর ১০ ফারসাখ ; মান্দাহুকুর যা লৌহাউর-এর রাজধানী, সেটি ইরওয়া (ইরাবতী ?) নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত, ৮ ফারসাখ ; চন্দ্রহা নদী ১২ ফারসাখ ; বিয়ত্তার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ঝিলম নদী ৮ ফারসাখ ; সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত কান্দারের রাজধানী ২০ ফারসাখ ; পুরুষাবর ২০ ফারসাখ ; দুনপুর ১৫ ফারসাখ ; কাবুল ১২ ফারসাখ ও গজনা ১৭ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

কাশ্মির সম্পর্কিত টিপ্পনী

সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত পরিবেষ্টিত একটি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত সুন্দর রাজ্য কাশ্মির। এর দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে রয়েছে হিঁদুদের রাজ্য, পশ্চিম ও বুলরশাহ তথা শুগনানশাহ এবং কিছু সুদূরস্থিত অংশ বদখশাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই বিস্তৃত ভূখণ্ড বিভিন্ন রাজার অধীন। এই প্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশের কিছু অংশ তুর্কি ও তিব্বতের অধীন। ভোটেশ্বর এর শিখর থেকে তিব্বত হয়ে কাশ্মিরের দূরত্ব ৩০০ ফারসাখ।

কাশ্মিরের অধিবাসীরা সাধারণত পায়ে হেঁটে চলাচল করে। কেননা, তাদের সওয়ারীর জন্য না আছে জানোয়ার আর না আছে হাতি ; রাজার সামন্তরা পালকিতে চড়ে চলাচল করে, যাদের তারা 'কট্ট' বলে অভিহিত করে। কাহাররা তাদের কাঁধে করে নিয়ে হেঁটে চলে। তাদের প্রদেশ প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে চিহ্নিত থাকে ; তার কারণ তাদের নিজেদের রাজ্যের প্রবেশদ্বার এবং সে স্থান পর্যন্ত সড়কগুলোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে তাদের বড়ই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যে কারণে তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করাও বেশ কঠিন ব্যাপার। প্রাচীনকালে তারা দু-এক জন বিদেশি, বিশেষত, ইহুদিদের নিজেদের রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দিত ; কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থা যে, তারা কোনো হিঁদুকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হলে তাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে দেয় না, অন্যদের প্রবেশ করতে দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

... কাশ্মির নগর ৪ ফারসাখ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এ ঝিলম নদীর দুই প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত, যা পুল ও নৌকা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। ঝিলম নদী হরমকোট পর্বত থেকে উৎসারিত, গঙ্গাও একই স্থান থেকে উৎসারিত। এ এমনই একটি ঠাণ্ডা প্রদেশ, যা সর্বদাই বরফে ঢাকা থাকে, তা কখনোই বরফশূন্য হয় না ; বরফ না গলে যায়, আর না সেখান থেকে সরে যায়। ওরই পিছনে অবস্থিত মহাচীন...।

এ হলো উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত ভারতের শেষ সীমা।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় আফগানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বসবাস, আর তাদের বসতি সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা

ভারতের দক্ষিণ সীমানা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী রাজ্য মাকরানের রাজধানী তিজ থেকে শুরু হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আল-দাইবল ক্ষেত্রের ৪০ ফারসাখ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দূরের মধ্যবর্তী স্থলে তুরান উপসাগর অবস্থিত।

উপরোক্ত উপসাগরের পরে আসে ছোট মুনহি ও বড় মুনহি, তারপরে আসে বেভারিজ– যারা কচ্ছ ও সোমনাথের জলদস্যু। এদের নামে এগুলোর নামকরণ হয়েছে এ কারণে যে, তারা এখান থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে ডাকাতি করত। সমুদ্রোপকূলে এই স্থানগুলো রয়েছে তুয়ালেশ্বর, দাইবল থেকে যার দূরত্ব ৫০ ফারসাখ ; লোহারানি ১২ ফারসাখ ; বাগা ১২ ফারসাখ ; কচ্ছ যেখানে মুকুলের গাছ দেখা যায় ও বারোই ৬ ফারসাখ ; সোমনাথ ১৪ ফারসাখ ; কাম্বায়েত ৩০ ফারসাখ (?) ; সনদন ৫০ ফারসাখ ; সুবারা ৬ ফারসাখ ; থানা ৫ ফারসাখ।

এর পূর্বে সমুদ্রতট লাড়ন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে জিমুর নামক নগর অবস্থিত ; ওখান থেকে বল্লভ, কাঞ্জি ও ধারবাড় পড়ে। এর সম্মুখবর্তী স্থানে উপসাগর অবস্থিত, যেখানে রয়েছে সিংহদ্বীপ, সরণদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কা। উপসাগরের আশপাশেই অবস্থিত পাঞ্জায়াবার নগর। এই নগরটি যখন নষ্টভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন জৌর নামক রাজা সেটি পুনর্নির্মাণ না করে পশ্চিমোপকূলের দিকে একটি নতুন নগর বসিয়ে দেন, তিনি তার নামকরণ করেন পাদনার।

সমুদ্রতটের অন্য একটি স্থানের নাম উম্মলনাড়, তারপর রামশের (রামেশ্বর ?), যেটি সরণদ্বীপের সন্নিকটেই অবস্থিত ; এ দুয়ের মধ্যে সমুদ্রের দূরত্ব ১২ ফারসাখ। পাঞ্জায়াবার থেকে রামশেরের দূরত্ব ৪০ ফারসাখ এবং রামশের ও সেতুবন্ধের মধ্যেকার দূরত্ব ২ ফারসাখ। সেতুবন্ধের অর্থ সমুদ্রের উপর নির্মিত পুল বা সেতু। এ হলো দশরথ-পুত্র রামের খাল, তিনি যেটি এই মহাদ্বীপ থেকে লঙ্কার দুর্গ পর্যন্ত প্রসারিত করে নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্তমানে এখানে বিচ্ছিন্ন পর্বতমালা প্রসারিত রয়েছে, যার মাঝখান দিয়ে সমুদ্র প্রবাহিত। সেতুবন্ধের পূর্বদিকে ষোলো ফারসাখ দূরে অবস্থিত কিহকিন্দা (কিষ্কিন্ধা)– বানরদের পর্বত। প্রতিদিনই বানরদের রাজা তার রাজ্য থেকে সদলবলে এখানে এসে– বিশেষরূপে নির্মিত তাদের আসনগুলোতে উপবেশন করে। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাদের জন্য ভাত রান্না করে এবং তাদের পাত্রগুলোতে রেখে দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা তাদের নিজস্ব আবাসে ফিরে যায়, কিন্তু তাদের উপেক্ষা করা হলে মনে করে যে, ঐ রাজ্য নাশ হয়ে গেছে, কেননা, তারা শুধু সংখ্যায় বেশি নয় ; বরং তারা ভীষণভাবে জংলি এবং লড়াকু। লোকেদের মধ্যে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তারা মানবজাতিরই অংশ ছিল কিন্তু যেহেতু তারা রামকে সহায়তা করেছিল এবং তারা যখন রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল তখন তাদের বানর জাতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় ; তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, রামই এ গ্রামগুলোকে তাদের জায়গির স্বরূপ দিয়েছিলেন। কোনো মানুষ যদি তাদের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করে ও তাদের রামায়ণ শোনায় এবং রামের মন্ত্রাদি পাঠ করে তাহলে তা তারা খুবই শান্তিপূর্ণভাবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে আর যদি তাদের মধ্যেকার কোনো

মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে তাহলে তারা তাকে সঠিক পথটি দেখিয়ে দেয় এবং মাংস ও মদিরা সহকারে তাদের আতিথ্য করে। যাই হোক না কেন, লোকবিশ্বাস মতে, এটাই তাদের অবস্থা।

ভারতীয় ও চীনাদের মধ্যে অবস্থিত সামুদ্রিক দ্বীপসমূহ

মহাসাগরের দ্বীপসমূহ যেগুলো ভারতের চেয়ে চীনের অধিক নিকটবর্তী, যা জবজদ্বীপপুঞ্জ (জাভা ?) বলে পরিচিত, হিঁদুরা তাদের সুবর্ণ দ্বীপ বলে অভিহিত করে। এ মহাসাগরের পশ্চিম দ্বীপগুলো জঞ্জ (হাবসি)-দের, যেগুলো ওর মধ্যস্থলে অবস্থিত, আর রাম ও দিউ দ্বীপসমূহ (মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ) রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কুমারী দ্বীপপুঞ্জও অবস্থিত। দিউ দ্বীপসমূহের বিশেষত্ব এই যে, সেগুলো ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে ; প্রথমে তো সাগরের উপরিভাগে একটি কর্দমযুক্ত ভূখণ্ড জাগে তারপর তা আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে এবং সমস্ত দিকেই ছড়িয়ে পড়ে, অবশেষে সেখানকার মাটি সুদৃঢ় হয়ে যায়। অন্যান্য দ্বীপগুলো যদি তেমনভাবে শক্ত ও সুদৃঢ়ভাবে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে না পারে তাহলে সেগুলো সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সে সকল দ্বীপের অধিবাসীরা দ্বীপের এ অবস্থাটি বুঝতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ তারা অন্যান্য দ্বীপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ অপেক্ষাকৃত শক্ত ভূমিতে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। তারা তাদের জীবিকার উপকরণসহ, যেমন– নারিকেল, খেজুর, ধান ও অন্যান্য গৃহসামগ্রীসহ নতুন দ্বীপে পৌঁছে যায়। এ সকল দ্বীপ উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে– দিউ কুধ অর্থাৎ ঝিনুকের দ্বীপ। কেননা, সেখানকার নারিকেল বৃক্ষের শাখাসমূহ হতে তাদের একত্রিত করে এবং সমুদ্রে বুনে দেয় ; এবং দীবক্কর অর্থাৎ রশি বা দড়ির দ্বীপ– যা নারিকেলের ছোবড়া থেকে বানানো হয় এবং জাহাজের তক্তা বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে বৃষ্টি

গ্রীষ্মকালে ভারতে উষ্ণমণ্ডলীয় বায়ুর প্রভাবে বর্ষা হয়ে থাকে, তারা এই মৌসুমকে বর্ষাকাল বলে। যতই উত্তরের দিকে যাওয়া হবে, এই বর্ষার মাত্রাও তত বেশি এবং দীর্ঘস্থায়ী দেখা যাবে এবং পার্বত্যাঞ্চলে বর্ষা ঠিক ততটাই কম। মুলতানের লোকেরা আমাকে বলত এখানে তো বর্ষা হয়ই না, অবশ্য পর্বতমালার নিকট যে সকল প্রান্ত আছে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ভাটল এবং ইন্দ্রবেদিতে আষাঢ় মাস থেকে বর্ষা শুরু হয় এবং দীর্ঘ চার মাস স্থায়ী হয় এবং এমন বর্ষা হয় আর তা এতটা জমে যায় যে, বালতি ভরে ভরে তা ফেলে দিতে হয়। উত্তর দিকে

কাশ্মিরের পার্বত্যাঞ্চলের জুহদি উপত্যকা এলাকায় শ্রাবণ মাস থেকে শুরু করে দুনপুর ও বশারাবারের মধ্যবর্তী স্থানে দু'মাস যাবৎ মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এ উপত্যকার অন্যপ্রান্তে বর্ষার নামগন্ধ পর্যন্ত দেখা যায় না। কেননা, উত্তরে ভারী বর্ষার কারণে মেঘমালা খুব উপরে উপরে উঠে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে না। এই মেঘমালা যখন ঐ পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করে তখন তাতে বাধা পেতে পেতে এক সময় তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, ফলে, পাহাড়ের অপরপারে তা পৌঁছাতে পারে না এবং আঙুর ও জয়তুন ফল পড়ার মতো দু-এক ফোঁটা ছাড়া কোনো বৃষ্টিপাতই সেখানে হতে পারে না, এজন্য কাশ্মিরে বর্ষাকালই নেই এবং মাঘ মাস থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী আড়াই মাস পর্যন্ত সেখানে শুধু বরফই পড়ে এবং চৈত্র মাসের পরে সেখানে বরফ গলতে থাকে। এবং সামান্য যা বর্ষা হয় আর তা মাটিতেই মিশে যায়। এ রকম প্রাকৃতিক বিশেষত্ব ভারতের যে কোনো প্রান্তেই লক্ষ করা যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়
গ্রহসমূহের নাম, রাশি, চাঁদ ও নক্ষত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি

আমরা এ পুস্তকের প্রারম্ভেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, হিংদুদের সংজ্ঞা সম্পর্কিত বিষয়াদির ভাষা খুবই সমৃদ্ধ, তা সে মূলগতভাবে সংজ্ঞাই হোক আর তার ব্যুৎপত্তিই হোক। এ কারণে কোনো বিষয়ের একই বস্তুকে তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে। এ সম্পর্কিত গবেষণা প্রসঙ্গে আমি তাদের কাছ থেকে জেনেছি যে, সূর্যের হাজারটি নাম রয়েছে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি গ্রহের হাজার নাম যদি নাও থাকে তবে প্রায় ততটা নামই আছে, কেননা (পদ্যাত্মক রচনার জন্য) তা ছাড়া তাদের কাজই চলে না।

সপ্তাহের দিনগুলোর নাম

তাদের ওখানকার সপ্তাহ ও দিনগুলোর নামও গ্রহসমূহের সবচেয়ে বিখ্যাত নামগুলোর সঙ্গেই সম্পর্কিত করে রাখা হয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে 'বার' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা গ্রহগুলোর নামের সঙ্গে রাখা হয়, ঠিক ঐ রকমই যেমন ফারসিতে 'শম্বা' শব্দটি সপ্তাহের প্রতি দিনের সংখ্যার (দোশোম্বা, সেশোম্বা ইত্যাদি) পরে জুড়ে দেওয়া হয়। যথা–

আদিত্যবার	বৃহস্পতিবার
সোমবার	শুক্রবার
মঙ্গলবার	শনিচরবার
বুধবার	

আর তারা এরকমই আদিত্যবার থেকে শুরু করে সোমবার পর্যন্ত গণনা করে।

হিংদুদের মধ্যে এই রেওয়াজ আছে যে, তারা গ্রহের গণনা সপ্তাহের দিনের ক্রমানুসারে করেন। আর তারা তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি ও

অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও এই ধারাক্রমই প্রয়োগের উপরেই জোর দিয়ে থাকেন, তা অন্যান্য ক্রম যতই সঠিক হোক না কেন, তারা তা স্বীকার করেন।

গ্রহসমূহের ক্রম ও তাদের গণনা-পদ্ধতি

ইউনানিরা গ্রহসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অঙ্কের মাধ্যমে গ্রহণ করেন যাতে বেধযন্ত্রের উপর তাদের সীমা এভাবে নির্ধারণ করা যায় যা তাঁরা সহজে বুঝতে পারেন। তারা এ বিষয়ে এমন সব প্রতীক ব্যবহার করেন, যা বর্ণমালার কোনো অক্ষর নয়। হিন্দুরাও এরকমই সংক্ষেপণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন ; পার্থক্য হলো যে, তাদের অঙ্ক এই প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা কোনো প্রতীক নয় ; বরং তা গ্রহসমূহের নামের আদ্যক্ষর হয়ে থাকে। যেমন– অ = আদিত্য ; চ = চন্দ্র ; ব = বুধ।

নিচে প্রদত্ত সারণিতে সাতটি গ্রহের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নকশাগুলো প্রদত্ত হয়েছে :

গ্রহ	ভারতীয় ভাষায় সেগুলোর নাম
সূর্য	আদিত্য, সূর্য, ভানু, অর্ক, দিবাকর, রবি, বিবত (?), হেলি
চাঁদ	সোম, চন্দ্র, ইন্দু, হিমগু, শীতরশ্মি, হিমরশ্মি, শীতাংশু, শীতদীধিতি, হিমময় মুখ।
মঙ্গল	মঙ্গল, ভৌম্য, কুজ, আর, বক্র, অবনেয়, মাহেয়, ক্রুক্ষি (?), রক্ত।
বুধ	বুধ, সৌম্য, চন্দ্র, জ্ঞ, বোধন, বিত্ত (?), হেম্ন।
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, গুরু, জীব, দেবেজ্য, দেবপুরোহিত, দেবমন্ত্রিন, আঙ্গিরস, দেবপিতা।
শুক্র	শুক্র, ভৃগু, সীত, ভার্গব, অস্বাতি (?), দানবগুরু, ভৃগুপুত্র, অস্ফুজিত (?)।
শনি	শনিশ্চর, মন্দ, অসিত, কোন, আদিত্যপুত্র, মোর, আর্কি, সূর্যপত্র।

সূর্যের নামসমূহের অনেকটাই, যেমনটি উপরের সারণিতে প্রদত্ত হয়েছে, এতগুলো নামের কারণেই ধর্মবিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে, সূর্যের সংখ্যা এক নয়, একাধিক। এজন্য তারা মনে করে সূর্য বারোটি এবং সেগুলো প্রতি মাসে মাসে উদিত হয়।

চাঁদেরও, যা সূর্যেরই সাথি, তারও অনেকগুলো নাম আছে– যেমন সোম, কেননা, তা শুভ এবং সমস্ত বস্তুর জনাই কল্যাণকর বলে তাকে বলা হয় সোমগ্রহ ; অবশ্য যা কিছু অশুভ এবং অমঙ্গলজনক তাকে পাপগ্রহ বলে। এছাড়া নিঃশেষ অর্থাৎ রাত্রির অধিপতি, নক্ষত্রনাথ অর্থাৎ নক্ষত্রের প্রভু, দ্বিজেন্দ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের

প্রভু, শীতাংশু অর্থাৎ শীত কিরণবালী, কেননা, চাঁদের জগৎ জলীয় যা পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। যখন সূর্যকিরণ চাঁদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তার কিরণ চাঁদের মতো শীতল হয়ে যায়, আর যখন তা পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন অন্ধকার বিদূরিত করে সেখানে শীতল আলোকমালা ছড়িয়ে দেয়, রাতকে শীতল করে দেয় আর সূর্যের দ্বারা উৎপন্ন যে কোনো ধরনের হানিকারক দহনকে তা নিভিয়ে দেয়। এরকমই তারা তাকে চন্দ্রমা (চাঁদ) বলে, যার অর্থ নারায়ণের বাম আঁখি, কেননা, সূর্য তার ডান আঁখি (চোখ)।

মাস	নক্ষত্র	মাস	নক্ষত্র
কার্তিক	৩. কৃত্তিকা	বৈশাখ	১৬. বিশাখা
	৪. রোহিণী		১৭. অনুরাধা
মার্গশীর্ষ	৫. মৃগশীর্ষ	জ্যেষ্ঠ	১৮. জ্যেষ্ঠ
	৬. আর্দ্র		১৯. মূল
পৌষ	৭. পুনর্বসু	আষাঢ়	২০. পূর্ব-আষাঢ়
মাঘ	৮. পুষ্প		২১. উত্তর-আষাঢ়
	৯. অশ্লেষ	শ্রাবণ	২২. শ্রাবণ
ফাল্গুন	১০. মাঘ		২৩. ধনিষ্ঠা
	১১. পূর্বফাল্গুনী	ভাদ্রপদ	২৪. শতভিষজ
চৈত্র	১২. উত্তর-ফাল্গুনী		২৫. পূর্ব-ভাদ্রপদ
	১৩. হস্ত	অনুযুগ	২৬. উত্তর-ভাদ্রপদ
	১৪. চিত্র		২৭. রেবতী
	১৫. স্বাতি		
			১. অশ্বিনী
			২. ভরণী

রাশিসমূহের নাম

রাশিসমূহের নাম ঐ সমস্ত প্রতীকের অনুরূপ হয়ে থাকে, যা তারা বোঝায়, তা যেমন হিঁদুদের মধ্যে আছে, তেমন অন্য জাতির মধ্যেও আছে, তৃতীয় রাশিকে মিথুন বলে যার অর্থ পুত্র ও পুত্রীর যমজ ; বাস্তবিকই তা যুগ্ম বা যমজেরই সমান, যা এই রাশির একটি প্রসিদ্ধ নাম।

[এ সমস্ত রাশি সম্পর্কে বরাহমিহিরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এ সংকেতও দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণ নামগুলো ছাড়া বরাহমিহির রাশিগুলোর 'এমন কিছু ভারতীয় নামেরও উল্লেখ করেছে যা সাধারণত বহুল পরিচিত নয়।' এ সম্পর্কিত সারণি দ্র. অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।]

বিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ড

ব্রহ্মার অণ্ড, পানি থেকে যার উদ্ভব

ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ ব্রহ্মার অণ্ড আর বাস্তবিকই তা সমস্ত আকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, কেননা, এ গোলাকার বলে তা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর সমস্তটাই জগৎ সংসারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, কেননা, এ উর্ধ্ব ও অধঃ দুভাগে বিভক্ত। তারা যখন সমস্ত লোককে (জগৎ) গণনা করে তখন তাকে সম্মিলিতভাবে ব্রহ্মাণ্ড বলে। কিন্তু হিঁদুরা জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রে দীক্ষা নেয়নি, আর তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো ধারণাই সঠিক নয়। এর প্রধান কারণ হলো, তাদের বিশ্বাসানুযায়ী এ পৃথিবী স্থির আর বিশেষরূপে তারা যখন অলৌকিক আনন্দের কথা সাংসারিক সুখের আদলে বর্ণনা করে তখন তারা এই পৃথিবীকে বিভিন্ন শ্রেণীর ভগবান, দেবতা ইত্যাদির আদি-নিবাসস্থল বলে অভিহিত করে, কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, এসব ভগবান ও দেবতারা উর্ধ্বলোক, অধোলোকের দিকে অবতরণ করে।

তারা তাদের এসব পরম্পরাকে যে রহস্যময় ভঙ্গিতে করেছে, সে অনুসারে যখন কিছুই ছিল না, তখন পানি ছিল আর সমস্ত জগৎ সংসারে তা প্রবাহিত ছিল। যেমন আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, তাদের এই সিদ্ধান্ত সেই সময়ের জন্যই হবে যা আত্মার প্রারম্ভিক অবস্থায় ছিল আর যখন তার সৃষ্টি ও সুগঠিত হতে শুরু করেছিল। এছাড়া তারা একথাও বলে থাকে যে, পানি প্রবহমান ছিল এবং তা থেকে ফেনা উৎসারিত হচ্ছিল। তারপর পানি থেকে এমন কোনো বস্তু বেরিয়ে এসেছিল যা দিয়ে স্রষ্টা ব্রহ্মার অণ্ড তৈরি করেছিলেন। কিছু লোক তো বলে অণ্ড ভেঙে গিয়েছিল ; আর তা থেকেই ব্রহ্মার প্রকাশ হয়েছিল, তার অর্ধাংশ দিয়ে আকাশ সৃষ্ট হয়েছে আর অপরাংশ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে ; আর এ দুভাগে অবশিষ্ট ভাঙা অংশ দিয়ে বর্ষা সৃষ্ট হয়েছে। যদি তারা বর্ষা না বলে পর্বত সৃষ্ট হয়েছে বলত, তাহলে তা অনেকটা গ্রহণযোগ্য হতো। আরও কিছু লোকের মত হলো যে, ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন, 'আমি এক অণ্ডাণু সৃষ্টি করছি, যা তোমাদের

জন্য আবাসস্থল হবে।' তিনি তা ফেনা ও পানি থেকে সৃষ্টি করলেন কিন্তু পানি যখন নিচে নেমে গেল এবং তা শুকিয়ে গেল তখন অণ্ড দুভাগ হয়ে গেল...।

জল, সৃষ্টির আদি তত্ত্ব ; ব্রহ্মার অণ্ডাণুর দুভাগে বিভক্তি

হিঁদুদের সৃষ্টিসম্পর্কিত সমস্ত ধ্যান-ধারণার মূলেই হয়েছে জল-তত্ত্ব। তারা মনে করে, সৃষ্টির পূর্বে শুধু জলই ছিল আর তাই-ই সমস্ত সৃষ্টির আধার ; আর জলই প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর সংযোগ, সমস্ত বস্তুর বিকাশ এবং প্রত্যেক জীবধারীর বেঁচে থাকার কারণ। এরকমই সৃষ্টিকর্তা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন জলই তার সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

অণ্ডাণুর দুভাগে বিভক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত একথাই সিদ্ধ করে যে, তার জন্মদাতা, বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ অজানা ছিল, যা সে জানতই না যে, আকাশ পৃথিবীকে এভাবে তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট করেছিল যেমন ব্রহ্মার অণ্ডাণু তার কুসুমকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তারা তো কেবল এ কল্পনাই করেছে যে, পৃথিবী নিচে অবস্থিত আর আকাশ পৃথিবীর ছয় দিক থেকে কেবল এক অর্থাৎ তার উপরে অবস্থিত। যদি তারা সত্য সম্পর্কে অবগত থাকত তাহলে তো অণ্ডাণু-ভাঙার তত্ত্বের কোনো প্রয়োজনই পড়ত না। বাস্তবিক পক্ষে তারা তাদের এই তত্ত্বের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করতে চাইত যে, অণ্ডাণুর অর্ধাংশ পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত রয়েছে আর অর্ধাংশ গম্বুজের মতো তার উপরে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে আর এতে ভূমণ্ডলের গোলাকার হওয়ার বিবেচনায় তারা টলেমি-র সমকক্ষ হতে চায়, কিন্তু এ প্রচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ।

[বিভিন্ন ভারতীয় লেখক– ব্রহ্মগুপ্ত, পুলিশ, বলভদ্র ও আর্যভট্টের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং তা আলোচনা করা হয়েছে। দ্র. অধ্যায়– ৫৯, ৬০, ৬১।]

একবিংশ অধ্যায়

হিঁদুদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণানুসারে আকাশ ও পৃথিবীর বর্ণনা যার উপরে তাদের পৌরাণিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে

সপ্তলোক

যাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি তাদের মতে লোকের (জগৎ) সংখ্যা সাত এবং তাকে পরস্পরের উপরে স্তবকের ন্যায় স্থাপন করা হয়েছে। এরপরেও তারা উপস্থিত লোককে সাত ভাগে ভাগ করেছে, আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে যেখানে 'ইকলিমোঁ'তে এবং ইরানিদের বিভাজন থেকে যা ভিন্ন এবং যাকে তারা 'কিশোয়ার'-এ বিভক্ত করেছে। আরও অগ্রসর হয়ে আমরা তাদের এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেব, যা তাদের ধর্মীয় তত্ত্বসমূহের প্রথম দিককার প্রবক্তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়ে সম্যক সমীক্ষা প্রস্তুত করা যেতে পারে। যদি কোনো বিষয় আমাদের কাছে বিচিত্র বলে প্রতীত হয় অথবা এমন কোনো বিষয় যা আমাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়– তা এ দুয়ের কোনোটাই ঠিক হোক বা না হোক– তা আমরা পাঠকের সমীপে সরাসরি তুলে ধরব। হিঁদুদের নিন্দা করা বা তাদের আশ্রয় করা কোনোটাই আমার উদ্দেশ্য নয় ; বরং আমার অভীষ্ট হলো ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা।

লোক সম্পর্কিত আনুক্রমিক মতভেদ যা ভাষার শব্দাড়ম্বরের পরিণামকেই তুলে ধরে

উপস্থিত লোক (জগৎ)-এর সংখ্যা নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো মতভেদই নেই ; বরং তাদের মতভেদ ঐ সমস্ত লোক-এর নামের তালিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমার মনে হয় এ পার্থক্যের মূল কারণ তাদের ভাষার শব্দাড়ম্বর, কেননা, তাদের ভাষায় এক বস্তুকে একাধিক নামে ডাকা হয়। উদাহরণত, সূর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে তারা তাকে হাজারো নামে স্মরণ করে, ঠিক ঐ রকমই যেমনটি আরবদেশে 'সিংহ'-এর হাজারটি নাম রয়েছে। এর মধ্যেকার কিছু নাম

তো মৌলিক আর অন্যগুলো সিংহের জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অথবা তাদের ব্যবহার ও ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হিঁদুরাও তাদের সমমতাবলম্বীরা তাদের এ শব্দাড়ম্বর নিয়ে খুব আস্ফালন করে থাকে যদিও এটা তাদের ভাষায় সবচেয়ে বড় দোষ। এর কারণ এটাই যে, ভাষার কাজ হলো সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু এবং সে সবের কার্যাবলির এমন নামকরণ করা যেন সে সম্পর্কে একটি সাধারণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো শব্দ শোনামাত্রই তার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারে। সে জন্য যদি কোনো একটি শব্দের একাধিক অর্থ বেরিয়ে আসে তাহলে তা ঐ ভাষার একটা দোষ বলেই প্রতীত হয়, কেননা, তার অর্থ বোঝার জন্য সেখানে তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সেজন্য, এমতাবস্থায় উচিত হলো ঐ শব্দকে ত্যাগ করা এবং তার স্থানে ঐরকমই একটি সর্বজনবোধ্য শব্দের প্রয়োগ করা, যাতে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায় অথবা ঐ স্থানে এমন বিশেষণ প্রয়োগ করা যাতে অভীষ্ট অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি হয়। যদি একই বস্তুর একাধিক নামে পরচিতি গড়ে ওঠে এবং প্রকাশ্যে এজন্য এটা করা যায় না যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি অথবা শ্রেণীর লোকেরা তাদের জন্য বিশেষ কিছু শব্দের প্রয়োগ করে আর যদি সে বস্তুর জন্য একটি শব্দেরই প্রয়োগ পর্যাপ্ত হয় তাহলে তাদের ছাড়া অন্য সমস্ত নামকে মূর্খতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে বিষয়টিকে জটিল করে তোলা। যাই হোক, এ ধরনের শব্দাড়ম্বর ঐ সমস্ত লোকেদের জন্য খুবই জটিল প্রতীত হয় যারা ঐ ভাষা পরিপূর্ণরূপে শিখে নিতে চায়, কেননা, এ ধরনের ভাষা সর্বদাই নিরর্থক আর তা শিখতে যাওয়া সময় নষ্ট করারই নামান্তর।

সর্বদাই আমার মনে হয়েছে যে, গ্রন্থকার এবং তাদের ঐতিহ্যের বাহকরা লোক সম্পর্কিত আনুক্রমিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে নিশ্চিতরূপে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের নাম গণনার ক্ষেত্রে একটি আত্মতুষ্টির ভাব পোষণ করেছেন অথবা গ্রন্থাবলির লিপিকাররা প্রতিলিপি তৈরি করার সময় যদৃচ্ছভাবে পাঠ-পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কারণ এটাই যে, যারা পাঠের অনুবাদ ও তার ব্যাখ্যা আমাকে শুনিয়েছেন, তারা ছিলেন ভাষাভিজ্ঞ এবং তাঁরা এমন ব্যক্তি ছিলেন না যে, কোনো প্রকারে আমাকে ধোঁকা দিতে পারতেন।

আদিত্য পুরাণানুসারে বিভিন্ন লোক ও তার স্বরূপ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সারণিতে বিভিন্ন লোকের নাম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমনটি আমি জেনেছি এবং বুঝেছি ঠিক সেভাবেই তা দেওয়া হলো। আমাদের প্রধান অবলম্বন হলো সেই সূচি যা আদিত্য পুরাণ হতে গৃহীত হয়েছে, কেননা, তাতে একটি নিশ্চিত মতের অনুসরণ করা হয়েছে যা প্রত্যেক পৃথক পৃথ্বী ও আকাশকে সূর্যের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে জুড়ে দিয়েছে।

লোকের সংখ্যা	আদিত্য পুরাণ		বিষ্ণু পুরাণ	বায়ু পুরাণ		দেশি নাম
	সূর্যের কোন অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত			তাদের নাম	তাদের উপাধি	
১.	নাভি	তল	অতল	আভাস্তল	কৃষ্ণভূমি, অন্ধকারময় পৃথ্বী	অংশু (?)
২.	উরু	সুতল	বিতল	ইলা (?)	শুক্লভূমি, উজ্জ্বল পৃথ্বী,	অম্বলতল
৩.	জানু	পাতাল	বিতল	নিতল	রুমভূমি, লাল পৃথ্বী	শার্করা (?) (সক্কর)
৪.	জানুর নিচে	আসাল (?)	গভস্তিমত	গভস্তল	পীতভূমি, বীশী পৃথ্বী	গভস্তিমত
৫.	পিণ্ডিকা	বিশাল	মহার্ঘ্য	মহাতল	পাষাণভূমি, পাথর পৃথ্বী	মহাতল
৬.	ঘুটিকা	মৃত্তাল	সুতল	সুতল	শিলাতল, ইটের পৃথ্বী	সুতল
৭.	পাদ	রসাতল	জাগর (?)	পাতাল	সুবর্ণ-বর্ণ, সোনারঙের পৃথ্বী	রসাতল

আকাশমণ্ডলীকে সূর্যের কপাল থেকে গর্ভাশয় পর্যন্ত অবয়বের সঙ্গে মেলানো হয়েছে এবং পৃথ্বীসমূহকে (গ্রহসমূহ) তার নাভি থেকে পা পর্যন্ত অবয়বের সঙ্গে মেলানো হয়েছে। এই তুলনামূলক পদ্ধতিতে এ সবের ক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং এতে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

...পৃথ্বীসমূহের পরে আসে আকাশ যার সাতটি স্তর বা স্তবক আছে, যেগুলো একে অন্যের উপরে অবস্থিত, যার অর্থ 'একত্রিত হওয়ার স্থান'। ...পৃথ্বীসমূহের নামের ন্যায় বিভিন্ন লোকের নামের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। কেবল তাদের ক্রমসম্পর্কে সামান্য মতভেদ আছে। আমরা বিভিন্ন লোকের নাম একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছি, যার প্রথম তালিকাটির সঙ্গে কিছুটা মিল আছে (ত্রি-ষষ্ঠী অধ্যায়)।

আকাশমণ্ডলীর সংখ্যা	আদিত্য পুরাণানুসারে সূর্যের বিভিন্ন অঙ্গ- যার সঙ্গে সম্পর্কিত	আদিত্য, বায়ু এবং পুরাণানুসারে তাদের নাম
১.	আমাশয়	ভূলোক
২.	বক্ষ	ভুবর্লোক
৩.	মুখ	স্বর্লোক
৪.	ভ্রূ	মহালোক
৫.	ভাল	জনলোক
৬.	ভালের উপরে	তপোলোক
৭.	কপাল	সত্যলোক

...এ তো গেল সাতটি আকাশ ও সাতটি পৃথিবীর কথা। এবার আমরা সবার উপরের পৃথ্বী ও তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করব।

দ্বীপ ও সমুদ্রগুলোর ব্যবস্থা

ভারতে টাপু শব্দের অর্থ স্বরূপ দ্বীপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের শব্দাবলির দৃষ্টান্ত, যেমন- সিনথল দ্বীপ (সিংহল দ্বীপ), যাকে আমরা সরণদ্বীপ বলে অভিহিত করি আর 'দীপজাত' (মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ)। দীবজাত (দ্বীপপুঞ্জ) অনেকগুলো দ্বীপের সমাহার (সমূহ) যা জর্জর হতে হতে পানিতে বিলীন হয়ে যায় এবং তার তল লীন হয়ে যায় অবশেষে তা পানির নিচে হারিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে এরকমই বালির পাহাড়ের সমুদ্রের উপরে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে নতুন দ্বীপ, বাড়তে বাড়তে তা এক সময় অনেক বড় এলাকা জুড়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া দ্বীপগুলোর বাসিন্দারা পরিবার-পরিজন নিয়ে পূর্বেই

অন্যান্য দ্বীপে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে, সেখানেই শুরু হয় তাদের নতুন নতুন জীবনযাত্রা।

হিন্দুদের পৌরাণিক ধ্যান-ধারণানুযায়ী, আমরা যে ধরণীতে বাস করি তা গোলাকার এবং তা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্থলবেষ্টিত এ সমুদ্রকে আংটির মতো গোলাকার মনে হয়। এই শুষ্ক গোলাকার ভূখণ্ডগুলোকে তারা দ্বীপ বলে অভিহিত করে, তার সংখ্যা সাত, আর সমুদ্রের সংখ্যাও সাত। দ্বীপ ও সমুদ্রের আকার উত্তরোত্তর এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে, এর প্রত্যেকটি দ্বীপ পূর্ববর্তী দ্বীপের দ্বিগুণ ও প্রত্যেকটি সমুদ্র পূর্ববর্তী সমুদ্রের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তারা এ দুই শক্তিকে বৃদ্ধি বলে অভিহিত করে। যদি মধ্যভাগের পৃথ্বীর মান এক ধরা হয় তাহলে তা আংটির আকারে পরিলক্ষিত সাত পৃথ্বী পরিমাণ হবে ১২৭। যদি পৃথিবীর মধ্যভাগকে পরিবেষ্টিত সমুদ্রের মান এক ধরা হয় তাহলে আংটির আকারে পরিলক্ষিত সাত সমুদ্রের পরিমাণ হবে ১২৭, সমুদ্র ও পৃথিবীর সর্বমোট পরিমাণ হবে ২৫৪।

[দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্রসমূহের পরিমাণ সম্পর্কে পতঞ্জলি ও বায়ু পুরাণের টীকাকারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে 'পৃথিবীর দৈর্ঘ্য' নির্ধারণ সম্পর্কে পতঞ্জলির উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। দ্র. অধ্যায় ৬৪ ও ৬৫।]

দ্বাবিংশ অধ্যায়
ধ্রুবতারা সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা

দক্ষিণ ধ্রুবের উদ্ভব ও সোমদত্তের কাহিনি

পৃথিবীর মেরুকে হিন্দুদের ভাষায় ধ্রুব ও অক্ষ অথবা বৃত্তকে শলাকা বলা হয়। হিন্দু, যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা সাধারণত একই ধ্রুবের কথা বলে থাকে, যার কারণ হলো এই যে, তারা বিশ্বাস করে আকাশের যা আকাশের গম্বুজে অবস্থিত, যেমনটি আমরা পূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। বায়ু পুরাণ অনুসারে আকাশ ধ্রুবতারাকে ঘিরে কুমোরের চাকার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। এ পরিক্রমা ৩০ মুহূর্ত অর্থাৎ এক দিনে পুরো হয়।

[দক্ষিণী ধ্রুবদের সম্পর্কে আল বিরুনী রাজা সোমদত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কাহিনির উল্লেখ করেছেন, যিনি তার এক মহৎকর্মের প্রতিদানে স্বর্গ লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন। তার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঋষি বশিষ্ঠর কাছে প্রার্থনা জানান, কিন্তু তিনি বলেন, এমনটি অসম্ভব। শুধু তাই নয়। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে বশিষ্ঠের পুত্ররা উপহাসও করে। পরে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে যান। বিশ্বামিত্র তাঁর প্রতি খুবই প্রসন্ন হন এবং তিনি রাজার জন্য এক 'নতুন স্বর্গ' নির্মাণ করতে শুরু করেন। ঋষি 'ধ্রুব ও সপ্তর্ষির দক্ষিণ'-এ নির্মাণ শুরু করেন কিন্তু ইন্দ্র এমনটি না করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশ্বামিত্র এ শর্তে তা না করার জন্য তার সঙ্গে একমত হলেন যে, রাজাকে সশরীরেই স্বর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে আর এমনটিই হলো। পরিণামত, ঋষি এক অন্য লোক (জগৎ) নির্মাণ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন কিন্তু ততক্ষণে তার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। দ্র. অধ্যায়– ৬৬।]

একথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের দেশে (আরবে) উত্তরী ধ্রুবকে বানাতুন্নাশা (সপ্তর্ষি) বলা হয় আর দক্ষিণী ধ্রুবকে বলা হয় 'সুহাইল' (একতারা)। কিন্তু আমাদের কিছু লোক (মুসলমান) যারা অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উর্ধ্বে নয়, তারা বলে যে, আকাশের দক্ষিণ দিকেও ঐ প্রকারেরই সপ্তর্ষি রয়েছে, যে উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুবকে পরিক্রমা করে।

এমন কথা যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলত যারা দূর-দূরান্তের সমুদ্র-যাত্রায় রওনা দেয় তাহলে তা না অসম্ভব মনে হতো আর না বিচিত্র মনে হতো। এ কথা নিশ্চিত যে, দক্ষিণাকাশে যে নক্ষত্র দেখা যায়, তার অক্ষাংশ সম্পর্কে আমরা জানি না।

ব্রহ্মা যখন মানুষ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন তখন তিনি নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করে নেন, যার ডান-অংশে থাকে বিরাজ এবং বাম-অংশে থাকে মনু। মনু থেকেই মন্বন্তর কথাটি এসেছে, যা মহাকালের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ধ্রুবকথা

মনুর দুই পুত্র ছিলেন, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ অর্থাৎ ধনুকাকার ঠ্যাং-ওয়ালা রাজা। তারই ধ্রুব নামক একটি পুত্র ছিল, যাকে তার পিতার এক পত্নী অপমানিত করেছিল। তারই ফলস্বরূপ তাকে বর দেওয়া হয়েছিল যে, সে সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারে। স্বয়ম্ভুর মন্বন্তরে বা প্রথম মন্বন্তর আবির্ভূত হয়েছিলেন আর তিনি সেখানেই চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গেছেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতাদের বিশ্বাস অনুসারে মেরু পর্বতের বর্ণনা

পৃথ্বী ও মেরু পর্বত সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত

আমরা এ পর্বতের বর্ণনা এ অধ্যায়ের শুরুতেই করছি, কেননা, এ দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্রগুলোর কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে জম্বুদ্বীপেরও কেন্দ্র। ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, পৃথ্বী ও মেরু পর্বত সম্পর্কে লোকেদের মধ্যে বিশেষ করে পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থসমূহের পাঠকদের মধ্যে অনেক প্রকারের মত প্রচলিত আছে। কিছু লোকের মতে এ পর্বত পৃথ্বী ও ধরাতল থেকে উঠে অনেক উপরে চলে গিয়েছে। এ ধ্রুব-এর নিচে অবস্থিত এবং নক্ষত্রের অধোভাগের আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে আর এ কারণে উদয় ও অস্ত দুয়ের অবস্থান এই মেরুর উপরেই। এর মেরু নামকরণ হয়েছে এ কারণেই যে, এর এ ক্ষমতাটা রয়েছে আর যেহেতু তা নিজের মস্তকের প্রভাবের উপরেই আশ্রিত এ জন্য চন্দ্র ও সূর্য দুই-ই পরিদৃষ্ট হয়। মেরুবাসী দেবতাদের দিন ছয় মাসের এবং রাতও ছয় মাসের।'

[এ বিষয়ে বলভদ্রের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলভদ্র আর্যভট্টের মতামতের যে সমস্ত উদাহরণ পেশ করেছেন তারও আলোচনা করা হয়েছে। (দ্র. অধ্যায়–৬৮, ৬৯) আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে আল বিরুনী বলেছেন আর্যভট্ট নামে দুজন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল, 'জ্যেষ্ঠ আর্যভট্ট' ও 'কুসুমপুরার আর্যভট্ট' নামে তাদের পরিচিতি ছিল। আল বিরুনী লিখেছেন, 'কুসুমপুরার আর্যভট্টের গ্রন্থে আমি পড়েছি যে, মেরু পর্বত হিমবন্তের শীত প্রদেশে অবস্থিত যার উচ্চতা এক যোজনের বেশি নয়। কিন্তু অনুবাদে একে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথা বোঝা যায় যে, তা হিমবন্ত থেকে এক যোজনের অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট নয়'।]

[এই লেখক ও জ্যেষ্ঠ আর্যভট্ট একই ব্যক্তি নন। কিন্তু অবশ্যই তাঁর অনুসারী কেননা, ইনি তাঁর উদাহরণ পেশ করেছেন এবং তাঁরই অনুসরণ করেছেন। আমি

বলতে পারি যে, এই দুই নামের মধ্যে থেকে বলভদ্র কাকে বোঝাতে চেয়েছেন। দ্র. সপ্তত্রিংশতি অধ্যায়।]

সাধারণভাবে এ পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। এ পর্বতের সম্পর্কে তাদের মধ্যে অনেক গালগপ্পো প্রচলিত আছে। কেউ বলেন এর উচ্চতা এক যোজন, কেউ বলেন তার চেয়ে কিছু বেশি ; কেউ এর আকার চতুর্ভুজীয় মনে করেন আবার কেউ মনে করেন অষ্টভুজীয়। এবার আমি আমার পাঠকের কাছে বর্ণনা করব যে, এ ব্যাপারে ঋষিদের ধারণা কী...।

[কিছু পুরাণ এবং পতঞ্জলির ভাষ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, অধ্যায়– ৬৯।]

বৌদ্ধমত

মেরু সম্পর্কে হিঁদুদের ঐতিহ্যগত ধারণা সম্পর্কে আমি এতটুকুই জানতে পেরেছি। আর যেহেতু আমি বৌদ্ধদের কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাইনি আর এমন কোনো বৌদ্ধকেও আমি চিনতাম না যার কাছ থেকে এ বিষয়ে আমি কিছু জানতে পারতাম, এ জন্য আমি যা-কিছু বলছি তা আল-ইরান শহরী-কে সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখেই বলছি, যদিও আমার বিবেচনায় তাঁর বিবরণে বৈজ্ঞানিক পরিপূর্ণতার কোনো দাবি তোলা হয়নি, আর তা এমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত বর্ণনা নয় যার কোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে। তাঁর বর্ণনানুসারে, বৌদ্ধদের মত যে, মেরু চারটি মূল দিকের চারটি লোকের মধবর্তী স্থানে অবস্থিত। তার তল বর্গাকার ও শিরোভাগ গোলাকার। তার দৈর্ঘ্য ৮০,০০০ (আশি হাজার) যোজন যার অর্ধাংশ আকাশের দিকে উঠে-গিয়েছে আর নিচু অংশটি পৃথিবীর অভ্যন্তরে চলে গিয়েছে। এর সেই পক্ষ যা আমাদের লোক (জগৎ)-এর পরে আসে তা নীলমণির সঙ্গে যুক্ত, আর এ কারণেই আমাদের কাছে আকাশ নীল বলে মনে হয় ; তার অন্য দিকে রয়েছে মাণিক্য তথা পীত ও শ্বেত রত্ন। মেরু হলো পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
সাতটি দ্বীপ সম্পর্কে পৌরাণিক ধ্যান-ধারণা

মৎস্য তথ্য বিষ্ণু পুরাণ-অনুসারে দ্বীপসমূহের বর্ণনা

আমার পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমার নিবেদন যে, এ অধ্যায়ে প্রযুক্ত সমস্ত আরবি শব্দ যদি তাদের ভাষায় প্রচলিত শব্দ ও তার অর্থের সর্বথায় অনুসারী না হয় বা ভিন্ন প্রতীত হয় তাহলে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। শব্দের অর্থের পার্থক্যের মূল কারণ হলো ভাষান্তরের পার্থক্য ; কিন্তু যেখানে অর্থের ভিন্নতার সম্পর্ক, সেখানে তার উল্লেখ আমি এ কারণেই করেছি যে, তার মাধ্যমেই এরকম কিছু সিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, যা সম্ভবত, কোনো কোনো মুসলমানও স্বীকার করবেন, অথবা তার উদ্দেশ্য এ-ও থাকে যে, এরকম কোনো তথ্যের অবিবেচনাপ্রসূত স্বরূপ স্পষ্ট হতে পারে যা সর্বথায় ভিত্তিহীন।

১. জম্বুদ্বীপ

আমি কেন্দ্রীয় দ্বীপ প্রসঙ্গে এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যখন আমরা তার কেন্দ্রীয় পর্বতের পরিপ্রদেশের বর্ণনা করেছিলাম। এর নামকরণ হয়েছে জম্বুদ্বীপ যা সেখানকারই একটি বৃক্ষের নামে নামাঙ্কিত, যা তার মধ্যবর্তী স্থানেই বেড়ে উঠেছিল এবং যার শাখা-প্রশাখা ১০০ যোজন দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে জম্বুদ্বীপের বর্ণনা করব যেখানে বসবাসযোগ্য জগৎ ও তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছি। এরপর আমরা ঐ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের বর্ণনা দেব যেগুলো তার আশপাশে অবস্থিত আর সেগুলোর নামের ক্রমসম্পর্কে যা কিছু প্রমাণ আমার কাছে আছে তার উৎস হলো 'মৎস্য পুরাণ'।

[এরপর ঐ ছয়টি দ্বীপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা মূলত মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণ হতে গৃহীত। এর বর্ণনায় কিছুটা পৌরাণিক কাহিনি-নির্ভর আর কিছুটা অবিশ্বাস্য পাগলের প্রলাপ, যেমন, সে কাহিনি মতে, কিছু দ্বীপের অধিবাসীরা ৩,০০০ বা ১১,০০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকত। নিচে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এরকম কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল ভৌগোলিক

বিবরণ ও ভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের সামাজিক জীবন সম্পর্কিত কাহিনি-প্রলাপই তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্র. অধ্যায় ৭১ ও ৭২।]

২. শাক-দ্বীপ

...এবার শাক-দ্বীপের বর্ণনা করব। এতে সাতটি বড় বড় নদী আছে, যার একটি পবিত্রতার বিচারে গঙ্গার সমকক্ষ। (তাতে) সাতটি পর্বত আছে যেগুলো রত্নখচিত, এর কয়েকটিতে দেবতারা বাস করে আর অন্য কয়েকটিতে বাস করে রাক্ষসেরা। পর্বতগুলোর একটিতে উত্তুঙ্গ সোনালি পর্বত রয়েছে, যেখানে মেঘমালা জমা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এর মধ্যেকার একটি পর্বতে সমস্ত প্রকারের ঔষধি পাওয়া যায়...।

শাক-দ্বীপের অধিবাসীরা খুবই ধর্মপরায়ণ ও তারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে। সেখানে কোনো রাজ-শাসনের লোভলালসা হিংসাবিদ্বেষ বলে কিছুই নেই। সেখানে চতুর্বর্ণের অর্থাৎ চার জাতির লোকেদের বসবাস, যারা পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক-সূত্রে যেমন আবদ্ধ হয় না, তেমনি পরস্পরে মিলেমিশে বসবাস করে না। ...সে সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর নাম হলো আর্যক, কুরুর, বিবিংশ (বিবংশ) ও ভাবিন (?) এবং তারা বাসুদেবের উপাসক।

৩. কুশ-দ্বীপ

তৃতীয় দ্বীপের নাম হলো কুশ-দ্বীপ। (এতে) সাতটি পর্বত আছে, যাতে রত্ন, ফল, ফুল, সুগন্ধিত বৃক্ষরাজি ও অন্ন আছে...। (এতে) সাতটি রাজ্য আছে ও অনেক নদী আছে যেগুলো প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। আর যেগুলোকে ইন্দ্র বর্ষায় পরিণত করে দেন। সবচেয়ে বড় নদীগুলোর মধ্যে জৌনু (যমুনা) নদী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যা সমস্ত পাপরাশি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয় ...এর অধিবাসীরা ধর্মপরায়ণ ও নিষ্পাপ...। তারা জনার্দনের পুজো করে আর সেখানকার জাতি গোষ্ঠীগুলোর নাম হলো যথাক্রমে দামিন, সুষমিন, স্নেহ ও মন্দেহ।

৪. ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ

চতুর্থ ও ক্রৌঞ্চ-দ্বীপে... পর্বত আছে যা থেকে রত্ন নির্গলিত হয়। অনেক নদী আছে যেগুলো গঙ্গারই শাখা আর এমন রাজ্য আছে যেখানকার লোকেরা গৌরবর্ণ এবং তারা ধর্মপরায়ণ ও সাত্ত্বিক। বিষ্ণু পুরাণানুসারে সেখানকার লোকেরা একই স্থানে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। কিন্তু একটু অগ্রসর হয়ে তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেখানে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীগুলোর নাম পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য (?)। তারা জনার্দনের পূজারি।

৫. শাল্মল-দ্বীপ

পঞ্চম বা শাল্মল-দ্বীপে পাহাড় ও নদনদী রয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা সাত্ত্বিক বৃত্তি অবলম্বনকারী, দীর্ঘায়ু ও সৌম্য স্বভাবের এবং তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ নেই। সেখানে কখনো অনাবৃষ্টি ও আকাল দেখা যায় না, কেননা, তারা কেবল ইচ্ছা করলেই মনের মতো খাদ্যসামগ্রী লাভ করে এবং তাদের চাষাবাদ বা পরিশ্রম করার কোনো প্রয়োজন হয় না। সেখানে কোনো রাজ-শাসনের প্রয়োজন হয় না, কেননা, তাদের কোনো সম্পত্তির লালসা নেই। এ দ্বীপের জলবায়ুতে ঠাণ্ডা-গরমের কোনো কুপ্রভাব নেই, সেজন্য এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের কোনো কষ্ট করতে হয় না। সেখানে কোনো বর্ষা হয় না ; বরং তাদের জন্য পানি পৃথ্বীতল থেকে প্রবাহিত হয়ে পর্বতমালার নিচে দিয়ে গড়িয়ে যায়। একই অবস্থা নিম্নবর্ণিত দ্বীপগুলোর ক্ষেত্রেও...।

তাদের মুখাকৃতি ভারি সুন্দর হয় এবং তারা ভগবতীর পুজো করে। তারা অগ্নিতে আহুতি দেয়...। সেখানকার জাতিগুলোর নাম কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ।

৬. গোমেদ-দ্বীপ

ষষ্ঠ বা গোমেদ-দ্বীপে দুটি বড় বড় পর্বত আছে যার একটির রং গাঢ় সাদা যেটি দ্বীপের বেশি অংশ অধিকার করে রয়েছে আর দ্বিতীয়টি কুমুদ পাহাড় যার রং সোনালি এবং তা খুবই উঁচু ; পরেরটিতে সমস্ত প্রকারের ঔষধি পাওয়া যায়। এ দ্বীপে দুটি রাজ্য আছে।

বিষ্ণু পুরাণানুসারে এখানকার অধিবাসীরা ধর্মপরায়ণ ও নিষ্পাপ বৃত্তির অধিকারী, তারা বিষ্ণুর উপাসনা করে। সেখানকার জাতিগুলোর নাম মৃগ, মগধ, মানস ও মানদগ। এখানকার জলবায়ু এতটা স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুখদায়ক যে, বৈকুণ্ঠবাসীরা এর বাতাবরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে ইচ্ছামত যাওয়া-আসা করে।

৭. পুষ্কর-দ্বীপ

মৎস্য পুরাণানুসারে সপ্তম বা পুষ্কর-দ্বীপের পূর্বাংশে চিত্রশালা নামে একটি পর্বত আছে। এর রং-বেরঙের শিখর রয়েছে যার উপরে শৃঙ্গ ও রত্ন পরিলক্ষিত হয়। এর উচ্চতা ৩৪,০০০ যোজন আর এর পরিধি ২৫,০০০ যোজন। এর পশ্চিমে অবস্থিত মানস পর্বত যা পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলো ঝলমল করে। এর উচ্চতা ৩৫,০০০ যোজন। এ দ্বীপের পূর্বে দুটি রাজ্য আছে...। তাদের জন্য পানি ধরণীতল থেকে উৎসারিত হয় এবং পাহাড়গুলোর নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এখানে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না আর এখানে কোনো নদনদীও নেই ; সেখানে না আছে ঠাণ্ডা আর না আছে কোনো গরম। তারা জাতিপরিচয়হীন জনগোষ্ঠী আর তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদও নেই। সেখানে কখনো কোনো বস্তু কম পড়ে না আর সেখানে বার্ধক্য আসে না...। মনে হয় যেন তারা স্বর্গের উপকণ্ঠে বসবাস করে। এ কারণে সেখানে না আছে কোনো সেবক, না আছে শাসক, না আছে পাপ, হিংসা ও বিদ্বেষ আর না আছে কোনো বিরোধ, না আছে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ, না আছে কৃষিকর্মজনিত পরিশ্রম, না আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের (মেহনত...)।

বিষ্ণু পুরাণানুসারে সেখানকার অধিবাসীরা পরস্পর সমান, তারা কেউ নিজেকে একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে না। এই দ্বীপে মানসোত্তম নামে একটিই মাত্র পর্বত আছে যা এই গোলাকার দ্বীপটিকে গোলাকারভাবে ঘিরে রেখেছে। এর উপত্যকা থেকে অন্য সমস্ত দ্বীপই দেখা যায়, কেননা, এর উচ্চতা ৫০,০০০ যোজন আর তার পরিধি প্রায় ততটাই।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভারতের নদনদী, তার উৎস ও গতিপথ

ইয়োরোপ ও এশিয়ার নদনদীগুলো হিমালয় ও তার পশ্চিমি ও পূর্বী ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত

মৎস্য পুরাণ ও বায়ু পুরাণ-এ জম্বুদ্বীপের নদনদীগুলোর কথা উল্লেখিত হয়েছে আর তাতে বলা হয়েছে যে, সেগুলো হিমবন্ত (হিমালয়) পর্বত থেকে উৎসারিত হয়েছে। নিম্নলিখিত সারণিতে আমি কেবল তার একটি সূচি প্রদান করেছি যে ক্রম সম্পর্কে আমরা কোনো মতের অনুসরণ করিনি। পাঠক একথা জানেন যে, ভারতের সীমান্তগুলো পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরের পর্বত বরফাচ্ছাদিত পর্বতমালা। এরই মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কাশ্মির আর তা তুর্কিদের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। এ পাহাড়ি উপত্যকা বসবাসযোগ্য ভূমি আর মেরু-পর্বত পর্যন্ত পৌছাতে পৌছাতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যেহেতু এ পর্বতমালা মূলত লম্বায় বিস্তৃত, এর উত্তর-ভাগ থেকে উৎসারিত নদনদী তুর্কি, তিব্বত, খজরা, স্লোভানিয়া ইত্যাদি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জরজানসাগর (কাস্পিয়ান সাগর)-এ বা স্লোভানিয়ার উত্তর-সাগর (বাল্টিক)-এ গিয়ে পতিত হয়েছে ; যেমন দক্ষিণাংশ থেকে উৎসারিত নদনদীগুলো ভারতের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে, যেগুলোর কোনোটা একাকী আবার কোনোটা বা একত্রে মহাসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে।

ভারতের নদনদী

ভারতের নদনদীগুলো উত্তরের ঠাণ্ডা পর্বতমালা থেকে উৎসারিত হয় অথবা পূর্ববর্তী পর্বতমালা থেকে এবং বাস্তবিকই এ দুয়ের একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যায় যা পূর্বদিকে বিস্তৃত ও তারপর দক্ষিণ দিকে ঘুরে মহাসাগর পর্যন্ত চলে যায় যেগুলোর কিছু অংশ রামবাঁধ নামক স্থানে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। একথা সত্য যে, শীত ও গ্রীষ্মকালে এসব পর্বতমালায় অনেক অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নলিখিত সারণিতে এ নদনদীগুলোর নাম প্রদত্ত হলো :

সিন্ধু বা বাইহন্দ নদী	বিয়ত্তা বা ঝিলাম নদী	চন্দ্রভাগা বা চন্দ্রাহা নদী	লাহোরের পশ্চিমে বিয়াহা	লাহোরের পূর্বে ইরাবতী	শতদ্রু বা শতলদর
সরস্বতী যা সরস্বতী দেশ থেকে প্রবাহিত হয়	যমুনা	গঙ্গা	সরযু বা সরওয়া	দেবিকা	কুহু
গোমতী	ধুপতাপ	বিশাল	বহুদশা (!)	কৌশিকী	নিশ্চরা
গণ্ডকী	লোহিতা	দৃশদ্ধাতি	তম্রঅরুণ	পরনাশা	বেদস্মৃতি
বিদাসিনী	চন্দনা	কবন	পর	চর্মণবতী	বিদিশা
বেনুমতী	ক্ষিপ্রা পশ্চিম থেকে উৎসারিত ও উজ্জেন থেকে প্রবাহিত	কারাটোয়া	শমহীনা		

পাঞ্জাবের নদনদী

বিয়ত্তা নদী বা তার পশ্চিমতটের শহরের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত তা ঝিলম নামে পরিচিত এবং চন্দ্রহা নদীর নিকটবর্তী স্থান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল অগ্রসর হয়ে পরস্পরে মিলে গিয়ে মুলতানের পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে বয়ে গিয়েছে।

বিয়াহা নদী মুলতানের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে বিয়ত্তা ও চন্দ্রাহা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ইরাবা (ইরাবতী) নদী কাল নদীতে ক্রমে মিলিত হয়েছে যেটি ভাটুল পর্বতমালার অভ্যন্তরে নগরকোট থেকে উৎসারিত হয়। এর পরে পঞ্চম নদীটির নাম শতলদর (সতলজ)।

এই পাঁচটি নদী মুলতানের নিম্নতম এলাকা অতিক্রম করে পঞ্চনদ নামক স্থানে– যার অর্থ পঞ্চনদীর মিলনস্থল– সেখানে মিলিত হয়ে এক বিশাল নদীতে পরিণত হয়েছে। বন্যার সময় কখনো কখনো এতে পানি এতটা বৃদ্ধি পায় যে, তা দশ ফারসাখ এলাকা পর্যন্ত প্লাবিত করে ফেলে এবং সে সমস্ত এলাকার বৃক্ষরাজির এতটা উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হয় যে, বন্যার কারণে মৃত পশুপক্ষী

পর্যন্ত ঐ সব বৃক্ষরাজির শাখাগুলোতে লটকিয়ে থাকে। তা দেখলে মনে হয় যেন তার শাখাগুলোতে পাখিদের বাসা ঝুলছে।

সিন্ধু ও অরোর থেকে প্রবাহিত এই সমস্ত নদীকে মুসলমানরা 'মেহরা নদী' অর্থাৎ সংযুক্ত নদী বলে অভিহিত করেন। এভাবে তা সোজা প্রবাহিত হয়ে দূর-দূরান্তে চলে যাওয়ার ফলে তার পানি খুবই নির্মল হয়ে যায়। এগুলো তার প্রবাহের পথে গড়ে ওঠা দ্বীপগুলোকে পরিবেষ্টিত করে বয়ে গিয়ে আল-মনসুর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেটি এ নদীগুলোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং অবশেষে দুটি স্থানে লোহরানি নগরের সমীপে ও পূর্বে কচ্ছ প্রান্তে সিন্ধু সাগর নামক স্থানে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়...।

সরস্বতী নদী সোমনাথের পূর্বপ্রান্তে সামান্য দূরে গিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন নদনদী

জৌন নদী কনৌজের নিচু এলাকায় গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হয় যা তার পশ্চিম তটে অবস্থিত। সংযুক্ত নদী গঙ্গাসাগরের নিকট মহাসাগরে গিয়ে পতিত হয়। সরস্বতী ও গঙ্গার মোহনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নর্মদা মোহনা, যা পূর্ব পর্বতমালা থেকে উৎসারিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে গেছে এবং সোমনাথ থেকে প্রায় ষাট যোজন দূরে পূর্বদিকে অবস্থিত বহরোচ্চ (ভিয়োচ) নামক নগরের নিকটে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে...।

গঙ্গার পিছনে রহব ও কবিনী নদী দুটি প্রবাহিত হয়ে বাড়ি নামক নগরের সমীপবর্তী স্থানের সরবা নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে...।

গঙ্গা যা মধ্যবর্তী ও প্রধান নদী গন্ধর্ব সংগীতকার, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরঙ্গ অর্থাৎ যারা নিজেদের বুকের রং পরিবর্তিত করে নেয়, সর্প, কল্লগ্রাম অর্থাৎ অগণিত সদাচারী, কিংপুরুষ (খাসি), পর্বতবাসী, কিরাত, পুলিন্দ, শিকারি, ডাকাত, কুরু, ভারত, পাঞ্চাল, কৌশক, মৎস্য, মগধ, ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্তি হয়ে বয়ে গিয়েছে। এরা হলো সেই ভালো ও মন্দ প্রাণী যাদের রাজ্যগুলো অতিক্রম করে গঙ্গা বয়ে গেছে। অগ্রসর হয়ে তা বিন্ধ্যাচল পর্বতের শাখাগুলোতে প্রবেশ করে যেখানে হাতিদের বসবাস এবং তারপরে দক্ষিণী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়।

গঙ্গার পূর্বীয় শাখাগুলো থেকে হ্রদনী, নিষভ, উপকন, ধীবর, নিষক, নীলমুখ, কীকর, উষ্ট্রকর্ণ অর্থাৎ সেই প্রজাতির মানুষ যাদের ঠোঁট কানের মতোই মুড়ে থাকে, কিরাত, কালিন্দার, বিবর্ণ অর্থাৎ বে-রঙের লোক, যাদের গাত্রবর্ণ ঘোরকৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় এই নামকরণ হয়েছে, কুশিকণ ও স্বর্গভূমি অর্থাৎ স্বর্গের ন্যায় দেশগুলোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে পূর্বীয় মহাসাগরে গিয়ে পতিত হয়।

ষড়বিংশ অধ্যায়

হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আকাশ ও পৃথিবীর আকার

কুরআন সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত আধার

এই প্রশ্ন ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নাবলি হিঁদুরা যেভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে এবং তারা যে সমাধান দিয়েছে তা সর্বথায় মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। এ সম্পর্কে তথা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এমন নয় যা শোনামাত্রই শ্রোতার মনে সুনিশ্চিত ধারণার রূপে গেঁথে দেওয়ার জন্য কোনো রকমের ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। এ কথা কুরআনের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রতিটি মানুষের জন্য জ্ঞেয় বিষয়ের উপর পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত আয়াত রয়েছে তার সঙ্গে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোরও পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, তবে কুরআনের বিশেষত্ব হলো তা সর্বথায় স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত।

হিঁদুদের নিজস্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা

হিঁদুদের ধর্মগ্রন্থসমূহ, তাদের স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ ও তাদের পৌরাণিক গ্রন্থাবলিতে জগৎ সংসারের আকার সম্পর্কে এমন সব শ্লোক পাওয়া যায় যা সর্বাবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীত, যেসবের অনুসন্ধান তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা করেছেন। এ সমস্ত গ্রন্থাবলির মাধ্যমেই লোকেরা তাদের ধর্মীয় আচার-সংস্কার পালন করে পথপ্রাপ্ত হয় এবং ওসবেরই মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ মানুষ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনা ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে বিশ্বাস করতে থাকে। এর পরিণামে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রতি তারা বড়ই শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করে থাকে এবং তারা বলে যে, তারা খুবই ভালো লোক, তাদের সঙ্গে মেলামেশা সৌভাগ্যের নামান্তর এবং সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস এমনই পোক্ত হয়ে গেছে যে, তারা মনে করে যে, তাদের দেখলে সবাই স্বর্গে যাবে, কেউ নরকে যাবে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের তত্ত্বে লোকবিশ্বাস ও লোকধারণাকেও অন্তর্ভুক্ত করে

জনসাধারণের মধ্যে এমন বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা তাদের বিশ্বাসের বিনিময়ে তারা সেই লোকবিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাদের ধারণাবলির অনুরূপ করে, তা সে সত্য থেকে যতই বিচ্যুত হোক না কেন, তাতে তারা এমনই আধ্যাত্মিক সামগ্রী যোগ করে দেয় যাতে করে তাদের নিজেদের প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি দুই-ই মিটতে পারে। এটাই কারণ যে, দুই সিদ্ধান্ত—সাধারণ ও বিজ্ঞানসম্মত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের সিদ্ধান্ত তাদের পূর্ববর্তী লেখকদেরই সিদ্ধান্ত—তারা শুধু তার নকল করে মাত্র আর যেখানে বহুমত আছে— তা অব্যবস্থিত ও গড়বড় হয়ে গেছে, যা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তসমূহকে স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় বলে না মেনে ঐতিহ্যগত বিশ্বাসকেই তাদের বিজ্ঞানের মূল আধার বলে স্বীকার করে নেয়।

পৃথিবী গোলাকার হওয়া ও তাদের মেরু সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা

এবার আমরা হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের মতে, পৃথিবীর আকার ও অন্যান্য সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। তাদের মতে, আকাশ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই গোলাকার এবং পৃথিবীও গোল যার উত্তরের অর্ধাংশ শুষ্ক ও দক্ষিণী অর্ধাংশ জলমগ্ন। ইউনানিদের মতানুসারে এবং আধুনিক প্রেক্ষণ অপেক্ষা তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর আয়তন অধিক বিস্তৃত এবং তাদের নিজস্ব গণনানুসারে এ আয়তন অনুসন্ধানের জন্য ঐতিহ্যগত গণনায় সমুদ্র ও দ্বীপগুলোকে একেবারেই বাদ দিয়েছেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যে যোজন জুড়ে রয়েছে সে সবের তো উল্লেখই করা হয়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা প্রতিটি ব্যাপারেই ধর্মবিজ্ঞানীদের অনুসরণ করেন, যার সঙ্গে তাদের বিজ্ঞানের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, মেরু-পর্বত সম্পর্কে তারা এ সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে যে, তারা উত্তরী ধ্রুব-এর অন্তর্গত ও বাড়বমুখ দ্বীপ দক্ষিণী ধ্রুব-এর নিচে অবস্থিত। প্রকৃত সত্য এই যে, মেরু সেখানে হোক বা না হোক, এ প্রশ্ন একেবারেই অসঙ্গত, কেননা, এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ চক্রের ঘূর্ণনের ব্যাখ্যা-সম্পর্কিত সন্দর্ভের মধ্যেই পড়তে পারে এবং এ সুযোগ তখনই আসে যখন এ সত্য স্পষ্ট করা হয় যে, পৃথিবী ধরাপৃষ্ঠের প্রত্যেক বিস্তৃত আকাশে তার সর্বোচ্চ স্থানের দ্যোতনা-সৃষ্টিকারী চিত্তীরই অনুরূপ হয়। এছাড়া দক্ষিণী দ্বীপ বাড়বমুখের নীতিকথা তার বিজ্ঞানকে কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, যখন এ সমস্ত যে

পৃথিবীর চতুর্থাংশের প্রতিটি স্তবকের সঙ্গে সংযুক্ত এক সুসঙ্গত ও বাধাহীন অন্বয় সৃষ্টি হয় যাতে পরস্পর দুটি মহাদেশের মধ্যে দিয়ে সাগর প্রবাহিত হয় (আর একথা সত্য যে, উত্তরী ধ্রুব-এর অন্তর্গত এ ধরনের কোনো দ্বীপই নেই)। পৃথিবীর এ ধরনের স্থিতি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অনুরূপ, কেননা, সে অনুসারে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত এবং ভারযুক্ত প্রতিটি বস্তুই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ কথা স্পষ্ট যে, মাধ্যাকর্ষণের এ নিয়মের কারণেই তাদের মত যে, আকাশের আকৃতিও গোলাকার হবে।

এবার আমি এ সম্পর্কে হিংদু জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের মতামত নিয়ে আলোচনা করব, যা তাদের ঐ সমস্ত গ্রন্থাবলির অনুবাদে আমার অনুবাদের দু-একটি শব্দ এমন কোনো অর্থের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় যা সাধারণত আমাদের বিজ্ঞানসমূহে প্রযুক্ত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাহলে আমার পাঠকদের সমীপে অনুরোধ তারা যেন শব্দের মূল অর্থের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন (তার পারিভাষিক অর্থের প্রতি নয়), কেননা, আমাদের অভিপ্রায় ওর সঙ্গেই সম্পর্কিত।

[পুলিশ-এর সিদ্ধান্ত ও ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আর্যভট্ট, বশিষ্ঠ ও লতার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দ্র. অধ্যায়–৭৬ ও ৭৭।]

পৃথিবীর গোলাকার হওয়া, উত্তরী ও দক্ষিণী অর্ধাংশের মধ্যে গুরুত্ব সন্তুলন ও মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত বিচার

আকাশ ও পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি, তাদের মধ্যবর্তী স্থানে কী আছে আর এ তথ্য সম্পর্কে যে, ভূমণ্ডলের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত পৃথিবীর আকাশের দৃশ্যভাগের তুলনায় খুবই ছোট– এ হলো হিংদু জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের মত। এ তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল রূপেই রয়েছে, যেমন টলেমীর আলমাজীস্তও এ ধরনের অন্য পুস্তকেও লিপিবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু তাদের ঐ প্রকারের বৈজ্ঞানিক বিবেচনা করা হয়নি, যেভাবে আমরা তাকে পরিবেশন করতে অভ্যস্ত।

(রিক্তি)

কেননা, পৃথিবী জলের তুলনায় অধিক ভারি এবং পানি বায়ুর মতোই তরল, এজন্য পৃথিবী ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ থেকে কোনো রূপ ধারণ করেনি, যতক্ষণ তার গোলাকার হওয়াটা তার ভৌতিক প্রয়োজনেরই অন্তর্গত। কারণ এটাই যে, পৃথিবী না উত্তরাভিমুখে চলে আর না জল দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয় আর এরই ফলস্বরূপ এক সমূহ অর্ধাংশ স্থল নয় আর না অন্য অর্ধাংশ জল। এ তখনই হতে পারে যখন স্বীকার করা হবে যে, স্থলভাগের অর্ধেকটা

কাপা। যেখানে আমাদের বিচার বিশ্লেষণের সম্পর্ক আগমন-শৈলীর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেখানে স্থলভাগ দুটি উত্তরী চতুর্থাংশ সমূহের কোনো একটা হবে আর এজন্য আমাদের এটাই অনুমান যে, একই অবস্থা সংলগ্ন চতুর্থাংশের ক্ষেত্রেও হবে। আমরা বাড়বমুখ নামক দ্বীপের অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, কেননা, এর অর্থাৎ মেরু সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি তা কেবল পরম্পরাগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

পৃথিবীর যে চতুর্থাংশ সম্পর্কে আমরা অবগত আছি তাতে বিষুবরেখার মধ্যে এমন সীমারেখা নেই যা স্থল ও সমুদ্রকে বিভক্ত করে। কেননা, কিছু কিছু স্থানে মহাদেশ সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং বিষুবরেখাকেও পিছনে ছেড়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমে হাবসিদের এলাকা যা দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ; বরং চন্দ্র পর্বতমালা পর্যন্ত এবং নীলনদের উৎসমুখ থেকেও অগ্রসর হয়ে এমন এলাকা পর্যন্ত চলে গিয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা 'সঠিকভাবে কিছু' জানি না। কারণ এই যে, এ মহাদেশ মরুময় ও দুর্গম আর এরকমই জুঙ্গ-এর সমৃদ্ধ এলাকার পিছনে সমুদ্রটি এমনই অগভীর যে, সেখানে কোনো জলযান চলতে পারে না। যে জাহাজই সেখানে সাহস করে অগ্রসর হয়েছে তা আর কখনো ফিরে আসতে পারেনি, যার ফলে জানা যায় যে, তারা সেখানে কী দেখেছে।

এরকমই ভারতের ও সিন্ধু এলাকার উপরের বিশাল ভূ-ভাগ দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, যা দেখে মনে হয় যে, তা ভূমধ্যরেখাকেও অতিক্রম করে যাবে।

এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আরবিস্তান ও ইয়েমেন অবস্থিত কিন্তু তারা দক্ষিণে এতদূর পর্যন্ত যেতে পারেনি যা ভূমধ্যরেখা অতিক্রম করতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে যে যে স্থলভাগ সমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে বিস্তৃত সেরকমই সেটিও সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তা স্থলভাগের কোনো কোনো স্থানকে যেমন ভেঙে দেয় তেমনি তাকে উপসাগরেও পরিণত করে। উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্র আরবিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত ও মধ্য সিরিয়ার নিকট পর্যন্ত জিহ্বা-আকারে বিস্তৃত। কুলজুম-এর কাছে গিয়ে তা একেবারেই সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেজন্য তাকে কুলজুম সাগরও বলা হয়।

আরও একটি এবং আরও বৃহত্তর উপসাগর পূর্ব আরবিস্তানে অবস্থিত যা পারস্য উপসাগর নামে পরিচিত। ভারত আরও একটি এবং আরও বৃহত্তর উপসাগর ও চীনের মধ্যবর্তী স্থানেও উত্তর দিকে সমুদ্রের বিশাল বেষ্টনী রয়েছে।

এভাবে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সমস্ত দেশের সমুদ্রতট বিষুবরেখার অনুরূপ নয়, আর তা নির্দিষ্ট দূরত্বেও অবস্থিত নয়।

(রিক্তি)

আর এই চারটি শহরের স্পষ্ট বিবরণ উপযুক্ত স্থানে দেওয়া যাবে।

সময়ের যে পার্থক্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা পৃথিবীর গোলাকার হওয়ায় এবং তা কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত হওয়ারই পরিণাম আর যদি তারা পৃথিবীর চিহ্নিতকরণ নিবাসীদের সঙ্গে করে থাকে, তা সে গোল হোক বা না হোক– আর প্রকাশ থাকে যে, নগরের কল্পনা অধিবাসীদের বাদ দিয়ে করাই যায় না– অতএব, পৃথিবীর উপর মানুষের অস্তিত্বের কারণ সেই আকর্ষণ বা সমস্ত ভারী বস্তুকেই তার কেন্দ্র অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে আকর্ষণ করে।

এরকমই মত বায়ুপুরাণেও দেওয়া হয়েছে, যেমন অমরাবতীতে যদি দুপুর হয় তাহলে বৈবস্বত-এ হয় সূর্যোদয়ের সময়, সুখায় যখন হয় অর্ধরাত্রি তখন বিভায় সে সময় সূর্যাস্ত হয়...।

মাধ্যাকর্ষণের উপর ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহিরের আলোচনা

'নিম্ন'-এর পরিভাষায় হিঁদুদের সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই, উদাহরণস্বরূপ, তা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের অভিব্যক্তি খুবই সূক্ষ্ম আর বিশেষভাবে এজন্য যে, এ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যার উপর প্রত্যেক খ্যাতনামা বিদ্বানই গবেষণা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, 'পণ্ডিতেরা একথা ঘোষণা করেছেন যে, পৃথিবীর গোলাই (বৃত্ত) আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিত আর মেরু পর্বত, যা দেবতাদের আবাসস্থল আর তার নিচে বাড়বমুখ তাদের শত্রুদের নিবাস, যেখানে দৈত্য দানবরা বাস করে। কিন্তু যে 'নিম্ন' বা নিচে বলা হয়েছে, তা তাদের কথানুসারে তা সাপেক্ষ কথন। আমরা একে স্বীকার করি না, আমাদের মতে, পৃথিবীর চারটি দিক একই রকম ; পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ায় আর সমস্ত ভারী বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিচের দিকে পড়ে, কেননা, তা বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আর তাকে ধারণ করা পৃথিবীর ধর্ম, ঐ রকমই, যেমনটি পানির ধর্ম বয়ে যাওয়া, আগুনের ধর্ম দহন করা আর বায়ুর ধর্ম গতি প্রদান করা। যদি কোনো বস্তু পৃথিবীর গভীরে যেতে চায় তাহলে তাকে এমন করেই দেখা উচিত। পৃথিবীর সবচেয়ে নিচে অবস্থিত আর বীজকে আপনি যেদিকেই ছড়িয়ে দিন না কেন তা ফিরে এসে মাটির উপরেই পড়ে এবং কখনোই তা উপরের দিকে উঠে যায় না।'

বরাহমিহির বলেন, 'পর্বত, সমুদ্র, নদনদী, বৃক্ষ, নগর, মানুষ, দেবতা সমস্ত কিছুই পৃথিবীর সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। আর যদি যমকোটি (যমকেতু) ও রুম একে অন্যের সামনে আসে তাহলে একথা কেউই বলতে পারে না যে, তুলনা করার পর একে অন্যের থেকে নিম্ন হয়, কেননা, 'নিম্ন'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ পৃথিবীর কোনো স্থানকে কীভাবে একথা বলতে পারে যে, ঐ স্থানটি নিম্ন, যেখানে সমগ্র দৃষ্টিতেই পৃথিবীর একটি স্থান অন্য স্থানের সমান এবং একটি স্থান

অতটাই উঁচু হতে পারে যেমন অন্যটি...। কারণ এটাই যে, পৃথিবী তাকেই আকৃষ্ট করে যা তার উপরেই অবস্থিত, কেননা, তা সমস্ত দিকেই 'নিচে' এবং আকাশ সকল দিকেই উপরে।'

[বলভদ্র মানব-নেত্রের বিস্তার-সীমার যে পরিভাষা দিয়েছেন তার আলোচনাত্মক পরীক্ষা করা হয়েছে ; সেই সঙ্গেই পৃথিবীর পরিধি সম্পর্কে পুলিশ-এর মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্র. অধ্যায় ৭৮, ৭৯, ৮০।]

সপ্তবিংশ অধ্যায়

জ্যোতির্বিদ ও পুরাণ রচয়িতাদের মতবাদ

পৃথিবীর দুই গতি, বিষুবরেখার অগ্রচলন

হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে যে সমস্ত মত পোষণ করেন, সেই একই মত, আমাদেরও। এ বিষয়ে আমি একটি উদাহরণ পেশ করব, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আমি যা পেশ করব, বাস্তবে তা খুবই অল্প।

[পুলিশ, ব্রহ্মগুপ্ত ও বলভদ্রের গ্রন্থাবলি হতে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দ্র. অধ্যায়–৮০।]

এ বিষয়ে আমি ভারতীয় গ্রন্থাবলিতে এতটাই পড়েছি।

লেখকের আলোচনা : বায়ুর প্রেরক-শক্তি

তাঁরা বায়ুর গতি-শক্তি সম্পর্কে যা কিছু বলে থাকেন, সে বিষয়ে আমার মত হলো যে, এ বিষয়টি তাদের জনসাধারণে বোধগম্য করে প্রকাশ করা উচিত, যাতে তারা সহজেই বুঝতে পারে। কেননা, লোক স্বচক্ষে দেখে যে, হাওয়া যখন এমন কোনো যন্ত্রে, যাতে পাখা লাগানো আছে, অথবা এরকম কোনো খেলনার বিরুদ্ধে চলে তখন তাতে গতি প্রদান করে। কিন্তু যখন তাঁরা প্রথম প্রেরকের (ঈশ্বর) চর্চা শুরু করেন তখন প্রাকৃতিক বায়ু থেকে তার চর্চা তারা একেবারেই ত্যাগ করেন। যদিও এই প্রেরণা বা গতি সকল অবস্থাতেই কোনো-না-কোনো কারণ দ্বারা নির্ধারিত। এর কারণ এই যে, যদিও বায়ু বস্তুর গতি প্রদান করে, (তা সত্ত্বেও) গতিশীলতাই এর মূল তত্ত্ব নয় আর এছাড়া যতক্ষণ তা কোনো সংস্পর্শে না আসে ততক্ষণ তা চলতে পারে না, কেননা, বায়ু একটি পিণ্ড আর তা বাহ্য প্রভাব বা সাধন থেকে ক্রিয়াশীল হয় আর তার গতি শক্তিরই অনুরূপ হয়।

তাঁরা বলেন যে, 'বায়ু থামে না' কেবল এটাই দেখায় যে, তার প্রেরক বা চালিকাশক্তি নিরন্তর চলতে থাকে আর তার উপর তার ওরকম বিশ্রাম ও প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, যা পিণ্ডে নিজের জন্য প্রয়োজন হয়। তাঁরা বলেন যে, তারা মন্দগতি প্রাপ্ত হয় না, তাঁরা বলেন যে তা সমস্ত প্রকারের বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত,

কেননা, মন্দতা ও ক্ষীণতা কেবল এমনসব পিণ্ড ও প্রাণীর মধ্যে আসে যা বিরোধী তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট।

দুই ধ্রুব কর্তৃক বৃত্তের সুরক্ষা

তাঁদের উক্তি দুটি ধ্রুব নক্ষত্র বৃত্তকে রক্ষা করছে, এর দ্বারা তারা বোঝাতে চান যে, তার দ্বারা সে তার সাধারণ গতিকে রক্ষা করে, এ নয়, তাকে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

[আল বিরুনী বলভদ্র ও ব্রহ্মগুপ্তের মতামতের নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তার উপর টীকা-টিপ্পনী রচনা করেছেন, যা পুরাণে উক্ত হয়েছে : (ক) সময়-সাপেক্ষ প্রকৃতি, (খ) স্থির নক্ষত্র, (গ) আকাশের গতির দিশা যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে পরিলক্ষিত হয়। দ্র. টীকা-টিপ্পনী।]

অষ্টবিংশ অধ্যায়
দশটি দিকের পরিভাষা

পিণ্ডগুলোর অন্তরীক্ষে বিস্তার তিনটি দিকে প্রবাহিত : লম্বা, চওড়া ও গভীর বা উচ্চতা। কোনো প্রকারের কাল্পনিকতা নয়, বাস্তবিকই দিশা বা দিকের পথ সীমিত বা নির্ধারিত, এজন্য তিনটি পথের প্রতীক রেখাগুলোও সীমিত আর তার ছয়টি দিক বা সীমাই তার দিশা বা দিক। আপনি যদি এই রেখাসমূহের কেন্দ্রে কোনো কর্তনরত পশুর কল্পনা করেন যা সেগুলোর কোনো একটির দিকে মুখ করে থাকে তাহলে পশুর দেহ-বিস্তার থেকে যে দিশা সৃষ্ট হবে তা হবে আগে, পিছে, ডাইনে, বাঁয়ে, নিচে এবং উপরে।

যদি এই দিশাগুলোর প্রয়োগ জগৎ-সংসারের সঙ্গে করা হয়, তাহলে তার নতুন নামকরণ করা যায়। যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পিণ্ডসমূহের উদয় ও অস্ত ক্ষিতিজ-নির্ভর হয় আর প্রথম গতি ক্ষিতিজ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় সেজন্য ক্ষিতিজের মাধ্যমে দিক-নির্ণয় সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক হয়ে যায়। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ– এই চারটি দিক (যা আগে, পিছে, ডাইনে ও বামেরই অনুরূপ) সাধারণত, সকলেই জানেন কিন্তু এগুলোর মধ্যেকার প্রতিটি দুয়ের মধ্যেকার দিকগুলোর নাম খুব কম লোকই জানে। এগুলোকে মিলিয়ে আটটি দিক হয়ে যায় আর উপর ও নিচেকে যদি মেলানো হয়, যার ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজনই হয় না তাহলে সব মিলিয়ে দশটি দিক হয়...।

হিন্দুরা এই দিকগুলোর নামকরণের সময় বায়ু প্রবাহের প্রতি কোনো মনোযোগই দেননি ; তাঁরা কেবল চারটি মূল দিক এবং তাদের মধ্যেকার গৌণ দিকগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামেই জানেন। এরকম অনুপ্রস্থ স্তরে যা নিচের রেখাসমূহে প্রদর্শন করা হয়েছে, তাঁরা কেবল চারটি দিককেই স্বীকার করেন :

		দক্ষিণ		
দক্ষিণ-পশ্চিম				দক্ষিণ-পূর্ব
	নৈঋত	দক্ষিণ	অগ্নি	
পশ্চিম	পশ্চিম	মধ্য-দেশ	পূর্ব	পূর্ব
	বায়ু	উত্তর	ঈশান	
উত্তর-পশ্চিম				উত্তর-পূর্ব
		উত্তর		

এর অতিরিক্ত অনুপ্রস্থ স্তরে দুই ধ্রুবের জন্য আরও দুটি দিক আছে, উপর ও নিচে যেগুলোর মধ্যেকার প্রথমটিকে উপরি ও অন্যটিকে অধস্ ও তল বলে...।

হিঁদুরা কোনো বস্তুকেই তা সে বুদ্ধিবৃত্তিক হোক বা কাল্পনিকই হোক, তার মানবীকরণ ছাড়া থাকতে পারে না। তারা তাকে তৎক্ষণাৎ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেয়, তাদের বিবাহোৎসব সম্পন্ন করে, তার পত্নীকে গর্ভবতী করিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা কোনো না কোনো বস্তুকে জন্মদান করিয়ে ছাড়ে। আর একথা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিষ্ণুধর্মে একথা বলা হয়েছে যে, অভি, যে নিজেই একটি নক্ষত্র এবং সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে শাসন করে, সে দিকগুলোর সঙ্গে বিবাহ করে। সে দিশাগুলোকে, যার সংখ্যা আট, তাকে এক-স্ত্রী বলে গ্রহণ করে, আর তা থেকে চাঁদের জন্ম হয়...।

তারা নিজেদের প্রথানুসারে হিঁদুদের অনুপ্রস্থ স্তরের আটটি দিককে কিছু অধিষ্ঠাতা বলে মান্য করে, যা নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো :

অধিষ্ঠাতা	দিকসমূহ	অধিষ্ঠাতা	দিকসমূহ
ইন্দ্র	পূর্ব	বরূণ	পশ্চিম
অগ্নি	দক্ষিণ-পূর্ব	বায়ু	উত্তর-পশ্চিম
যম	দক্ষিণ	কুরু	উত্তর
পৃথু	দক্ষিণ-পশ্চিম	মহাদেব	উত্তর-পূর্ব

উনত্রিংশৎ অধ্যায়

হিঁদুদের মতে বাসযোগ্য পৃথিবীর পরিভাষা

বাসযোগ্য জগৎ সম্পর্কে ভুবন কোষের সিদ্ধান্ত

ঋষি ভুবন কোষের পুস্তকে লেখা হয়েছে যে, বাসযোগ্য জগৎ হিমবন্ত (হিমালয়ে) থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত, যাকে ভারতবর্ষ বলা হয়। ভরত নামক রাজার নামের সঙ্গে তা সম্পর্কিত, যিনি সে দেশকে শাসন করতেন আর তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। এই বাসযোগ্য ভূমিতে বসবাসকারী লোকদের ইহজীবনের পরে অন্য একটি জীবন আছে, যেখানে তাদের কর্মফলের পুরস্কার অথবা দণ্ডের বিধান আছে। এটি নয়টি পথে বিভক্ত, যাকে 'নবখণ্ডপ্রথম' অর্থাৎ প্রাথমিক নয়ভাগ বলে অভিহিত করা হয়। এগুলোর প্রতিটি ভাগের মধ্যভাগে একটি করে সমুদ্র আছে, যা থেকে তারা এক খণ্ড থেকে দ্বিতীয় খণ্ডে যাত্রা করে। বাসযোগ্য এ ভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১০০০ যোজন চওড়া।

হিমবন্ত বলতে লেখক উত্তর দিকের সুবিশাল পর্বতমালাকে বুঝিয়েছেন, সেখানকার ভূমি অত্যধিক শীতের কারণে বসবাসের অযোগ্য। এজন্য সভ্যতার যা কিছু বিকাশ সাধিত হয়েছে তা নিশ্চয়ই এ পর্বতমালার দক্ষিণে হয়ে থাকবে।

তাঁর ভাষায় এ লোকে বা এখানকার অধিবাসীরা যে দণ্ড বা পুরস্কারের ভাগী হবেন সে ভিন্ন লোকে, যার পুরস্কার বা দণ্ডের উপযুক্ত স্থান এ লোক নয়। তারা ঐ সমস্ত প্রাণীকে মানবশ্রেণী থেকে উর্ধ্বে উঠিয়ে দেওয়া বা দেবতাদের পর্যায়ে উন্নীত করা, যা ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী রচনা (বা সৃষ্টি) করা হয়েছে, আর তাতে স্বভাবের পবিত্রতার ফলস্বরূপ কখনো কোনো ঐশ্বরিক আদেশের অবজ্ঞা করে না ; বরং সর্বদাই তার আরাধনায় তৎপর থাকে ; আর অথবা তাদের অবিবেকি পশুদের শ্রেণীতে পৌছে দেয়। তাদের মতানুসারে, ভারতবর্ষের বাইরে মানুষ হয়ই না।

ভারতবর্ষ বলতে তারা কেবল হিঁদুস্থানই নয়, যেমনটি হিঁদুরা মনে করে, তারা মনে করে তাদের দেশটাই জগৎ আর তাদের জাতিই একমাত্র মানবজাতি ;

কেননা, তারা মহাসাগর অতিক্রম করে অন্য ভূখণ্ডে যায় না যাতে একটি খণ্ডকে অন্য খণ্ডের সঙ্গে বিভক্ত করতে না পারে। এর অতিরিক্ত এ সমস্ত খণ্ডকে তারা দ্বীপ বলে স্বীকার করে না, কেননা, তাদের লেখক বলেন যে, ঐ সমুদ্রগুলোতে লোকেরা এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে যায়। তাদের বক্তব্য থেকে এ অর্থও বেরিয়ে আসে যে, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীই তার পুরস্কার বা দণ্ডের ভাজন এবং তাদের এক একটি বড় বড় ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে।

ন'ভাগ 'প্রথম' বলতে তারা বোঝায় ভারত ন'ভাগে বিভক্ত। এরকমই বাসযোগ্য লোক-এর বিভাজন তো 'প্রাথমিক' কিন্তু ভারতবর্ষের বিভাজন 'গৌণ'। এর আগেও ন'ভাগে একটি তৃতীয় বিভাজন আছে, কেননা, জ্যোতিষী যখন তাতে শুভ ও অশুভ স্থান নির্ণয়ের পরিশ্রমসাধ্য চেষ্টা করেন তখন তাঁরা পুনরায় প্রত্যেক দেশকেই নয় ভাগে বিভক্ত করে দেন...।

এরপর 'বায়ুপুরাণ'-এ ঐ দেশগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রত্যেকটি দিকেই অবস্থিত। আমরা তা সারণির মাধ্যমে দেখাব সেই সঙ্গে অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত এরকমই তথ্য সন্নিবেশ করব, কেননা, এ এমনই পদ্ধতি যে, এর দ্বারা এ বিষয়টির অধ্যয়ন অন্য পদ্ধতির চেয়ে সরল এবং সুবিধাজনক।

এখানে আমি একটি রেখাচিত্র প্রদর্শন করছি যাতে ভারতবর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

		দক্ষিণ		
	নাগদ্বীপ ———		তাম্রবর্ণ	
		গভাস্তিমত		
পশ্চিম	সৌম্য	ইন্দ্রদ্বীপ বা মধ্যদেশ অর্থাৎ দেশের মধ্যভাগ	কেসরুমট	পূর্ব
	গন্ধর্ব ———		নগরসমবৃত্ত	
		উত্তর		

কূর্মচক্রের আকৃতি

আমি পূর্বেই একথা উল্লেখ করেছি যে, পৃথ্বীর ঐ অংশ যেখানে বসবাসযোগ্য ভূমি অবস্থিত তা কচ্ছপের আকার বিশিষ্ট, কেননা, তার যে অংশটি পানির উপর বেরিয়ে রয়েছে তা গোলাকার। এছাড়া এ সম্ভাবনাও আছে যে, এর মূল নাম জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রী ও জ্যোতিষীরা চাঁদ ও গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে, এই

দিক বিভাজন করে থাকবেন। কারণ এটাই যে, এদেশও চাঁদ ও নক্ষত্ররাজির অবস্থানানুযায়ী বিভক্ত হয়েছে। এ কারণেই একে 'কূর্মচক্র' বা কচ্ছপাকৃতির বলা হয়...।

বরাহমিহিরের মতে ভারতবর্ষের বিভাজন

বরাহমিহির 'নব খণ্ড'-এর প্রত্যেকটি বর্গের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'ঐ থেকেই (বর্গ থেকে) ভারতবর্ষ অর্থাৎ আধাবিশ্ব নয় ভাগে বিভক্ত হয়েছে– মধ্য, পূর্ব ও আদি।' তারপর তা দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে এবং এভাবে তা সমস্ত ক্ষিতিজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাঁরা ভারতবর্ষকেই হিঁদুস্তান বলে কেন মনে করেন, তাদের কথা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত একটি প্রদেশ আছে, যেখানকার রাজা তার সঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য :

প্রথম বা মধ্য বর্গে	পাঞ্চাল প্রদেশ আসে।
দ্বিতীয় বর্গে	মগধ প্রদেশ আসে।
তৃতীয় বর্গে	কলিঙ্গ প্রদেশ আসে।
চতুর্থ বর্গে	অবন্তী বা উজ্জৈন প্রদেশ আসে।
পঞ্চম বর্গে	অনন্ত প্রদেশ আসে।
ষষ্ঠ বর্গে	সিন্ধু বা সৌবীর প্রদেশ আসে।
সপ্তম বর্গে	হারাহৌ প্রদেশ আসে।
অষ্টম বর্গে	মাদুরা প্রদেশ আসে।
নবম বর্গে	কুলিন্দ প্রদেশ আসে।

এসব দেশ বাস্তবিকই ভারতেরই অন্তর্গত।

ভৌগোলিক নামসমূহের পরিবর্তন

ঐ সমস্ত দেশ অধিকাংশের নাম যাদের অন্তর্গত যা এ সন্দর্ভে দেখানো হয়েছে, এখন তা থেকে সামান্যমাত্রই অবগত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে 'সংহিতা'-র উপরে লেখা নিজের কৃত টীকায় কাশ্মিরের অধিবাসী উৎপল লেখেন : 'দেশ-বিশেষের নাম যুগে যুগে বদলে যায়। যেমন মুলতান, যা কল্যাণপুরা নামে পরিচিত ছিল, তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হংসপুরা হয়ে যায়, তারপর হয় নাগপুরা, তারপর সম্ভবপুরা, তার পর মূলস্থান– মূলের অর্থ মূল আর তানের অর্থ স্থান বা জায়গা– (সব শেষে হয়ে গেল মুলতান)।

যুগ এক প্রলম্বিত কালাবধি কিন্তু ভিনদেশি ও ভিন্নভাষী কোনো দেশ যখন সেই দেশ অধিকার করে নেয় তখন তার নাম অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তারা তাদের মুখের ভাষাকে নিরন্তর বিকৃত করে ফেলতে থাকে এবং একইভাবে নিজেদের ভাষায় তা পরিবর্তিত করে নেয়, ঠিক ঐ রকমই যে রেওয়াজ ইউনানিদের মধ্যে রয়েছে। তারা তো হয় নামের মূল অর্থকে ঠিক রাখে আর তার অনুবাদ করতেও সচেষ্ট হয় কিন্তু এর মধ্যেই কিছু নাম এমনিতেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঠিক এরকমই শশ নগরের নাম, যে নামটি তুর্কি ভাষায় তাশকন্দ বলে গ্রহণ করা হয়েছে যাকে 'পাষাণ নগর' বলা হয়, তাকেই আবার 'জ্যাফিয়া' নামক পুস্তকে পাষাণদুর্গ বলা হয়েছে। ঠিক এভাবে পুরাতন নামের স্থলে তা নতুন নামে পরিচিত হয় এবং তা হয় অনুবাদের মাধ্যমেই। অথবা এর অন্যতম কারণ এও হতে পারে যে, অসভ্য বা অর্বাচীন লোকেরা স্থানীয় নামের অনুসরণে ঐ নামই রেখে দেয় কিন্তু ধ্বনিবিকৃতি ও রূপগত কারণে তা সহজেই বিকৃতরূপ ধারণ করে। উদাহরণত, আরবরা বিদেশি যে কোনো নামের আরবি রূপ দিতে গিয়ে এরকমই করে এবং তাদের রসনায় পড়ে তা বিকৃত হয়ে যায়, যেমন, 'বুশঙ্গা'কে তারা তাদের পুস্তকে 'ফুসানী' লেখে আর 'সাকিলকন্দ'কে তাদের রাজস্ব-সংক্রান্ত পুস্তকে 'ফারফজা' লেখে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত এবং মজার ব্যাপার যে কখনো বা এমনও হয় যে, একই ভাষা তাদের মুখে গিয়ে যেভাবে বদলে যায় এবং তার যে উচ্চারণ তারা করে তার পরিণাম এই হয় যে, সে সব শব্দাবলি বড় বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় রূপে বেরিয়ে আসে যা ঐ সমস্ত ব্যক্তিরাই মাত্র বুঝতে পারে যারা ভাষার প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুনকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আর এরকম পরিবর্তন বেশ কিছু বছর যাবৎ চলে আসছে ; আসলেই যার কারণ নেই বা তা কোনো প্রয়োজনও হয় না। আর একথা তো নিশ্চিত যে, এর সমস্ত কিছুরই প্রেরণা হিন্দুরা তাদের ইচ্ছা থেকেই লাভ করে এবং যতটা সম্ভব নাম তারা ব্যবহার করে আর তার উপরেই নিজেদের ব্যুৎপত্তির নিয়ম ও কৌশল আরোপ করে আর এভাবে তাদের ভাষায় যে শব্দবাহুল্য বা শব্দাড়ম্বর এসে যায় তা নিয়ে তারা গর্ব করে।

নিচে বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে যা আমরা 'বায়ু পুরাণ' থেকে গ্রহণ করেছি, তা আটটি দিক অনুসারে নামকরণ হয়েছে। যে সমস্ত নাম এরকমেরই যে বর্ণনা পূর্বেই দিয়েছি (অর্থাৎ সে সমস্ত নাম নয় যা সাধারণভাবে প্রযুক্ত)...।

[দেশ ও প্রদেশগুলোর নামের সূচি দেওয়া হয়েছে। দ্র. অধ্যায়– টীকা-টিপ্পনী ও অনুক্রমণিকা।]

রোমক, যমকোটি ও সিদ্ধপুরা প্রসঙ্গে

হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা বাসযোগ্য জগতের দেশান্তরের নির্ধারণ লঙ্কা থেকে করেছেন যা মধ্যাহ্ন-রেখার উপর তার কেন্দ্রে অবস্থিত, আর যমকোটি তার

পূর্বদিকে, রোমক পশ্চিম দিকে ও সিদ্ধপুরা বিষুবরেখার ঐ ভাগে অবস্থিত– যা লঙ্কার বিপরীতে। তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পিণ্ডসমূহে উদয় ও অস্ত প্রসঙ্গে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, যমকোটি ও রোমের মধ্যে এক অর্ধব্যাস (ভূমধ্যসাগর)-এর উত্তর-অক্ষাংশের অধিকাংশ ভাগে অনেক উপর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। তার কোনো ভাগই দক্ষিণ দিক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না যেমনটি হিঁদুরা রোমকদের সম্পর্কে বলে থাকে।

এখন আমরা এখানে লঙ্কা প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চাই না (কেননা, তার বর্ণনা আমরা আলাদা অধ্যায়ে করতে চাই)। ইয়াকুব[৩৩] ও আল ফাজরীর মতানুসারে যমকোটি ঐ দেশের নাম যেখানে 'তারা' নগর সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। আমি ভারতীয় সাহিত্যের কোথাও এই নামটি খুঁজে পাইনি। যেহেতু 'কোটি' শব্দের অর্থ হয় দুর্গ বা গড় এবং যম হয় মৃত্যুদেবতার নাম সেহেতু এর প্রতিশব্দরূপে আমার কঙ্গাদীজ শব্দটি স্মরণে আসছে, যার সম্পর্কে পারস্যবাসীদের ধারণা যে, কেকাউস বা যম সমুদ্রের সুদূর পূর্ববর্তী স্থানে তাকে বসিয়েছিল। কায়খসরু যখন আফরাসিয়াস নামক তুর্কির পিছু ধাওয়া করেছিলেন তখন সমুদ্র পথে কঙ্গাদীজ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন কিন্তু তার এই অভিযানের সময়টি ছিল তার অজ্ঞাতবাস ও নির্বাসনের। এর কারণ এও হতে পারে যে, ফারসিতে দীজ শব্দের অর্থ যেহেতু দুর্গ, যেমন কোটির ভারতীয় ভাষায় যে অর্থ হয়, সেহেতু বল্খবাসী আবু-মহশর কঙ্গদীজ-এর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ করেছেন দেশান্তর বা প্রথম মধ্যাহ্নরেখা।

উজ্জৈন-এর মধ্যাহ্নরেখা

হিঁদুরা কোনো স্থানকে কিসের উপর ভিত্তি করে অক্ষাংশ নির্ধারণ করেন তা আমি জানতে পারিনি। তাঁদের জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের বাসযোগ্য জগতের দেশান্তরকে গোলার্ধ মানার সিদ্ধান্ত দূর দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তাদের (এবং পাশ্চাত্য) জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে) এতটাই মতপার্থক্য যে, তার শুরু কোথা থেকে মান্য করা হবে। যদি আমরা হিঁদুদের সিদ্ধান্তকে, আমরা তাদের যতটা বুঝেছি, ব্যাখ্যা করা হলে, তাদের দৃষ্টিতে দেশান্তরের প্রারম্ভিক বিন্দু উজ্জৈন হবে যাকে তারা চতুর্থাংশের পূর্বীয় সীমানা বলে মান্য করে। আমরা এ দু'স্থানের দেশান্তরের পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে আলোচনা করব।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের এ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত রয়েছে। কেউ কেউ তো দেশান্তরের শুরু (আটলান্টিক) মহাসাগরের তট বলে মনে করেন। এখন এ সিদ্ধান্তানুসারে এমন বস্তুর সঙ্গে তাকে একত্রিত করা হয়েছে যাদের

পরস্পরে মধ্যে কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। পরিণাম হলো এই যে, শপূরকান ও উজ্জৈন এর পার্থক্য একই। মনে হয় যে, তারা পশ্চিমি দেশগুলোকে (অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকা) রোম বা রোমান সাম্রাজ্য বলে মনে করে। সম্ভবত এজন্য যে, রোম বা ইউনানকে সামান্য উত্তরে স্থাপন করা হয়েছে...। অন্য কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেশান্তরের শুরু 'সুখীজনদের দ্বীপপুঞ্জ' বলে মনে করেন... এ দুটি সিদ্ধান্ত হিঁদুদের সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আমি যদি কিছু দিন বেঁচে থাকি তাহলে দেশান্তরের উপরে এক বিশেষ নিবন্ধ লিখব যাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

লঙ্কা বা পৃথিবীর গম্বুজ

'পৃথিবীর গম্বুজ'-এর অর্থ

বসবাসযোগ্য জগতের মধ্যে– বিষুবরেখার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তার দেশান্তরীয় বিস্তারকে– মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা 'পৃথিবীর গম্বুজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন আর ধ্রুব ও বিষুবরেখার মধ্যস্থল থেকে বেরিয়ে আসা মহাবৃত্তকে 'গম্বুজের কেন্দ্রবিন্দু' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু একথা আমাদের বোঝা উচিত যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক আকার যা-ই হোক না কেন তার উপর এমন কোনো স্থান নেই যাকে অন্যের তুলনায় 'গম্বুজ' বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বাস্তবিকই এ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণ-চিহ্ন রূপে করা হয়েছে যা একটি বিন্দুরই প্রতীক, যা থেকে বাসযোগ্য জগতের দুই প্রান্তের সমান দূরত্বে অবস্থিত আর তা গম্বুজ বা শীর্ষশিখরের সঙ্গে তুলনীয় : কেননা, সমস্ত বস্তুর যা এই শীর্ষের নিচে অবস্থিত (তাঁবুর দড়ি বা প্রাচীরসমূহ) সমান উচ্চতাবিশিষ্ট আর তার নিচের অগ্রভাগের দূরত্বও সেখান থেকে সমান। কিন্তু এ বিন্দুর জন্য এমন কোনো শব্দের প্রয়োগ করা যায় না আমাদের ভাষায় যার অর্থ হয় 'গম্বুজ'। তাদের কেবল এটাই মত যে, লঙ্কা বাসযোগ্য জগতের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত আর তার কোনো অক্ষাংশও নেই।

রামকথা

এ সেই স্থান যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণ দশরথের পুত্র রামের পত্নীকে হরণ করে সেখানে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। তার এ জটিল দুর্গটির নাম ছিল 'শক্তমর্দ' যেমন আমাদের (মুসলিম) দেশে একে 'যবনকোটি' বলা হয় আর যাকে বারবার রোম বলে অভিহিত করা হয়েছে...।

রাম সমুদ্রের উপর শত-যোজন লম্বা বাঁধ নির্মাণ করে সমুদ্র পার হয়ে রাবণের উপর আক্রমণ করেছিলেন। এই বাঁধ তিনি 'সেতুবন্ধ' নামক জায়গায়

অবস্থিত একটি পর্বতের সাহায্যে নির্মাণ করেছিলেন, যেটি লঙ্কার পূর্বে অবস্থিত ছিল।

রাম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন এবং রামের ভাই রাবণের ভাইকে হত্যা করেন, যেমনটি রামকথা বা রামায়ণ-এর রামের সম্পর্কে জানা যায়। পরে তিনি বাণ নিক্ষেপ করে ঐ বাঁধের জায়গা ভেঙে দেন।

লঙ্কাদ্বীপ

হিঁদুদের মতানুসারে লঙ্কা হলো অসুরদের গড়। তা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০ যোজন (অর্থাৎ ৮০ ফারসাখ) উপরে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য ১০০ যোজন ; এর উত্তর থেকে দক্ষিণের প্রস্থ উপরোক্ত উচ্চতার সমান (অর্থাৎ ৩০ যোজন)।

লঙ্কা ও বাড়বমুখ দ্বীপেরই কারণে হিঁদুরা দক্ষিণ দিককে অশুভ বলে জ্ঞান করেন। আর এমন কোনো ধর্মকর্মও নেই যা দক্ষিণ দিকে মুখ করে করা হয় বা দক্ষিণ দিকে চলতে হয়। দক্ষিণের নাম কেবল অধর্মের কাজে ব্যবহৃত হয়...।

লঙ্কা ও লঙ্গবালুস সম্পর্কে লেখকের ধারণা

কোনো নাবিক যিনি এই স্থানের নিকটবর্তী কোনো সমুদ্র অতিক্রম করেছেন, যাকে লঙ্কা বলা হয় এবং এদিকে সমুদ্রযাত্রা করেছেন, এ ব্যাপারে এমন কোনো বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় না যা হিঁদুদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল খায় অথবা তার অনুরূপ হয়। বাস্তবিকই এমন কোনো ঐতিহ্যও নেই যার উপর ভিত্তি করে তার যথাসম্ভব দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে (যা হিঁদুদের বৃত্তান্তের অনুরূপ)। লঙ্কার নাম শুনে আমার মনে আরও কিছু জিনিসের কথা উঁকি দেয় যে লোক অথবা লঙ্গা যে দেশ থেকে আমদানি করা হয় তার নাম 'লঙ্কা'। সমস্ত নাবিকের সম্পর্কে একই কাহিনি, তাদের কথানুসারে যে জাহাজ এ দেশে প্রেরণ করা হয় তারা নিজেদের মালামাল জলযানগুলো থেকে খালাস করে, যেমন পশ্চিমি 'দেনার' এবং অন্যান্য প্রকারের পণ্যসামগ্রী, পাড়ওয়ালা ভারতীয় বস্ত্র, লবণ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সামগ্রী, এ সমস্ত মালামাল চামড়ার চাদর দিয়ে বেঁধে সমুদ্রতটে রেখে দেওয়া হতো। তারপর বণিকের স্ব-স্ব জাহাজে চলে যেত। তার পরদিন তারা এসে দেখত যে, তাদের চাদরগুলোর উপর লোকেদের ভিড় লেগে গেছে। লোকেদের এ ভিড় কখনো বা কম আবার কখনো বা বেশি হতো যা ছিল এরই প্রতীক যে, ঐ স্থানে অধিবাসীদের কাছে ঐ সমস্ত পণ্য উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছে।

যাদের সঙ্গে এই বাণিজ্য চলত কিছু লোক তাদেরকে রাক্ষস বলে অভিহিত করত আর কিছু বন্য জাতিগোষ্ঠীর। এসকল ক্ষেত্রে আশপাশে (লঙ্কায়) বসবাসরত হিঁদুদের বিশ্বাস যে, 'বসন্ত' নামে এক বায়ু আছে যা লঙ্কাদ্বীপ থেকে আত্মাদের

নিয়ে বয়ে যায়। এই বিশ্বাসানুসারে কিছু লোক বায়ু চলাচলের পূর্বেই জনসাধারণকে ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেয় এবং একথাও সঠিকভাবে বলতে পারে যে, তা কোন সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যাবে। যখন বসন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা তার কিছু লক্ষণ দেখে চিনতে পারে যে, তা বিষাক্ত কি না। বিষাক্ত বসন্ত-র জন্য তারা একটি চিকিৎসা-পদ্ধতিও অবলম্বন করে যা তাদের শরীরের কোনো-না-কোনো অঙ্গ হানি করে দেয় বটে কিন্তু মেরে ফেলতে পারে না। এরা লবঙ্গের সঙ্গে স্বর্ণভস্ম মিশিয়ে তাকে ঔষধি রূপে ব্যবহার করে, সেই সঙ্গে পুরুষেরা খেজুর গুটির মতো মালা তাদের গলায় পরিধান করে। যদি এ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তাহলে ন'জন মানুষের জীবন এই রোগের কবল থেকে রক্ষা পায়।

এ সবকিছু দেখেশুনে আমার মনে হয়, হিঁদুরা যে লঙ্কার উল্লেখ করে থাকে সে লঙ্কা দেশেই হয়ে থাকবে, যদিও এ সম্পর্কে তাদের দেওয়া বর্ণনা এর সঙ্গে মেলে না। এ সমস্ত কারণে এ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকেনি, কেননা, লোকেরা বলে, যদি কোনো লোক ভুলক্রমেও ঐ দ্বীপে চলে যায় তাহলে পরে তার আর নামনিশানা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার অনুমান, এই তথ্য থেকে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, রাম ও রামায়ণের[৩৫] কাহিনি অনুসারে, সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধুদেশের পিছনে মানুষ খেকো রাক্ষসরা বসবাস করে। অন্যদিকে, সমস্ত নাবিকের মধ্যেই একথা প্রচলিত আছে যে, নর-ভক্ষণের কারণে লঙ্গা-রাক্ষস দ্বীপের অধিবাসীরা খুবই হিংস্র ও পশুপ্রবৃত্তির হয়ে থাকে।

একত্রিংশৎ অধ্যায়

দ্রাঘিমাগত প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন দেশের পার্থক্য

হিঁদুদের দ্রাঘিমা নির্ধারণ করার পদ্ধতি

যে ব্যক্তি এ বিষয়ে পরিশুদ্ধি অবলম্বন করতে চায় তার উচিত যে, দু'স্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ ক্ষেত্রের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ধারণ করার দিকে মনোনিবেশ করা। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর গণনা মধ্যবর্তী কাল থেকে করেন যা দুই নির্ধারিত স্থানের মধ্যেকার পার্থক্য অনুরূপ এবং এ দু'স্থানের একদিক (পশ্চিম) থেকে গণনা শুরু করেন। ভূমধ্যবর্তী মিনিটের যে যোগ তারা বের করেন তাকেই এ দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের বলে অভিহিত করেন, কেননা, তাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক স্থানের দ্রাঘিমা মহাপরিমণ্ডল থেকে তা নির্ধারিত স্থানের পার্থক্য যা ভূমধ্য রেখার ধ্রুব হয়ে বেরিয়ে আসে আর যাকে দেশের সীমা বলে মান্য করা হয় আর এরই প্রথমে স্থান নির্ধারণের জন্য তারা Oikoumene-এর পশ্চিমি (পূর্বীয় নয়) সীমাকে নির্বাচিত করেন। এই মধ্যবর্তী সময়কে (প্রত্যেক নির্ধারিত স্থানের জন্য, তা সে সংখ্যা যাই হোক না কেন) দিনের মিনিট অথবা ফারসাখ অথবা যোজনেরই অনুরূপ পরিমণ্ডলের ৩৬০তম ভাগ মান্য করা হোক বা ৬০তম ভাগ হোক, এতে কোনো পার্থক্য থাকে না।

হিঁদুরা এ বিষয়ের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন তার ভিত্তি ঐ সিদ্ধান্ত যা আমাদের। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন তা সে যতটাই ভিন্ন হোক না কেন, একথা স্পষ্ট যে, তা থেকে কোনো সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। যেভাবে আমরা (মুসলমানরা) প্রতিটি স্থানের অবস্থান জানার জন্য তাদের দেশান্তরকে ভিত্তি বলে গ্রহণ করি। হিঁদুরা উজ্জৈন এর অবস্থান থেকে তারই দূরত্বকে যোজন হিসেবে ব্যবহার করেন। আর যে কোনো স্থান যত বেশি পশ্চিমাভিমুখী হবে তার যোজনের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকবে, আর যতটা পূর্বাভিমুখী হবে তার পার্থক্য ততটাই কমে যাবে। তারা একে দেশান্তর বলে অভিহিত করেন অর্থাৎ দু'স্থানের মধ্যেকার অন্তর বা পার্থক্য। এর অতিরিক্ত তারা দেশান্তরকে গ্রহের (সূর্যের) মধ্যে দৈনিক গতির সঙ্গে গুণ করে আর এই গুণফলকে তাঁরা ৪০০০ এ বিভক্ত করেন।

ঐ স্থিতিতে ভাগফল গ্রহের গতির ঐ মাত্রার দ্যোতক বলে মান্য করা হয় যা সম্পর্কিত যোজনগুলোর মাত্রার অনুরূপ হয় অর্থাৎ এ তাই নয় অর্থাৎ কোনো স্থান বিশেষের দেশান্তর অনুধাবনের জন্য যদি তাকে সূর্যের মধ্য স্থানে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা থেকে উজ্জৈন এর চাঁদ বা মধ্যরাত্রির অবস্থান জানা যাবে।

পৃথিবীর পরিধি

তারা যে সংখ্যার প্রয়োগ ভাজক (৪৮০০ যোজন)-এর রূপে করে তা পৃথিবীর পরিধির যোজন সম্পর্কিত সংখ্যা, কেননা, দু'স্থানে অবস্থানের বৃত্তের মধ্যেকার পার্থক্য পৃথিবীর সমস্ত পরিধির সঙ্গে সম্পর্কিত যা গ্রহের (সূর্যের) এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকের মধ্যম গতি পৃথিবীর চার দিকের সমস্ত পরিক্রমার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

[পুলিশ ও ব্রহ্মগুপ্তের পৃথিবীর পরিধি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সূক্ষ্ম পরীক্ষা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে দেশান্তর গণনার পদ্ধতির উপরেও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। আর্যভট্টের উজ্জৈন-এর অবস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের উপরেও আলোচনা করা হয়েছে। দ্র. অনুক্রমণিকা।]

উজ্জৈন-এর অক্ষাংশ

ইয়াকুব ইবনে তারিক তাঁর পুস্তক 'বৃত্তের পরিধি'-তে বলেছেন যে, উজ্জৈন-এর অক্ষাংশ ৪$\frac{৩}{৫}$ অংশ কিন্তু তিনি একথা স্পষ্ট করেননি যে, তা উত্তরে না দক্ষিণে, কোথায় অবস্থিত...।

কিন্তু অন্যদিকে হিঁদুদের সমস্ত গ্রন্থ এ সম্পর্কে একমত যে, উজ্জৈন-এর অক্ষাংশ ২৪ অংশ আর সূর্যের কর্কটক্রান্তির সময় এটিই হয় চরম বিন্দু। আমি নিজে লৌহর দুর্গের অক্ষাংশ ৩৪°১০ পেয়েছি...। অন্য অক্ষাংশ যা আমি নিজে দেখেছি তার বর্ণনা দিচ্ছি গজনা : ২৩°৩৫, কাবুল ৩৩°৪৭, কান্দী যা রাজার গারদ চৌকী ৩৩°৫৫, দুনপুর ৩৪°২০, পুরুষাবর ৩৪°৪৪, বাইহিন্দ ৩৪°৩০, জায়লাম ৩৩°২০, নন্দনাদুর্গ ৩২°০..। শিয়ালকোট ৩২°৫৮, মন্দক্ককোর ৩১°৫০, মুলতান ২৯°৪০...।

আমি নিজেও (আমার যাত্রাকালে) তাদের দেশের ঐ সমস্ত স্থানগুলোতে যাইনি যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি, আর আমি তাদের সাহিত্য থেকে (ভারতের স্থানগুলো) অন্য কোনো দেশান্তর ও অক্ষাংশ সম্পর্কে জানতে পারিনি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

সাধারণভাবে কাল ও স্থিতিকাল সম্পর্কিত ধারণা ও জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ

আল রাজী ও অন্যান্য দার্শনিকদের মতে সময়ের ধারণা

মুহম্মদ ইবনে আল জাকারিয়া আল রাজী[৩৫]-র বর্ণনানুসারে ইউনানিদের সবচেয়ে প্রাচীন দার্শনিকদের মতে পাঁচটি বস্তু অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান ছিল– স্রষ্টা, বিশ্বব্যাপী আত্মা, আদিতত্ত্ব, সাধারণ দেশ তথা সাধারণ কাল। এই তত্ত্বগুলোর উপর আল রাজী তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করেন যা তাঁর সমস্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। এছাড়া তিনি কাল ও মহাকালের (সময় ও দীর্ঘসময়) মধ্যেও পার্থক্য স্থাপন করেন। সে অনুসারে সংখ্যার সম্পর্ক মহাকালের সঙ্গে না হয়ে (সাধারণ কাল বা) সময়ের সঙ্গে হয়ে থাকে। তাঁর মতে, বস্তুর গণনা সম্ভব এবং তা সসীম কিন্তু মহাকাল অসীম। এভাবে দার্শনিকরা সময়কে মহাকালরূপে (কালাবধি) রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা, তা আদি ও অনন্ত দুই-ই হয় আর অনন্তকাল এমনই কালাবধি যার না আছে আদি আর না আছে অন্ত।

আল রাজীর মতানুসারে যে বিশ্ব বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে তার অস্তিত্বের জন্য এই পাঁচটি তত্ত্ব তার প্রধান ভিত্তি। এর কারণ এই যে, এ জগৎ-সংসারের ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত বস্তুই উপরোক্ত আদিতত্ত্বের পাঁচটি রূপের মিশ্রণে নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। এর অতিরিক্ত আদিতত্ত্বের কোনো স্থান হওয়া উচিত আর এজন্য আমাদের দেশের অস্তিত্বও স্বীকার করা উচিত। ইন্দ্রিয়গোচর জগতে যা কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা আমাদের কালের অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য করে, কেননা, তা থেকে কিছু প্রথমে, কিছু পরে এবং প্রথম ও পরে এবং অগ্র তথা পশ্চাৎ এবং সমকালিক– এ সমস্ত কিছুকে যে মাধ্যম থেকে অবগত হওয়া যায় তা হলো কাল আর এই কালই বর্তমান বিশ্বের অত্যাবশ্যকীয় ভিত্তি।

এরপর আমরা দেখি যে, বর্তমান জগৎ-সংসারে প্রাণীকুলের অস্তিত্ব রয়েছে আর তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করা উচিত। এই

জীবধারীদের মধ্যে কিছু প্রাণী আছে যা কলাবিদ্যাকে তার চরমোৎকর্ষে পৌছে দিতে সক্ষম আর তা দেখে আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে যাই, যিনি প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমানও।

যিনি সমস্ত বস্তুকে স্থাপনই করেননি ; বরং তাকে শ্রেষ্ঠ ঢঙে সুব্যবস্থিতও করেছেন আর মানুষকে বুদ্ধিবলে নিজের মুক্তি সাধনের জন্য অনুপ্রাণিতও করছেন।

অন্যদিকে, কিছু কুতর্কী (তথা কুচক্রী) অনন্তকাল ও কাল– এ দুই কালকেই একই বলে মনে করে এবং এ কথা ঘোষণা করে যে, কেবল গতিই, যা কালের পরিমাপের একমাত্র সাধন তা সসীম।

অন্য এক কুতর্কী বলে থাকে যে, বৃত্তাকার গতিই অনন্ত কাল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঐ জীবধারীর (প্রাণীর) সঙ্গে গতির অটুট সম্পর্ক রয়েছে, যার কারণে তা গতিশীল হয় এবং তার স্বরূপ উদাত্ত, কেননা, তা শাশ্বত। আরও অগ্রসর হয়ে সে তার তর্ককে আরও বাড়িয়ে চলে আর গতিশীল প্রাণী থেকে তার প্রবর্তক পর্যন্ত পৌছায় আর প্রবর্তন শক্তি থেকে প্রবর্তক পর্যন্ত যা গতিহীন।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত খুবই সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট। যদি এমনটি না হতো তাহলে এ সম্পর্কে লোকেদের মত এ অবস্থা পর্যন্ত ভিন্ন হতো না যা কিছু লোকের মতে, কাল বলে কোনো বস্তুই নেই এবং অন্য কিছু লোক এ দাবি করে যে, কালের নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। এফ্রোডিসিয়াসবাসী আলেকজান্ডারের মতানুসারে অ্যারিস্টটল তাঁর পুস্তক 'ফুজিকে এক্রোসিস'-এ নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, 'সমস্ত বস্তুকে চালনাকারী একটি শক্তি (চালক) আছে।' আর এই বিষয়েই গালেনস বলেন যে, আমি কালের ধারণাকে অনুভব করতে পারিনি, তাকে প্রমাণ করা তো দূরের কথা।

কাল সম্পর্কে হিঁদু দার্শনিকদের ধারণা

এ বিষয়ে হিঁদুদের সিদ্ধান্ত বৈচারিক দৃষ্টিতে খুবই ত্রুটিপূর্ণ আর তার সমুচিত বিকাশও হতে পারেনি। বরাহমিহির তাঁর পুস্তক 'সংহিতা'র প্রারম্ভেই ঐ বিষয়ের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন, যা অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান, সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'প্রাচীন গ্রন্থসমূহে একথা বলা হয়েছে যে, আদিম যুগে সবচেয়ে প্রথম বস্তুটিই ছিল অন্ধকার, যা কালো রঙের সঙ্গে মিশ্রিত কোনো বর্ণ ছিল না ; বরং এক প্রকারের অনস্তিত্ব ছিল, শুয়ে থাকা কোনো ব্যক্তির অবস্থা যেমন থাকে। তারপর ঈশ্বর ব্রহ্মার জন্য গম্বুজরূপে এই জগৎ-সংসারকে সৃষ্টি করলেন। তিনি এর দুটি ভাগ সৃষ্টি করলেন, একটি উপরের, একটি নিচের আর তাতে সূর্য ও চন্দ্রকে স্থাপন করলেন।' কপিল বলেন, 'ঈশ্বর সর্বদাই বিদ্যমান এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জগৎ-

সংসার ও তার পদার্থ ও পিণ্ডও। তিনি জগৎ সৃষ্টির কারণ এবং তা স্বভাবের সূক্ষ্মতার কারণে ঐ জগতের স্থূল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।' কুম্বক বলেন, 'আদি তত্ত্ব হলো মহাভূত অর্থাৎ যৌগিক তত্ত্ব।' কেউ একথা বলেন যে, আদিতত্ত্ব হলো কাল, আর কারো মতে, 'প্রকৃত', আর কেউ মনে করেন, 'প্রকৃত নিয়ন্তা হলো আমাদের কর্মই।'

'বিষ্ণুধর্ম' নামক গ্রন্থে বজ্র মার্কণ্ডেয়কে বলছেন, 'কালের ব্যাপারে আমাকে বোঝাও,' এ কথা শুনে মার্কণ্ডেয় উত্তর দেন, 'কাল হলো আত্মপুরুষ' অর্থাৎ 'শ্বাস ও পুরুষ যার অর্থ হয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।' তারপরে তিনি তাকে কালখণ্ড ও তার গুণাবলি সম্পর্কে ঐ সমস্ত জিনিস বুঝিয়ে দিলেন যার নিরূপণ আমরা ঐ সম্পর্কিত অধ্যায়ে করেছি (অষ্টবিংশৎ অধ্যায়)।

হিঁদুরা কালাবধি বা প্রলম্বিত কালকে দুটি অবধিতে বিভক্ত করেছেন, এক গতির যাকে কাল বলে মান্য করা হয়েছে আর অন্যটি বিশ্রামের অবধি যা নিশ্চয় ঐ সাদৃশ্যের অনুসারে কেবল কাল্পনিক রীতিতে করা যেতে পারে, যা থেকে প্রথম অর্থাৎ গতির অবধির নিশ্চয়তা রয়েছে। হিঁদুদের বিশ্বাসানুসারে সৃষ্টিকর্তার অনন্ততার নির্ধারণ তো করা যেতে পারে, তাকে পরিমাপ করা যায় না কারণ তা অসীম। কিন্তু আমরা তা না বলে থাকতে পারি না যে, এমন কোনো বস্তুর কল্পনা করা খুবই কঠিন যা নির্ধারণ হতে পারে না কিন্তু 'পরিমাপণ' নয় আর এ সমস্ত চিন্তা খুবই কষ্টকল্পিত। আমরা এ বিষয়ে হিঁদুদের মতামত সম্পর্কে যা কিছু জানি, আমরা তাদের থেকে ততটাই বলব যা পাঠকের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে।

ব্রহ্মার দিবস সৃষ্টির অবধি, ব্রহ্মার রাত্রি সৃষ্টির অবধি

সৃষ্টি সম্পর্কে হিঁদুদের মধ্যে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে, তা মূলত লোকধারণা, আর যে কথা আমি পূর্বেই বলেছি তা হলো, তারা প্রকৃতিকে অনন্ত বলে মনে করে। কারণ এটাই যে, তারা 'সৃষ্টি' বা সৃজনকে 'অভাব থেকে ভাব' অর্থে গ্রহণ করে না। তাদের দৃষ্টিতে সৃজনের অর্থ কেবল এই যে, মাটির টুকরো থেকে কিছু তৈরি করা, তাতে নানা রকমের আকৃতি ও তার অঙ্গ তৈরি করা আর তার এমন রূপ প্রদান করা যার দ্বারা কোনো লক্ষ্য ও প্রয়োজন জ্ঞাত হতে পারত যা বস্তুত তার মধ্যেই নিহিত ছিল। এই কারণে তারা সৃষ্টির নির্মাতা শুধু রাক্ষস বা দেবতাকে কেন, মানুষকেও মানে যার সৃজন বা উদ্ভাবন অথবা তা এ কারণে হয় যে, তাদের কিছু বেশি দায়িত্ব নির্বাহ করতে হয় যা আরও অগ্রসর হয়ে সৃষ্টি বা সৃজনের জন্য লাভজনক সিদ্ধ হয় অথবা তারা ঈর্ষাকাতর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে গিয়ে নিজের হৃদয়াবেগকে শান্ত করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ তারা ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি এই প্রয়োজন থেকে মহর্ষিদের সৃষ্টি

করেছেন যে, মানবজাতি তা থেকে প্রাপ্তব্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও উপযোগী বস্তু থেকে লাভবান হতে পারে...।

এখানে এই সন্দর্ভে আমরা একটি কালাবধিকে পাচ্ছি, যেখানে মুসলমান লেখকরা হিন্দুদের অনুসরণ করে 'বিশ্ববর্ষ' কথাটি ব্যবহার করেন। লোকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত যে, তার আদি (শুরু) ও অন্তে (শেষে) সৃষ্টি ও বিনাশ সংঘটিত হয় এবং তা এক প্রকার নবনির্মাণই (বটে)। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ মতে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে, এ কালাবধি ব্রহ্মার দিনে আর ব্রহ্মার ক্রমিক রাত্রি, কেননা সৃষ্টি করা ব্রহ্মারই কাজ। এছাড়া অস্তিত্বে আসার ক্রিয়া হলো বস্তুর স্পন্দন যা নিজ থেকে অন্য বস্তু থেকে উৎপন্ন হয় আর এই স্পন্দনের সবচেয়ে স্পষ্ট কারণ হলো বায়ুমণ্ডলীর প্রেরক অর্থাৎ নক্ষত্র। আর এ নক্ষত্র যদি গতিশীল না হয় আর প্রত্যেক দিকে (= তাদের অবস্থিতি) নিজের আকার পরিবর্তন না করে তাহলে তারা নিজে নিচের জগতের উপর কোনো নিয়মিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ জন্য অস্তিত্বে আসা ব্রহ্মার দিবস পর্যন্ত সীমিত, কেননা, হিন্দুদের বিশ্বাসানুসারে ওরই ভিতরে নক্ষত্র পরিভ্রমণ করতে থাকে আর তাদের গ্রহ পূর্ব-স্থাপিত ক্রমানুসারে পরিক্রমা করে আর কালস্বরূপ অস্তিত্বে আসার প্রক্রিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠেই কোনো ব্যবধান ছাড়াই বিকশিত হয়ে যায়। এর বিপরীতে ব্রহ্মার রাত্রির সময় গ্রহ চলে না, বিশ্রাম করে আর সমস্ত নক্ষত্র আর তার নিচের বিন্দু তথা পাত একই স্থানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরিণামস্বরূপ, পৃথিবীর কর্মকাণ্ড একই পরিবর্তনশীল অবস্থায় বিরাজ করে আর এজন্য অস্তিত্বে আসার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেছে, কেননা, যার দ্বারা বস্তু নিয়ে অস্তিত্বে আসত তা বিশ্রামরত থাকে। অতএব, করা এবং করে যাওয়া– দুই প্রক্রিয়াই স্থগিত হয়ে যায়, তত্ত্বের নতুন আকারে রূপান্তরকরণ থেমে যায়, কেননা, তখন তারা (রিক্তি-সম্ভবত রাত্রি)-তে বিশ্রামরত থাকে আর নতুন জীবে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে থাকে যা ব্রহ্মার পরবর্তী দিবসের অস্তিত্বে আগমন করবে।

এই ধরনের অস্তিত্ব ব্রহ্মার জীবনের সময়েই পরিচালিত হতে থাকে আর এ এমন বিষয় যার প্রতিপাদন আমরা উপযুক্ত স্থানে করব।

লেখকের আলোচনাত্মক টিপ্পনী

হিন্দুদের এই সমস্ত ধারণানুসারে সৃষ্টি ও বিনাশের সম্পর্ক কেবল ধরা-পৃষ্ঠের সঙ্গেই সম্পর্কিত। এই প্রকারের সৃষ্টি থেকে তো মাটির একটি টুকরোও যা প্রথমে মজুদ ছিল না, তা অস্তিত্বে আসে না আর এ প্রকারে বিনাশ থেকে তো মাটির এক টুকরো যা প্রথম থেকেই মজুদ রয়েছে, নষ্ট হয় না। এ সর্বথা অসম্ভব যে, হিন্দুরা

যতদিন পর্যন্ত একথা মানতে থাকবে যে, প্রকৃতি অনন্তকাল থেকে চলে আসছে, সৃষ্টি সম্পর্কে এরকম ধারণা তারা কীভাবে বোধ করতে পারে।

ব্রহ্মার জাগরণ ও সুপ্তাবস্থা

হিঁদুরা, নিজেদের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত দুটি কালাবধি– ব্রহ্মার দিবস ও ব্রহ্মার রাত্রিকে ব্রহ্মার জাগ্রত ও সুপ্তাবস্থার প্রতীক বলে অভিহিত করে আর আমরা এ শব্দ দুটিকে অস্বীকার করি না, কেননা, তারা এমন বস্তুকে বোঝানোর চেষ্টা করে যা আদিও আবার অন্তও। এছাড়া ব্রহ্মার সমস্ত জীবন, যাতে এই অবধিতে সংসারে হার গতি ও বিশ্রামের ক্রম রয়েছে, তা কেবল অস্তিত্বের উপরেই প্রযুক্ত হয় অনস্তিত্বের উপরে নয়, কেননা, এ সময়ে মাটির টুকরোর অস্তিত্ব বর্তমান থাকে আর তা ছাড়া তার আকারও তৈরি থাকে। ব্রহ্মার জীবন ঐ প্রাণীর জন্য যা তার উপরে অবস্থিত অর্থাৎ পুরুষ (পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় দেখুন) কেবল একটি দিবস। যখন তার মৃত্যু হয়ে যায় তখন রাত্রির সময় সমস্ত যৌগিক ক্রিয়া বিঘটিত হয়ে যায় আর যৌগিকের বিলয়নের ফলস্বরূপ তা-ও স্থগিত হয়ে যায় যা তাকে (ব্রহ্মাকে) প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ রেখেছিল। এর অর্থ এই হয় যে, এই পুরুষের এবং তার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু আছে (শব্দত, তার সাধনসমূহে) তা তাদের সকলেরই বিশ্রাম।

ব্রহ্মার নিদ্রা সম্পর্কে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক ধারণা

সাধারণ কোনো মানুষ যখন এই বস্তুগুলোর বর্ণনা করে তখন ব্রহ্মার রাত্রিকে দিনের পরে রাখে আর যেহেতু পুরুষ মনুষ্যকেও বলে সেহেতু তার সঙ্গে ঘুমানো এবং জাগ্রতাবস্থাকেও জুড়ে দেয়। তারা তার নাসিকা গর্জনকে ধ্বংসের পরিণাম বলে মনে করে, যার পরিণাম হলো এই যে, এ সমস্ত বস্তুই একে-অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক নাশ করে আলাদা হয়ে যায় আর সেই বস্তু যা জীবিত থাকে তা তার মস্তক থেকে নিঃসরিত ঘামের মধ্যে ডুবে যায়। তারা এ রকমের আরও অনেক কিছুই গড়ে নেয় যাকে না মস্তিষ্ক স্বীকার করে আর না শ্রুতি (কান) তা শুনতে চায়।

এজন্য শিক্ষিত হিঁদু এ সমস্ত মতকে (ব্রহ্মার নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থা) স্বীকার করেন না, কেননা, তাঁরা নিদ্রার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাঁরা জানেন যে, শরীরে যত রকমে বিরোধী দ্রব্যের মিশ্রণ আছে তা বিশ্রামের জন্য নিদ্রা চায় আর তার প্রয়োজনের জন্য সেই সমস্ত বস্তু, যার প্রকৃতি চায় যে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা সময়মত বদলে যাওয়া উচিত। এজন্য নিরন্তর বিঘটনের ফলস্বরূপ শরীরের ভোজনের প্রয়োজন হয় যাতে ক্ষণিকতার কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া শক্তি পুনরায় ফিরে আসে। এর অতিরিক্ত তার প্রজাতিকে সুরক্ষার জন্য তার সহবাসের

প্রয়োজন হয়, কেননা, সহবাস করা না হলে তার প্রজাতি নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া শরীরের আরও অন্যান্য বস্তুরও প্রয়োজন হয়– তা যদিও মন্দ তা সত্ত্বেও তা প্রয়োজন– যদিও সাধারণ পদার্থের প্রয়োজন হয় না, আর তা নয় তার উপরেও, আর যার কোনো সাথি নেই।

জগতের বিনাশ (অন্ত) সম্পর্কে ধারণা

হিঁদুরা একথাও বলেন যে, বারোটি সূর্য একত্রিত হলে জগৎ-সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এ সূর্য মাসের ক্রমানুসারে নিজেকে প্রকাশ করে আর পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমস্ত আর্দ্রবস্তুকে শুকিয়ে নষ্ট করে দেয়। এছাড়া চারটি বর্ষার সংযোগে যা বর্ষের বিভিন্ন মৌসুমে নষ্ট করে দিয়ে যায় আর কিছুকে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যায়, তা পানিকে আকৃষ্ট করে তারপর তা বিলীন হয়ে যায়। অবশেষে জগৎ-সংসারের বিনাশের কারণ আলোর অভাব এবং অন্ধকারও অনস্তিত্বের কারণেও জগৎ ধ্বংস হতে পারে। এসবের এই পরিণামই হতে পারে যে, জগৎ-সংসার পরমাণুর রূপে বিলীন হয়ে বিকীর্ণ হয়ে যায়...।

আবু মা'শর কর্তৃক ভারতীয় সিদ্ধান্তসমূহের প্রয়োগ

এ সমস্ত উদাহরণের গবেষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জগৎ-সংসারের এই বিধ্বংস এক কল্প সমাপ্ত হওয়ার ফলে সংঘটিত হয় আর আবু মা'শর-এর এ সমস্ত সিদ্ধান্তও এরই উপরেই প্রতিষ্ঠিত যে, জল-প্রলয় (বন্যাজনিত ধ্বংসকাণ্ড) গ্রহসমূহের সংযোগের কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে, কেননা, বাস্তবে তা প্রতিটি চতুর্যুগের শেষে এবং প্রতিটি কলিযুগের শুরুতে মিলিত হয়। যদি এ যোগ পূর্ণ না হয় তাহলে জল-প্লাবনের বিনাশকারী শক্তিও অতটা প্রবল হতে পারবে না। যতই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের অন্বেষণ করে যাই ততই এ ধরনের সিদ্ধান্তের উপর অধিক প্রকাশ (প্রভাব) পড়ে যায় আর পাঠক এ সন্দর্ভে প্রযুক্ত সাধারণ ও পারিভাষিক শব্দাবলিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে।

আলনরশহরী কর্তৃক উদ্ধৃত বৌদ্ধদের ধারণা

আলনরশহরী এমন এক কথা উল্লেখ করেছেন যা বৌদ্ধদের বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত আর তাতেও এমনই মূর্খতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণা রয়েছে যা আমরা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। মেরু-পর্বতের চারদিকে চারটি জগৎ আছে যা বারবারই আবাদ ও বরবাদ হতে থাকে। কোনো লোক (জগৎ) তখনই মরুভূমি হয়ে যায় যখন সাতটি সূর্য তার উপর একের পর এক উদিত হয়ে তাকে উত্তপ্ত করে দেয়, যখন ফোয়ারার সমস্ত পানি শুকিয়ে যায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নি এতটা প্রবল হয়ে যায় যে,

তা ঐ জগৎকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ঐ লোক তখন আবার আবাদ হয়ে যায় যখন অগ্নি ওখান থেকে অন্য জগতে চলে যায় আর তার চলে যাওয়ার পরে ঐ জগতে এক প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস ঘটে যা বাদলমেঘের মতো বৃষ্টি বর্ষণ করে আর পরিণামে সে জগৎ সমুদ্রের মতো হয়ে যায়। তার ফেনা হতে শক্তি উৎপন্ন হয় যা আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত আর যখন শক্ত খোলক হয়ে মাটির নিচে চলে যায় তখন ওখান থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়। কিছু বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত যে, মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত জগৎ থেকে নির্মীয়মাণ জগতে আগমন-মাত্রই সংযোগ হয়ে যায়। যেহেতু সে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে দুঃখী হয়ে থাকে সেহেতু তার সিদ্ধান্ত থেকেই তার পত্নীর সৃষ্টি হয় আর এই দম্পতি থেকেই পরবর্তী প্রজন্ম শুরু হয়।

ত্রয়োস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

দিন বা রাত্রির বিভিন্ন প্রকার ও বিশেষত দিন ও রাত

দিন ও রাতের পরিভাষা

মুসলমান, হিঁদু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের সাধারণ প্রথানুসারে দিবস বা অহর্নিশের অর্থ সূর্যের ব্রহ্মাণ্ড (বিশ্ব) পরিক্রমায় যে সময় লাগে অর্থাৎ তা মহাপরিমণ্ডলের অর্ধ থেকে চলতে শুরু করে সেখানে তার প্রত্যাবর্তন। প্রকাশ থাকে যে, তা দুটি সমান ভাগে বিভক্ত : দিবস (অর্থাৎ সেই সময় যখন সূর্যকে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে দেখা যায়) আর রাত্রি (অর্থাৎ ঐ সময় যখন সূর্যকে দেখা যায় না)। তার দেখা দেওয়া বা না দেওয়ার সাপেক্ষ তথ্য আর তাতে যে অন্তর (পার্থক্য) পরিলক্ষিত হয় তা ক্ষিতিজসমূহের পার্থক্যেরই পরিণাম। একথা সর্বজনবিদিত যে, ভূমধ্য রেখার ক্ষিতিজ, যাকে হিঁদুরা 'অক্ষাংশবিহীন দেশ' বলে অভিহিত করে তা নিরূপিত স্থানের সমানান্তর বৃত্তকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করে। এরই কারণে সেখানে দিন ও রাত সাধারণত সমান হয়ে থাকে। কিন্তু সে ক্ষিতিজ যা সমানান্তর বৃত্তকে নিজের ধ্রুব থেকে অতিক্রম ছাড়াই বিভক্ত করে আর সমানান্তর বৃত্ত যত ছোট হবে তার বিষমতাও ততটাই বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সেখানকার দিন-রাত্রি সমান হয় না। এমনটি কেবল দুই সায়ণের সময়ই হয়ে থাকে যখন মেরু ও বাড়বমুখ ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর দিন ও রাত সমান হয়। রেখার এ বিশিষ্টতা তার উত্তর ও দক্ষিণের সমস্ত স্থানেই পাওয়া যায় কিন্তু কেবল এই সময়েই, অন্য সময়ে নয়।

মনুষ্যাহোরাত্র (মানুষের অহোরাত্র)

দিনের শুরু সূর্যের ক্ষিতিজ হতে উদয় হওয়া আর রাতের শুরু তার ক্ষিতিজ থেকে নিচে লুক্কায়িত হওয়া। হিঁদুরা দিনকে অহর্নিশের প্রথম রাতের দ্বিতীয় ভাগ বলে মনে করে। কারণ এটাই যে, তারা প্রথমকে 'সাওন' অর্থাৎ সূর্যের উদয়ের উপর আশ্রিত দিন বলে অভিহিত করে। এছাড়া তারা একে 'মনুষ্যাহোরাত্র' অর্থাৎ

মানবদিবস বলেও অভিহিত করে, কেননা, বাস্তবিকতা হলো এই যে, তাদের অধিকাংশ লোক এছাড়া আর কোনো দিনকে জানে না। অতএব, একথা স্বীকার করে যে, 'সাওন' কথাটা সবাই বোঝেন। আমরা নিচে একেই মানদণ্ড ও পরিমাপ স্বীকার করে নিয়ে প্রয়োগ করব যাতে তার মাধ্যমে অন্য সমস্ত কর্মের দিন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

[আল বিরুনী 'অন্য প্রকারের দিনসমূহ'-এর বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনাগুলো থেকে কিছু নির্বাচিত উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।]

মানব-দিবসের পরে 'পিতৃনামাহোরাত্র' অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের অহর্নিশ রয়েছে, যাদের আত্মাদের সম্পর্কে হিঁদুদের বিশ্বাস যে, তারা চন্দ্রগ্রহে বসবাস করে। তার দিন-রাত কোনো ক্ষিতিজ-বিশেষে সূর্যের উদয় বা অস্ত হওয়ার উপরে নয় ; বরং আলো ও অন্ধকারের উপর নির্ভরশীল থাকে। যখন চন্দ্র তার সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রহসমূহের সর্বোচ্চ অংশে অবস্থান করে তখন তাদের জন্য দিন হয় আর যখন তা নিম্নতম অংশে হয় তখন তাদের জন্য রাত হয়ে যায়। স্পষ্ট যে, তাদের চাঁদের যোগ পূর্ণিমার সময়ে হয় আর তাদের মধ্যরাত্রি এর বিরুদ্ধে অর্থাৎ অমাবস্যায় হয়। এজন্য পূর্বপুরুষদের 'অহর্নিশ' পূর্ণ চান্দ্রমাস হয়, যার দিন অর্ধচন্দ্রের সময় থেকে শুরু হয় আর রাত্রি অর্ধচন্দ্রের ঐ সময় শুরু হয় যখন তা প্রকাশমান হতে শুরু করে...।

দেবতাদের দিবস

তারপর আসে 'দিব্যাহোরাত্র' অর্থাৎ দেবতাদের অহর্নিশ বা দিনরাত্রি। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সবচেয়ে বড় অক্ষাংশের ক্ষিতিজ, অর্থাৎ ৯০° যেখানে ধ্রুব নিজের সর্বোচ্চ স্থানে হয়, ভূমধ্য রেখা যা সঠিক তো নয়ই কিন্তু অনুমানিত হয়, কেননা, তা পৃথিবীর ঐ স্থান থেকে যার উপর মেরুপর্বত দৃশ্যত ক্ষিতিজ থেকে কিছু নিচে। যেখানে মেরু-পর্বতের উপরিভাগ ও তার ঢালের সম্পর্ক সেখানে সম্বন্ধ ক্ষিতিজ ও ভূমধ্য রেখা দুই-ই সর্বথা সমান যদিও দৃশ্যত ক্ষিতিজ তা থেকে কিছুটা নিচে (অর্থাৎ সুদূর দক্ষিণে) অবস্থিত। একথাও স্পষ্ট যে, রাশিচক্র ভূমধ্য রেখা দ্বারা কেটে যাওয়ার ফলে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যার অর্ধেকাংশ ভূমধ্য রেখার উপরে (অর্থাৎ তার উপরে) থাকে আর অন্য অর্ধাংশ তার নিচে। যতক্ষণ যাবৎ সূর্য উত্তরী উপক্রমের রাশিদের দিকে অগ্রসর হয় তখন তা ঘূর্ণির মতো পঁই পঁই করে ঘুরতে থাকে, কেননা, সে যে দৈনিক বৃত্তাংশ তৈরি করে তা ঐ প্রকার ক্ষিতিজ-এর সমানান্তর হয় যেমনটি সূর্যঘড়িতে হয়। ঐ সমস্ত লোকেদের জন্য যা উত্তর ধ্রুবের নিচে থাকে, সূর্য ক্ষিতিজ-এর উপরে দেখা যায় এবং এজন্য তাদের ওখানে (তখন) দিন হয়। কিন্তু তাদের জন্য যা দক্ষিণী ধ্রুব-এর নিচে থাকে, সূর্য

ক্ষিতিজের নিচে লুকিয়ে থাকে আর সেজন্য তাদের ওখানে রাত হয়। তারপরে যখন সূর্য দক্ষিণ রাশির দিকে প্রস্থান করে যখন তা ক্ষিতিজের নিচে ঘূর্ণির মতো পঁই পঁই করে ঘুরতে ঘুরতে পরিক্রমা করে (অর্থাৎ ভূমধ্যরেখার নিচে বসবাসরত লোকদের জন্য রাত হয় আর উত্তরী-ধ্রুব-এর নিচে বসবাসকারীদের জন্য দিন)।

দেবক অর্থাৎ অশরীরী প্রাণীরা দুই ধ্রুব-এর নিচে বসবাস করে এজন্য এ ধরনের দিন তাদের উপরেই আপতিত হয়, সেজন্য তাদের নামানুসারে তার নাম হয়েছে দেবতাদের অহর্নিশ।

কুসুমপুরার আর্যভট্টের মতানুসারে, দেবতারা সৌরবর্ষের কেবল অর্ধভাগই দেখতে পায় এবং দানব ও অন্যান্যরা অর্ধেক, এই রকমই পিতৃপুরুষেরা চান্দ্রমাসে অর্ধেকাংশ দেখতে পায় আর মানুষ তার অর্ধেক। এভাবে সূর্যের রাশিচক্রে এক পরিক্রমা থেকে দেবতা ও দানবরা দিন ও রাত্রি লাভ করে আর তাদের সমস্ত রূপই হলো অহর্নিশ।

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বর্ষ দেবতাদের অহর্নিশিরই সমান। কিন্তু এতে দিন ও রাত সমান হবে না। যেমনটি পিতৃপুরুষদের অহর্নিশ-এ হয়। কেননা, সূর্য তার অবস্থানের আশপাশে উত্তরায়ণের অর্ধেকভাগে ধীরে ধীরে চলে যে কারণে দিন কিছুটা লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু এ পার্থক্য ঐ পার্থক্যের সমকক্ষ হয় না, কেননা, একে ভূ-গোলকে দেখা যায় না। এছাড়া হিঁদুদের ধারণানুসারে ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা ধরাতল থেকে উপরে উঠে গিয়ে পাহাড়ের উপরে বসবাস করে। যা সম্পর্কে কিছু লোকের মত এবং তারা মেরুর উচ্চতা প্রসঙ্গে এ বিশ্বাসও পোষণ করে, যা আমরা উপযুক্ত স্থানে (ত্রয়োবিংশৎ অধ্যায়) আলোচনা করেছি। মেরু পর্বতের এই উচ্চতার ফলস্বরূপ তার নিরক্ষরেখার কিছু নিচে হওয়া উচিত (অর্থাৎ ভূমধ্য রেখা থেকে দক্ষিণ দিকে) এবং সে কারণে রাতের চেয়ে দিনের লম্বা হওয়ার গতি কম হয়ে যাওয়া উচিত (কেননা, এমতাবস্থায় সূর্য তার উত্তরী অবস্থান পর্যন্ত পুরোটা পৌছাতে পাচ্ছে না, যেখানে পৌছে দিন সবচেয়ে লম্বা হয়ে যায়)। এ যদি হিঁদুদের ঐতিহ্যমত ধর্মীয় বিশ্বাস না হতো এবং তা এ এমনই যে বিষয়ে তারা একমত হয় না, অতএব, আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পরিকলনের দ্বারা একথা জানার প্রয়াস চালাই যে, ভূমধ্য রেখার নিচে মেরু পর্বতের নিরক্ষরেখা কতটা নিচে আছে কিন্তু যেহেতু এ বিষয়ে এ প্রকারের অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই (কেননা, মেরু পর্বত স্বকপোলকল্পনা), সেজন্য আমরা এ প্রসঙ্গ এখানেই ত্যাগ করছি...।

ব্রহ্মার দিন

এর পরে আসে 'ব্রহ্মাহোরাত্র'-এর কথা অর্থাৎ ব্রহ্মার অহর্নিশ। এ আলো ও অন্ধকার থেকে সৃষ্ট হয় না, যেমনটি পিতৃপুরুষ থেকে তৈরি হয়। তা নয় কোনো

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দেখা দেওয়ার সঙ্গে বা গুপ্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত (যেমনটি দেবতাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে) ; বরং সৃষ্টির ভৌতিক স্বরূপের কারণে হয় যার ফলস্বরূপ তা দিনের দিকে চলতে থাকে আর রাতের বেলায় বিশ্রাম করে। ব্রহ্মা অহর্নিশির দৈর্ঘ্য ৮,৬৪০,০০০,০০০ বর্ষ হয়ে থাকে। এর অর্ধেক ভাগের সময়ে অর্থাৎ দিনের সময়ে ঈশ্বর তাদের সবার সঙ্গে যিনি সেখানে নিহিত, চলতে থাকেন, পৃথিবী সৃষ্টি করতে থাকেন, আর পৃথিবী পৃষ্ঠে অস্তিত্ব ও বিনাশে পরিবর্তন নিরন্তর হতে থাকে। অন্য অর্ধেক ভাগের সময় অর্থাৎ রাতে তার সবেরই বিপরীত হয় যা দিনের বেলায় হয়, পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন আসে না, কেননা, এ তত্ত্ব যা পরিবর্তন আনে তা বিশ্রামে রত থাকে আর সমস্ত গতিবিধি থেমে যায়, কেননা, প্রকৃতি রাতে এবং ঠাণ্ডায় আরাম করে আর দিনের সময় অর্থাৎ গরমে অস্তিত্ব তৈরিতে নিমগ্ন থাকে।

ব্রহ্মার প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত একটি কল্প হয় আর কল্প বলতে কাল বোঝায়, যাকে মুসলমানরা 'সিন্দহিন্দ' বছর বলে অভিহিত করেন।

পুরুষের দিন

সবশেষে আসে 'পুরুষাহোরাত্র' অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই অহর্নিশ, যাকে মহাকল্পও বলা হয়। হিঁদুরা এর প্রয়োগ সাধারণ কাল নির্ণয়ের জন্য বা সময় সম্পর্কে কিছু জানার জন্য করে থাকেন কিন্তু একে দিন ও রাতের রূপে প্রস্তুত করে না। আমার মন তো এ কথাটি বলে যে, এ অহর্নিশের দিনের অর্থ ঐ অবধি যা আত্মার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেখানে রাতের অর্থ ঐ অবধি যেখানে তারা একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যায় আর যেখানে আত্মাসমূহ (আদিতত্ত্বের সঙ্গে মিলনের পরে প্রাপ্ত শ্রান্তির পরে) বিশ্রাম করে আর তা ঐ দশা যা আত্মাকে আদিতত্ত্বের সঙ্গে মিলন অত্যাবশ্যক করে তোলে অথবা তাকে তা থেকে পৃথক করে যা অহর্নিশের অন্তে নিজের সময়-সীমায় পৌঁছে যায়। 'বিষ্ণুধর্ম'-এ বলা হয়েছে ; 'ব্রহ্মার জীবন পুরুষের দিন আর পুরুষের রাতের দৈর্ঘ্যও তাই'...।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়
অহর্নিশের সময়কে লঘু কণায় বিভাজন

ঘটি

হিঁদুরা সময়ের লঘুতম কণার অন্বেষণে মূর্খতার চরম সীমা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করেছে কিন্তু তাদের এ প্রয়াস থেকে সর্বজনমান্য কোনো সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এর বিপরীতে আপনি এমন দুই ব্যক্তি এবং এমন দুই গ্রন্থ খুঁজে পাবেন না যারা এ বিষয়ে একমত বা একই কথা বলেছেন। প্রথম কথা তো এটাই যে, অহর্নিশকে ষাট মিনিট বা 'ঘটি'তে ভাগ করা হয়েছে...।

চষক

প্রত্যেক মিনিটকে ষাট সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে যাকে 'চষক' বা 'চখক' ও 'বিঘটিকা'ও বলা হয়।

প্রাণ

প্রত্যেক সেকেন্ডকে ছ'টি ভাগ বা 'প্রাণ'-অর্থাৎ শ্বাস-এ বিভক্ত করা হয়েছে...।

তা সে এ নিয়মানুসারে 'প্রাণ' নিশ্চিত করি (এক অহর্নিশ ২১,৬০০ প্রাণ) অথবা যদি আমরা প্রত্যেক ঘটিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করি (৬০ × ৩৬০ = ২১,৬০০), অথবা গ্রহের প্রত্যেক অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয় তা হলে (৩৬০ × ৬০ = ২১,৬০০), একই হয়।

বিনাড়ি বা ঘটিকার আর এক নাম

এ পর্যন্ত তো হিঁদুরা এ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সমমত পোষণ করে, যদিও এ বিষয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে...।

ক্ষণ

কিছু লোক এমন আছে যারা মিনিট ও সেকেন্ডের মধ্যে আরও একটি মান 'ক্ষণ'ও রাখে, যা মিনিটের এক-চতুর্থাংশ (বা ১৫ সেকেন্ড)-এর সমতুল হয়। প্রত্যেক

ক্ষণকে ১৫ কলায় বিভক্ত করা হয় যাতে প্রত্যেক মিনিটের জত(১,৬০) ভাগের সমতুল, আর এর আরেক নাম হলো 'চষক'।

নিমেষ, লব, ক্রুটি

সময়ের এই খণ্ডসমূহের নিম্নলিখিত ক্রমে আরও তিনটি নাম আসে যাকে একই ক্রমে রাখা হয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো 'নিমেষ' যার অর্থ ঐ সময় যার মধ্যে চোখ খুব সামান্যতম সময়ের মধ্যে পলক ফেলে। 'লব' মধ্যের আর 'ক্রুটি' সময়ের সবচেয়ে ছোট অংশ। 'ক্রুটি'র আক্ষরিক অর্থ হলো চুটকি বা তুড়ি বাজানো যা তারা এমন এক সংকেতের জন্য করে যা আশ্চর্য বা প্রশংসার দ্যোতক। এই তিন মানের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন। অনেক হিঁদুর মতে–

২ ক্রুটি = ১ লব
২ লব = ১ নিমেষ।

এছাড়া তাতে 'নিমেষ' ও সময়-খণ্ডের পরবর্তী উচ্চক্রমের মধ্যেও ঘোর মতভেদ রয়েছে, কেননা, কারো মতে, 'কাষ্ঠা'য় পনেরো নিমেষ হয়, আবার কেউ ত্রিশ নিমেষ বলে মনে করে। আরও কিছু আছে যারা তিনটি মানের প্রত্যেককে অষ্টম ভাগে বিভক্ত করে যাতে–

৪ ক্রুটি = ১ লব
৪ লব = ১ নিমেষ
৪ নিমেষ = ১ কাটা (?)...

এই সমস্ত পদ্ধতি নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে :

সময়ের মানসমূহের নাম	ছোট ও বড়-তে কতবার আসে	এগুলোর মধ্যে থেকে একদিনে কতটা আসে
ঘটি, নাড়ি	৬০	৬০
ক্ষণ	৪	২৪০
চষক, বিনাডি, কলা	১৫	৩,৬০০
প্রাণ	৬	২১,৬০০
নিমেষ	৮	১,৭২,৮০০
লব	৮	১,৩৮২,৪০০
ক্রুটি	৮	১১,০৫৯,২০০
অণু	৮	৮৮,৪৭৩,৬০০

প্রহর

হিঁদুদের মধ্যে লৌকিকভাবে প্রচলিত এক অহর্নিশকে আটটি 'প্রহরে' বিভক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ হয় ঘড়িতে (২৪ মিনিটের কাল সময়) পরিবর্তন আর তাদের দেশের কিছু অংশে ঐ ঘড়ির প্রচলন আছে যাকে ঘটি অনুসারে মেলানো হয় আর ঐটি থেকেই আট ঘড়ি সময় নির্ধারণ করা হয়। যখন সাড়ে সাত ঘটি (বা ঘটিকা) পর্যন্ত চলমান ঘড়ি সমাপ্ত হয়ে তখন তারা ঢোল ও শাঁখ বাজায় যাকে ফারসিতে 'সফেদ মুহর' বলা হয়। আমি পুরশুর নামক নগরে এ দৃশ্য দেখেছি। ধর্মপরায়ণ লোকেরা এ সমস্ত জলঘড়ি ও তার ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পত্তি ও তা ব্যবসায়িক ভাবে ওসিয়ত (উইল) করে দিয়েছেন।

মুহূর্ত

এর আগে দিনকে ত্রিশ মুহূর্তে বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু এ বিভাজনও অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত নয়, কেননা, কখনো কখনো আপনার এমনও মনে হবে যে, মুহূর্তের দৈর্ঘ্য হামেশাই একই হয় কেননা, তার তুলনা তারা হয় ঘটি থেকে করে এবং বলে যে, দুই ঘটি পরস্পর এক মুহূর্তের সমান নতুবা তার তুলনা তারা প্রহরের সঙ্গে করে আর বলে যে, পৌনে এক মুহূর্তে চার প্রহর হয়। এখানে মুহূর্তকে এরকমই মনে করা হয়েছে যেমন তা horo oequinoctiales হয় অর্থাৎ অহর্নিশ এত-এত সমান ভাগ। কিন্তু দিন ও রাতের এই ঘণ্টাগুলোর সংখ্যা অক্ষাংশের প্রতিটি অংশে পরিবর্তিত হয়, আর একথা আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, মুহূর্তের দৈর্ঘ্য দিনের সময়ে কিছু হয় আর রাতের সময়ে আরও কিছু হয়...।

[মুহূর্তের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনীয় বা অপরিবর্তনীয় হওয়ার সম্পর্কে পুলিশের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। দ্র. টিপ্পনী।]

মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা

আমরা নিচের সারণিতে প্রত্যেক মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা নিয়ন্ত্রক-প্রধানদের তালিকা দিয়ে দিচ্ছি :

মুহূর্তের সংখ্যা	দিনের সময়ে মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা	রাতের সময়ে মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা
১.	শিব অর্থাৎ মহাদেব	রুদ্র অর্থাৎ মহাদেব
২.	ভূজঙ্গ অর্থাৎ সর্প	অজ অর্থাৎ সমস্ত চেরা-কাটা পা-ওয়ালা পশুদের প্রভু
৩.	মিত্র	অহিধুধন্য, উত্তর ভাদ্রপাদের প্রভু
৪.	পিতৃ	পুশন, রেবতীর স্বামী
৫.	বসু	দক্ষ, অশ্বিনীর স্বামী
৬.	অপস অর্থাৎ জল	অন্তক অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা
৭.	বিশ্ব	অগ্নি
৮.	বিরচি অর্থাৎ ব্রহ্মা	ধাতৃ অর্থাৎ ব্রহ্মা
৯.	কেশওয়ার (?) অর্থাৎ মহাদেব	সোম, মৃগশীর্ষের স্বামী
১০.	ইন্দ্রাগ্নি	গুরু
১১.	ইন্দ্র, রাজা	হরি অর্থাৎ নারায়ণ
১২.	নিশাকর অর্থাৎ চাঁদ	রবি অর্থাৎ সূর্য
১৩.	বরুণ অর্থাৎ বর্ষার দেবতা	যম, মৃত্যুর দেবতা
১৪.	আর্যমন	ত্বাষ্ট্রী, চিত্রের স্বামী
১৫.	ভাগেয় (?)	অনিল অর্থাৎ বায়ু

হিঁদু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ঘণ্টা

ভারতে ছাড়া জ্যোতিষীরা কোথাও ঘণ্টার প্রয়োগ করতেন না, তারা ঘণ্টার অধিষ্ঠাতাদের প্রসঙ্গে এ সবের উল্লেখ এবং সেই সঙ্গে আবার তাদের অধিষ্ঠাতাদের বর্ণনাও করেন। রাতের অধিষ্ঠাতাই অহর্নিশের অধিষ্ঠাতা, কেননা, জ্যোতিষীরা দিনের জন্য কোনো অধিষ্ঠাতার বিধান দেননি আর এ সম্পর্কে তারা তো রাতের নাম কখনোই মুখে আনতেন না। তারা অধিষ্ঠাতাদের ক্রম ঘণ্টা অনুসারে রাখেন।

তারা ঘণ্টাকে 'হোয়া' বলে অভিহিত করে আর এ নাম থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, বাস্তবে তারা horoe obliquoe temporales-এর প্রয়োগ করে, কেননা, হিঁদুরা রাশিসমূহের কেন্দ্রকে 'হোয়া' বলে অভিহিত করেন, যাকে আমরা মুসলমানরা বলি নীম বহর (দেখুন অশীতি অধ্যায়)। এর কারণ এই যে, প্রতিদিন এবং প্রতি রাতে কেবল ছ'টি রাশি ক্ষিতিজ-এর উপরে আসে। এজন্য যদি ঘণ্টাকে রাশি কেন্দ্রের নামে নামকরণ করা হয়, তাহলে প্রতি আর প্রতি রাতের ১২ ঘণ্টা হবে আর এর পরিণামে ঘণ্টার অধিষ্ঠাতাদের সিদ্ধান্তে যে (সমস্ত) ঘণ্টার

প্রয়োগ করা হয়েছে তা horoe obliquoe temporales-এর মতো আমাদের দেশে হয়ে থাকে আর তাদের এ সমস্ত অধিষ্ঠাতাদের কারণে তাকে বেধযন্ত্রের উপর অঙ্কিত করা হয়েছে...।

হিঁদুরা hore obliquoe-কে কিছু নামে অভিহিত করে যেগুলো আমি নিচের সারণিতে সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছি। আমার মতে, এ সমস্ত নাম 'শ্রুদ্ধব' নামক পুস্তক থেকে গৃহীত হয়ে থাকবে।

চব্বিশটি হোরোর নাম

হোরোর সংখ্যা	দিনে হোরোর নাম	শুভ বা অশুভ	তাদের রাতের নাম	শুভ বা অশুভ
১.	রৌদ্র	অশুভ	কালরাত্রি	অশুভ
২.	সৌম্য	শুভ	রোধিনী	শুভ
৩.	করাল	অশুভ	বৈরাহমা (?)	শুভ
৪.	সত্র	শুভ	ত্রাসনীয়	অশুভ
৫.	বেগ	শুভ	গুহানীয় (?)	শুভ
৬.	বিশাল	শুভ	মায়া	অশুভ
৭.	মৃত্যুসার	অশুভ	দমদীয় (?)	শুভ
৮.	সুস্থা	শুভ	জীবহরণী	অশুভ
৯.	ক্রোড়	শুভ	শোষিণী	অশুভ
১০.	চণ্ডাল	শুভ	বৃষ্ণি	শুভ
১১.	কৃত্তিকা	শুভ	দাহরীয় (?)	সর্বাধিক অশুভ
১২.	অমৃত	শুভ	চণ্ডিমা (?)	শুভ

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের মাস ও বর্ষ

চান্দ্রমাসের পরিভাষা

প্রাকৃতিক মাস ঐ অবধি বিস্তৃত যাতে চাঁদ তিথিগতভাবে পরিক্রমা করে। আমরা একে এজন্যই প্রাকৃতিক বলে অভিহিত করি, কেননা, এর বিকাশ ঐভাবেই হয়ে থাকে– যেমনটি অন্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেমন অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসে, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তারপর উপরে উঠতে থাকে, ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকে আর কমে যেতে থাকে, আর এই ক্রম শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে, অর্থাৎ যে অনস্তিত্ব অবস্থা থেকে সে উদ্ভূত হয়েছিল তা সেখানেই ফিরে যায়। এভাবে চাঁদ পিণ্ডরূপে দেখা যায়, তারপর নতুন চাঁদের রূপে (তৃতীয় রাতের পর) আর পূর্ণচন্দ্রের রূপে আর তারপর ঐ অবস্থা অতিক্রম করে রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অর্থাৎ সেই অনস্তিত্বের অবস্থায় আর এর সবকিছু মানবেন্দ্রিয়ের, গোচরেই সংঘটিত হয়। একথা তো সবাই জানেন যে, চাঁদ কিছু সময় পর্যন্ত অমাবস্যার মধ্যে কেন অবস্থান করে কিন্তু এ কথা ততটা সর্বজনমান্য নয় ; বরং শিক্ষিত লোকেরাও এ কথা জানে না যে, তা কিছু সময় পর্যন্ত কেন পূর্ণচন্দ্ররূপে অবস্থান করে। তাদের একথা অবগত হওয়া উচিত যে, চাঁদের পিণ্ড সূর্যের তুলনায় কত ক্ষুদ্র আর এই কারণেই তার আলোকিত অংশ অন্ধকারময় অংশ হতে কিছুটা বড় দেখায় আর এর এটাই কারণ যে, কিছু সময় পর্যন্ত পূর্ণচন্দ্ররূপে অবস্থান করা তার জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

চাঁদের প্রভাব

এ কথা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ও সমুদ্রপথে ভ্রমণকারীরা ভালোমতই জানেন যে, আর্দ্র-পদার্থের উপর চাঁদের কিছু প্রভাব পড়ে আর তার প্রভাব থেকে তারা বাঁচতেও পারে না। উদাহরণস্বরূপ, সময়ান্তরে ও চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার-ভাটা কখনো বা বৃদ্ধি পায় আবার কখনো বা কমে যায়। এভাবে বৈদ্যরা একথা জানতে পারে যে, রোগীর শরীরের তল পদার্থের উপর চাঁদের প্রভাব পড়ে

আর চাঁদের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ারও ফিরে-ফিরে আসে। ভৌত-বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা জানেন যে, পশু এবং বৃক্ষলতাদির জীবন চাঁদের উপর নির্ভরশীল আর গবেষণাকারীরাও একথা ভালোমতই অবগত যে, চাঁদ মজ্জা ও মস্তিষ্ক, অণ্ড ও বীর্য ও শারীরিক তরল-পদার্থ ও কামবাসনাকেও প্রভাবিত করে। এ তাদেরও প্রভাবিত ও উত্তেজিত করে যারা পূর্ণিমার রাতে নিদ্রা যায় আর তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কৃষক একথা জানে যে, কাঁকুড়, খরবুজা, কার্পাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে চাঁদের কী প্রভাব পড়ে আর ঐ কৃষকরাই যারা বিভিন্ন ধরনের বীজ বপন করে, রোপণ করে ও কলম কাটে তারা এর সমস্ত কিছুতেই চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে। সবশেষে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একথা জানেন যে, আবহাওয়া-বিজ্ঞান সম্পর্কিত ঘটনাবলি চাঁদের বিভিন্ন কলার উপর নির্ভরশীল, চাঁদ তার পরিক্রমার সময় অতিক্রম করে। একে মাস বলা হয়, আর তার সংখ্যা বারো হলে পারিভাষিক শব্দাবলিতে তাকে 'চান্দ্রবর্ষ' বলে।

সৌরমাস

প্রাকৃতিক বর্ষ সূর্যের পরিক্রমার ঐ দীর্ঘ অবধি যা ক্রান্তি-বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। আমরা একে এ কারণেই 'প্রাকৃতিক' বলি কেননা, জননপ্রক্রিয়ার সমস্ত ব্যাপারটাই এর অন্তর্গত যা বছরের চারটি ঋতুতে পরিক্রমা করে। এরই মধ্যে সূর্যের কিরণ জানালার কাচ ও সূর্যঘড়ির ছায়া অতিক্রম করে তার আকার অবস্থান ও দিশার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাতে বা যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। একে বর্ষ বলে আর একে 'চান্দ্রবর্ষ'-এর বিপরীতে 'সৌরবর্ষ' নাম দেওয়া হয়েছে। যে রকম চান্দ্রমাস চান্দ্রবর্ষের বারো ভাগের একভাগ তেমনি সেই সিদ্ধান্তমতে 'সৌরবর্ষে'র বারো ভাগের একভাগ হলো 'সৌরমাস' ; আর এর গণনা সূর্যের মধ্যে ঘূর্ণনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যদি এই গণনা তার বিবিধ ঘূর্ণনের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সৌরমাস সেই অবধি প্রলম্বিত হবে যেখানে সে রাশিচক্রের একটি গ্রহে অবস্থান করে।

দুটি প্রসিদ্ধ মাস ও বর্ষ হলো এরকমই।

চান্দ্র-সৌর গণনা

হিন্দুরা গ্রহ সম্মেলনকে অমাবস্যা, তার বিপরীত সম্মেলনকে পূর্ণিমা ও দুই চতুর্থাংশকে ATVH (?) বলে। তাদের মধ্যেকার কিছু লোক চান্দ্রদিন, চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষের প্রয়োগ (ব্যবহার) করে আর কিছু চান্দ্র ও সৌর দুটিকে মিলিয়ে ব্যবহার করে আর কেউ বা শুরু করে প্রত্যেক রাশির ০° থেকে। সূর্যের কোনো রাশিকে প্রবেশ করাকে তারা সংক্রান্তি বলে। কিন্তু চান্দ্র-সৌর গণনা কেবল আনুমানিক।

যদি তারা এগুলোকে অনবরত প্রয়োগ করতে থাকে তাহলে তারা সৌরবর্ষ ও সৌরমাসকেই অবলম্বন করতে বেশি পছন্দ করবে। এই মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে তারা লাভবানই হয়ে থাকে।

চান্দ্রমাসের শুরু

যারা চান্দ্রমাসের প্রয়োগ করে তারা অমাবস্যার সম্মেলন থেকে মাস শুরু করে আর এ হলো একটি প্রামাণ্য পদ্ধতি। আর অন্য মাসের শুরু তারা এর বিপরীত যোগ বা পূর্ণিমা থেকে করে...।

মাসকে দুই পক্ষ রূপে গণনা

মাসের দিনের গণনা অমাবস্যা থেকে শুরু করা হয় আর প্রথম চান্দ্র-দিবস brbd বলা হয় আর এর পরের গণনা পূর্ণিমা থেকে করা হয় (অর্থাৎ তারা দুবার পনেরো দিন গণনা করে, যা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়)। প্রত্যেক দুই দিনের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা থেকে যাদের দূরত্ব সমান তাদের নাম একই (বা সংখ্যা)। এ দুই দিনে চাঁদের পিণ্ডের ওপর যে আলো ও অন্ধকার পরিলক্ষিত হয় তা তার হ্রাস-বৃদ্ধির কালসমূহের অনুরূপ আর এক দিনে চাঁদের উদয় হওয়ার ঘণ্টা অন্য দিনে তার অস্ত যাওয়ার সমান হয়ে থাকে...।

বিভিন্ন প্রকারের মাস

যেমন দিন থেকে মাস হয় তেমনি যত প্রকারের দিন আছে তত প্রকারের মাসও আছে। প্রতিটি মাসের ত্রিশটি করে দিন আছে। আমরা এখানে ব্যবহারিক দিনগুলোকে মাস (দেখুন, সাওন : ত্রয়োস্ত্রিংশৎ অধ্যায়) হিসেবে ধরব...।

এক মাসে ৩০ চান্দ্র দিবস হয়, কেননা, এ হলো প্রামাণ্য সংখ্যা, সে অনুসারে বছরের দিনের প্রামাণ্য সংখ্যা হয় ৩৬০। সৌর মাসে ৩০ সৌরদিবস হয়ে থাকে। আর–

$$৩০ \frac{১, ৩৬২, ৯৮৭,}{৩, ১১০, ৪০০} \text{ ব্যবহারিক দিন...}$$

$$\text{সৌরবর্ষে } ৩৬৫ \frac{৮২৭,}{৩, ২০০} \text{ ব্যবহারিক দিন...।}$$

ষষ্ঠত্রিংশৎ অধ্যায়

সময়ের চারটি মাপ যাকে মান বলা হয়

'মান' ও 'প্রমাণ'-এর অর্থ হলো মাপ বা পরিমাপ। ইয়াকুব ইবনে তারিক তাঁর পুস্তক 'বিশ্বসৃষ্টি'-তে চার প্রকার মান-এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল না আর এছাড়াও নামের পরিচয়ও অশুদ্ধ, যদিও তা নকলনবিশের দোষ বলে প্রমাণ হয় না। নামগুলো এরকম :

'সৌর-মান' অর্থাৎ সূর্যসম্পর্কিত মাপ।

'সাওন-মান' অর্থাৎ সেই মাপ যা উদয়ের উপর নির্ভরশীল (ব্যবহারিক মান)। 'চান্দ্র-মান' অর্থাৎ চন্দ্রসম্পর্কিত মাপ। 'নাক্ষত্র-মান' অর্থাৎ চান্দ্রস্থানগুলোর মাপ (নাক্ষত্রমাপ)...।

সৌর-মান 'চান্দ্র-মান' ও 'সাওন-মান'-এর প্রয়োগ

সৌর-মানের প্রয়োগ ঐ সমস্ত বর্ষগুলোর জন্য করা হয় যা থেকে 'কল্প' সৃষ্টি হয় আর চতুর্যুগে চার যুগের প্রয়োগ জন্মপত্রী, সায়ন ও অয়নান্তের বর্ষসমূহ, বর্ষ বা ঋতুর ষষ্ঠ ভাগ ও অহর্নিশ-এ দিন ও রাত্রের পার্থক্যের জন্য করা হয়। এ সমস্ত বস্তুর গণনা সৌরবর্ষ, মাস ও দিবসের হিসেবে করা হয়।

'চান্দ্র-মান'-এর প্রয়োগ অধিমাসের নির্ধারণে (দেখুন, অধ্যায়-৭৮) এগারো 'করণ' এর গণনায়, ঊনরাত্রের (দেখুন, অধ্যায় ৯১) মোট দিন ও চন্দ্রগ্রহণ তথা সূর্যগ্রহণের জন্য এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যার গণনার জন্য করা হয়...।

'সাওন-মান'-এর প্রয়োগ 'বার' অর্থাৎ সপ্তাহের দিনসমূহ 'অহর্গণ' অর্থাৎ এক যুগের সর্বমোট দিনের সমান হয়, সমতুল্য (দেখুন, অধ্যায় ৯১), বিবাহ ও ব্রতের দিনসমূহের নির্ধারণ (দেখুন, অধ্যায় ৭৫)-এর জন্য, 'সূতক' অর্থাৎ প্রসূতির দিনসমূহের নির্ধারণ (দেখুন, অধ্যায় ৬৯)-এর জন্য, গৃহসমূহের দুর্গন্ধের দিনসমূহ এবং মৃতদের অতীত দিনসমূহের জন্য (দেখুন, অধ্যায় ৭২), 'চিকিৎসা' অর্থাৎ এমন কিছু মাস এবং বছর যাতে হিঁদু আয়ুর্বিজ্ঞানানুসারে কিছু ঔষধি পানের বিধান আছে, এরপর 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর নির্ধারণের জন্য অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের

দিনগুলোর জন্য, যে ব্রাহ্মণরা ঐ সমস্ত লোকেদের জন্য নির্ধারণ করে দেন যারা কিছু পাপ করেছে আর এগুলো সেই সমস্ত দিন যাতে তারা ব্রত পালন করে আর নিজের শরীরে মাখন তথা গোবর লেপন করা (দেখুন, অধ্যায় ৭১) অনিবার্য। এসব কর্মকাণ্ডের নির্ধারণ 'সাওন-মান'-এর অনুসারে করা হয়।

এর বিপরীতে তারা কোনকিছুর নির্ধারণ তার 'নাক্ষত্র-মান' এর অনুসারে করে না, কেননা, তাকে 'চান্দ্র-মান'-এর অন্তর্গত বলে মান্য বা গণ্য করা হয়েছে।

সময়ের যে কোনো মাপকে যে কোনো শ্রেণীর লোকেরা একমত হয়ে তা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করলে এবং মান্য করলে তাকে 'মান' বলা হয়। এমন কিছু দিনের উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (দেখুন, অধ্যায় ৩৩) করা হয়েছে। কিন্তু এ সব ছাড়াও যে চারটি 'মান' সর্বশ্রেষ্ঠ, তা এ অধ্যায়েই কেবল তারই মধ্যেই সীমিত করে দিলাম।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়
মাস ও বর্ষ ভাগ

'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিণায়ন'

যেহেতু সূর্যের ক্রান্তিবৃত্তের মতোই করা হয়। ক্রান্তিবৃত্তকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করা হয় আর সে বিভাজন দুই অয়নান্তিক বিন্দুর উপর নির্ভর করে। এর অনুরূপ বর্ষকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করা হয় যার প্রত্যেকটিকে 'অয়ন' বলা হয়।

সূর্য যখন দক্ষিণায়ন ত্যাগ করে তখন তা উত্তর-ধ্রুব অভিমুখে চলতে শুরু করে দেয়। এ জন্য বর্ষের এই ভাগ যা প্রায় অর্ধেকটা হয় তা উত্তরে থাকে আর তাকেই 'উত্তরায়ণ' বলে অর্থাৎ সূর্যের ছ'টি রাশি থেকে অতিক্রান্ত হওয়া অবধি–তা মকর থেকে শুরু হয়। স্পষ্টত, ক্রান্তিবৃত্তের এই অর্ধাংশ 'মকরাদি' অর্থাৎ যার প্রারম্ভ মকর থেকে হয় বলে কথিত।

সূর্য যখন উত্তরায়ণ ত্যাগ করে যখন তা দক্ষিণী-ধ্রুব অভিমুখে চলতে শুরু করে ; এ জন্য এর অন্য অর্ধাংশ দক্ষিণে থাকে, আর একেই 'দক্ষিণায়ন' বলা হয় অর্থাৎ সূর্যের ছয় রাশি অতিক্রমের শুরু হয় কর্কট রাশি থেকে। সেজন্য ক্রান্তিবৃত্তের এই অর্ধকে 'কর্কট' বলা হয় অর্থাৎ যার শুরু হয় 'কর্ক' বা কর্কট থেকে।

অশিক্ষিত লোকেরা কেবল এই দুই বিভাগ অথবা বর্ষার্ধ-এর প্রয়োগ করে, কেননা, দুই অয়নের কথা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভব।

'উত্তরকুল' ও 'দক্ষকুল'

প্রথমে ক্রান্তিবৃত্তকেও ভূমধ্য রেখা থেকে নিজের উপক্রমানুসারে দুভাগে বিভক্ত করা হয় আর এ বিভাজন অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত, যে সম্পর্কে জনসাধারণ পূর্বের চেয়ে কম অবগত, কেননা, এ গণনা অনুমান-নির্ভর। প্রত্যেক অর্ধকে 'কুল' বলা হয়। যার বিষুব-লম্ব উত্তরদিকে হয় আর তাকে 'উত্তরকুল' বা 'মেষাদি' বলা হয় অর্থাৎ তার প্রারম্ভ 'মেষ' থেকে হয় ; আর যার বিষুবলম্ব দক্ষিণদিকে হয় আর তাকে 'দক্ষকুল' বা 'তুলাদি' অর্থাৎ 'তুলা' রাশি থেকে শুরু বলে অভিহিত করা হয়।

ঋতুসমূহ

এর আগে কান্তিবৃত্ত এই দুই বিভাজনের দ্বারা চার ভাগে ভাগ করা হয় আর তারা এই অবধিকে যে সময়ে সূর্য তাকে অতিক্রম করে যায় তাকে 'ঋতু' বলে।– বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত ঋতু। এই অনুসারে রাশিসমূহকেও আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু হিঁদুরা বর্ষকে চার নয়, ছয় ভাগে ভাগ করে আর এই ছয় ভাগকে 'ঋতু' বলে। প্রত্যেক ঋতুতে দুই সৌরমাস হয় অর্থাৎ দুই ক্রমিক রাশি থেকে অতিক্রমণের সময়।

আমার জানা আছে যে, সোমনাথ প্রদেশের লোকেরা বর্ষকে তিন ভাগে বিভক্ত করে, যা থেকে প্রত্যেকটা ঋতু হয় চার মাসের ; প্রথম 'বর্ষাকাল' যা আষাঢ় মাস থেকে শুরু হয় ; দ্বিতীয় 'শীতকাল' আর তৃতীয় হলো উষ্ণ বা 'গ্রীষ্মকাল'...। মাসকে অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা আর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত দুই পক্ষে বিভক্ত করা হয়।

অষ্টাত্রিংশৎ অধ্যায়
সময়ের বিভিন্ন পরিমাণ যাতে দিবস ও ব্রহ্মার আয়ুও অন্তর্ভুক্ত

সময়ের ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণের সার-কথা

প্রাচীন ভাষায় দিনকে 'দিমস' (দিমসু) বা দিবস আর রাতকে 'রাত্রি' ও অহর্নিশকে 'অহোরাত্র' বলা হয়। মাসকে 'মাস' আর তার অর্ধ-ভাগকে 'পক্ষ' বলা হয়। প্রথমটিকে শ্বেত অর্ধ বা 'শুক্লপক্ষ' বলা হয়, কেননা, ঐ রাতগুলোর প্রথম প্রহরে লোকেরা যখনো না ঘুমায় এবং চাঁদনি থাকে আর ঐ সময়ে চাঁদের পিণ্ডের আলোকিত অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর অন্ধকার কমতে থাকে। দ্বিতীয় বা কালো অর্ধকে 'কৃষ্ণপক্ষ' বলে, কেননা, ঐ রাতগুলোর প্রথম প্রহরগুলোতে চাঁদ দেখা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরে চাঁদের আলো দেখা যায় কিন্তু তা তখনই হতে থাকে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে। এ সেই সমস্ত রাতগুলোতে সংঘটিত হয় যখন চাঁদের প্রকাশ কমে যেতে থাকে আর অন্ধকার বাড়তে থাকে।

দু'মাসের সমষ্টি হয় 'ঋতু' কিন্তু তা আনুমানিক পরিভাষা, কেননা, যে মাসের দুটি পক্ষ হয়, তা হয় চান্দ্রমাস, আর সে মাসের দ্বিগুণ সমষ্টিতে বলা হয় 'ঋতু', আর তা সৌরমাসও বটে।

ছয় ঋতুতে একটি মানববর্ষ হয়, যা সৌরবর্ষও বটে, আর যাকে 'বর্হ' বা বর্খ' বা 'বর্ষ' বলা হয়, এ তিন হ, খ ও ষ এমন ধ্বনি যা হিঁদুদের মুখে পড়ে বিকৃত হয়ে যায় (সংস্কৃত–বর্ষ)।

মানুষের ৩৬০ বছরে দেবতাদের এক বছর হয় যাকে 'দিব্ব বর্হ' (দিব্য বর্ষ) বলা হয় আর দেবতাদের ১২,০০০ বছরকে সর্বসম্মতিক্রমে 'চতুর্যুগ' বলে মান্য করা হয়। মতভেদ কেবল চতুর্যুগের চারটি ভাগ ও তাদের গুণ সম্পর্কে রয়েছে, যা থেকে মন্বন্তর বা এক কল্প হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপযুক্ত স্থানে (দেখুন, অধ্যায়-৪১) করা হবে...।

উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়
সময়-পরিমাণ, যা ব্রহ্মার আয়ুর চেয়েও বড়

সময়ের সবচেয়ে বড় মানগুলোতে ক্রমহীনতা

যে সমস্ত কথা, যা একান্তই অব্যবস্থিত ও অযৌক্তিক বা এ গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর খণ্ডন, এ সমস্ত ব্যাপার আমাদের জন্য বড়ই অরুচিকর আর আমাদের কানও সে সমস্ত কথা শুনতে মোটেও অভ্যস্ত নয়। কিন্তু হিঁদুরা এমন মানুষ যারা তাদের নামগুলোর উল্লেখ করে এবং যেমনটি তারা মান্য করে তাদের সবার সঙ্গে দুই একজনেরই মাত্র সম্পর্কের প্রতি সংকেত দেওয়া হয়েছে। যখন তারা আলোচিত অধ্যায় যেমন প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তারা তাদের নামগুলোর পুনরুচ্চারণ করে, যা অনেক প্রাণীর নামের দ্যোতক, অনুমান করে তাদের বয়স নির্ধারণ করে এবং বড় বড় সংখ্যা সৃষ্টি করে এবং এসব বড় বড় সংখ্যাই তাদের অভীষ্ট আর তারা তা ইচ্ছামত ব্যবহার করে, আর যেখানে সংখ্যার প্রশ্ন, সেখানে তারা খুবই সহিষ্ণু হয় আর সে সংখ্যা সেখানে যেভাবে বসিয়ে দেওয়া হয় তা ঐভাবেই বসে থাকে। এছাড়া হিঁদুদের এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তারা একমত পোষণ করে, আর এ কারণেই আমরা তার প্রয়োগ করতে সংকোচ বোধ করি। এর বিপরীতে এসব কাল্পনিক সময়-মান সম্পর্কে এতটাই মতানৈক্য রয়েছে। যত দিনের বিভাজন নিয়ে এই মতানৈক্য, তা একটি প্রাণের চেয়েও কম।

['কল্প' ও 'ক্রুটি' দ্বারা নির্ধারিত সময়ের সবচেয়ে বড় মানের পরিকল্পনের উৎস সম্পর্কে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দেখুন, অধ্যায় ৭৪ ও ৭৫।]

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

সন্ধি, দুই কালান্তরের মধ্যে ব্যবধান ও সংযোগ

দুই সন্ধির ব্যাখ্যা

মূল 'সন্ধি' হলো দিন ও রাতের মধ্যেকার অন্তরাল অর্থাৎ প্রাতঃ– উষাকাল, যাকে 'সন্ধি উদয়' বলে আর সায়ং-উষাকাল, যাকে 'সন্ধি-অষ্টমান' বলে। হিংদুদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে ঐ সময়ে গোসল করা আবশ্যক, তারা ঐ সময়ে গোসল করে। এদের মধ্যে কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভুলবশত তা করতে না পারলে 'তৃতীয় সন্ধি'তে তা করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে যাদের সম্যক জ্ঞান আছে তারা দুয়ের অধিক কোনো 'সন্ধি' গণনা করে না...।

বর্ষার্ধের (বর্ষ + অর্ধের) সন্ধি ও অয়নের সঙ্গে তার মেলবন্ধ ; অন্য প্রকারের সন্ধি

সাধারণত দিবসের এ দুই সন্ধি ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ ও অন্য কিছু লোক আরও কিছু সন্ধিরও কল্পনা করে, তার না আছে ভিত্তি আর তা নয় কোনো প্রেক্ষণের পরিণাম ; বরং তার ভিত্তি কল্পনামাত্র। এজন্য তারা প্রত্যেক অয়নকে যাতে সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়, তারা সন্ধি বলে মনে করে (দেখুন, সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়), আর এ সন্ধি বাস্তবে তার শুরু হওয়ার প্রথম সাত দিনের সন্ধি হয়। এ বিষয়ে আমার মত যে, তা সম্পূর্ণতই সম্ভব অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত খুব পুরাতন বলে মনে হয় না ; বরং তা সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবন আর সিকান্দার বর্ষের ১৩০০ সন (= ৯৮৯ খ্রি.)-এর কাছাকাছি সময়ের সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকবে। আর হিংদুরাও তা অবগত হয়ে থাকবে যে, বাস্তবিক অয়নান্ত তার গণনার অয়নান্তের প্রথমেই হয়...।

এক চত্বারিংশৎ অধ্যায়
'কল্প' 'চতুর্যুগ' ইত্যাদি শব্দাবলির পরিভাষা ও একের দ্বারা অন্যের ব্যাখ্যা

চতুর্যুগ ও কল্পের মান

বারো হাজার দিব্য বর্ষের সময়কালে যা পূর্বেই বলা হয়েছে (দেখুন, পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়) এক চতুর্যুগ হয় আর ১০০ চতুর্যুগে এক কল্প হয়। এ এমন একটা কাল যার শুরু ও শেষে সাত গ্রহ ও তার নিচোচ্চ (নিচ + উচ্চ) ও পাত মেষের ০°-তে যোগ হয়। কল্পের দিনগুলোকে কল্প অহর্গণ বলা হয়, কেননা, 'অহ'-এর অর্থ দিন ও 'অর্গণ'-এর অর্থ হয় সূর্য। যেহেতু এ ব্যবসায়িক দিন হয় সেহেতু তাকে 'পৃথিবীর দিন'ও বলা হয়, কেননা, উদয়ের জন্য অক্ষরেখা থাকা আবশ্যক আর ক্ষিতিজ পৃথিবীর আবশ্যক লক্ষণগুলোর অন্যতম।

'কল্প অহর্গণ'-এরই নাম থেকে লোকে এক বিশেষ তিথি পর্যন্ত কোনো সময়ের দিনগুলোর সর্বমোট সংখ্যাকেও জানে।

আমাদের মুসলমান লেখকরা 'কল্প'-এর দিনগুলোকে 'সিন্দহিন্দের দিন' বা 'বিশ্বের দিন' বলে অভিহিত করেন এবং তার সংখ্যা, ১,৫৭৭,৯১৬,৪৫০,০০০ দিন (সাওন বা ব্যবহারিক দিন) বা ৪,৩২০,০০০,০০০ সৌরবর্ষ বা ৪,৪৫২,৭৭৫,০০০ চান্দ্রবর্ষ গণনা করেন...।

মন্বন্তর ও কল্পের মধ্যেকার সম্পর্ক

এক কল্পে ৭১ চতুর্যুগ হয়, যা এক মনু অর্থাৎ 'মন্বন্তর'-এর সমতুল হয় আর ১৪ মনুর সমতুল হয় ১ কল্প। যদি আপনি ৭১কে ১৪ গিয়ে গুণ করেন তাহলে গুণফল হবে ৯৯৪ চতুর্যুগ, যা ১৪ মন্বন্তরের সমান দীর্ঘ সময় আর শেষ ৬ চতুর্যুগ কল্পের শেষ পাদ পর্যন্ত হবে...।

আমি এ অধ্যায়ে যা কিছু বলেছি তার ভিত্তি হলো ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত আর এ সমস্ত যুক্তি তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

আর্যভট্ট জ্যেষ্ঠ, পুলিশ ও আর্যভট্ট কনিষ্ঠের সিদ্ধান্ত

জ্যেষ্ঠ আর্যভট্ট ও পুলিশের গণনানুসারে ৭২ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয় আর কল্প ১৪ মন্বন্তরের সমতুল হয় আর এতে কোনো সন্ধির সন্নিবেশ ঘটে না। এ জন্য তাঁদের গণনানুসারে এক কল্পে ১,০০৮ চতুর্যুগ হয় আর তার ১২,০,৯৬,০০০ দিব্য বর্ষ বা ৪,৩৫৪,৫৬০,০০০ মানববর্ষ হয়।

আমি আর্যভট্টের কোনো গ্রন্থ খুঁজে পাইনি। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছি তার ভিত্তি সেই উদাহরণ, যা ব্রহ্মগুপ্ত দিয়েছেন...।

কুসুমপুরা-নিবাসী আর্যভট্ট জ্যেষ্ঠ আর্যভট্টের সিদ্ধান্তের অনুসারী আর তিনি Al. ntf-এর উপর তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিখেছেন যে, '১,০০৮ চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক দিনের সমান। ৫০৪ চতুর্যুগের পূর্বার্ধকে 'উৎসপিণী' বলা হয় যার মধ্যে সূর্য উদয় হয় আর উত্তরার্ধকে 'অবসপিনী' বলা হয় যাতে সূর্য অস্ত যায়। এই কালের মধ্যবর্তী সময়কে 'সম' বলে, কেননা, এ দিনের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে আর এর দুই মুখকে 'দূরতম (?)' বলে।'

দ্বি-চত্বারিংশৎ অধ্যায়
চতুর্যুগকে যুগে বিভক্তিকরণ ও যুগ সম্পর্কে বিভিন্ন মত

'বিষ্ণুধর্ম' ব্রহ্মার মতানুসারে 'চতুর্যুগ'-এর চার ভাগ

'বিষ্ণুধর্ম' নামক গ্রন্থে লেখক বলেন, 'বারো শ' দিব্যবর্ষে এক 'যুগ' হয়, যাকে দিব্য বলা হয়। এর দ্বিগুণ হয় 'দ্বাপর', তিনগুণ 'ত্রেতা' ও চতুর্গুণ 'কৃত' (বা কলি)– এই চার যুগকে এক সঙ্গে চতুর্যুগ বলা হয়।

"একাত্তর চতুর্যুগে এক 'মন্বন্তর'-এর সমান সন্ধির সঙ্গে একটি 'কল্প' তৈরি হয়। ব্রহ্মার অহর্নিশ দুই কল্পের সমান হয় আর তার জীবৎকাল ১০০ বর্ষ বা পুরুষ, প্রথম মানব-এর একদিন হয়, যার আদি-অন্ত সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।"

[আলোচ্য বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্তের মত এবং তাঁর দ্বারা 'অরুচিকর' আলোচনার উল্লেখও করা হয়েছে। দ্র. টিপ্পনী ; আলোচনা সম্পর্কে আল বিরুনী টিপ্পনী দিয়েছেন যে :]

এখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর (আর্যভট্টের) প্রমাণ দিয়ে যা কিছু বলেছেন এবং যার সঙ্গে তিনি সহমতও পোষণ করেন, তা সর্বথায় ভিত্তিহীন ; কিন্তু এ তথ্য থেকে তাঁর নিবৃত্ত হওয়ার মূল কারণ আর্যভট্টের প্রতি তাঁর ঘৃণা, যাকে তিনি যাচ্ছে-তাই করে বলেছেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি আর্যভট্ট ও পুলিশের মনোভাবও একই রকম। এখানে ব্রহ্মগুপ্তের একটি উদাহরণ পেশ করছি, যেখানে তিনি বলেছেন যে, আর্যভট্ট Caput Draconis ও চাঁদের নিচোচ্চ বিন্দুর চক্রসমূহ হতে কিছু হ্রাস করে দিয়েছেন আর এভাবে গ্রহণের গণনাতেও অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত অভদ্রতার সঙ্গে আর্যভট্টের তুলনা ঐ কীটের সঙ্গে করেছেন, যে পোকা কীট খেয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে আর তিনি তাঁর কিছু বিশেষতত্ত্বের কথাও বলেছেন, যা তিনি নিজেই বোঝেন না আর তা অন্যকে বোঝাতেও অক্ষম...। তিনি আর্যভট্টের উদ্দেশে এ সমস্ত অপশব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন।

ত্রি-চত্বারিংশৎ অধ্যায়

চার যুগ ও ঐ সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা যার চতুর্থ যুগের অন্তে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

প্রাচীন ইউনানিদের মধ্যে পৃথিবী সম্পর্কে বিভিন্ন মত ছিল যা আমরা এখানে আলোচনার জন্য উদাহরণস্বরূপ পেশ করব।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

পৃথিবীর উপর যে সমস্ত বিপত্তি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপর এবং নিচে থেকে মাঝে মাঝে এসে থাকে তার স্বরূপ ও আয়োজন সদা-সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কয়েকবার এরকম কোনো স্বরূপ বা বিপর্যয় বা উভয় দৃষ্টিতেই এমন ভয়ংকর সব সংকট বা বিপর্যয় এসেছে যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না আর তা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস চালিয়েও কোনো লাভ ছিল না। এ সমস্ত বিপদাপদ কখনো আসে বন্যার রূপ ধরে, কখনো বা আসে ভূমিকম্পরূপে আর তা থেকে যে ধ্বংস সাধিত হয় তার পরিণামে কোথাও বা পৃথিবীপৃষ্ঠ খণ্ডিত হয়ে যায় আবার কখনো বা তার ভিতর থেকে আগ্নেয়গিরির লাভা, পাথর বা ছাইভস্ম বেরিয়ে এসে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় অথবা পৃথিবীর মাটি ধসে গিয়ে প্রচণ্ড তুফান আসে। এছাড়া সংক্রামক রোগব্যাধি, মহামারী ও এরকমের আরও অনেক বিপদাপদ এসে থাকে। পরিণামস্বরূপ, এক বিশাল ভূ-ভাগ জনমানবহীন প্রান্তরে পরিণত হয় ; কিন্তু কিছু কাল পরে যখন সে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্রম অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন তারা স্বদেশকে পুনর্গঠনের কাজে নেমে পড়ে এবং আবার নতুন করে জীবনে স্পন্দন শুরু হয়ে যায়। তারপর, বিভিন্ন রকমের লোক যারা বন্য জীবজন্তুদের ন্যায় পাহাড়-প্রান্তর ও অরণ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, তারা আবার একত্রিত হয়। তারা সেই শত্রুর বিরুদ্ধে তা সে বন্য জন্তু-জানোয়ার হোক অথবা মানুষ, একে-অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে সুখী-সুন্দর জীবন গঠনের কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সুখী, সভ্য ও সুন্দর জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে। এভাবে তাদের সংখ্যা অনবরত

বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু তারপর এমন এক সময় আসে যখন কুপ্রবৃত্তি, ক্রোধ ও ঈর্ষার ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের জীবনে আবার নেমে আসে অশান্তি, সে সুখের জীবন ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যায়।

কখনো কখনো কোনো কোনো জাতির বংশের শুরু এমন কোনো লোকের মাধ্যমে হতো যে সেই স্থানে এসে সর্বপ্রথম বসতি গড়ে তুলত অথবা কোনো কোনো কারণে একে অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দিত বা নিজেও প্রতিষ্ঠিত হতো এবং এভাবে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর স্মৃতিতে কেবল ঐ ব্যক্তিই জীবিত থাকত আর যে ছাড়া আর সমস্ত ব্যক্তির স্মৃতি কালের গর্ভে হারিয়ে যেত...।

চার যুগ সম্পর্কে হিঁদুদের ধারণাসমূহ

চতুর্যুগ সম্পর্কে ঐতিহ্যগতভাবে হিঁদুদের মধ্যে এরকম ধারণাই প্রচলিত রয়েছে, কেননা, তাদের মতানুসারে, আদিতে অর্থাৎ 'কৃতযুগ'-এর শুরুতে সর্বত্র সুখ-শান্তি, সুরক্ষা, উর্বরতা ও প্রাচুর্য ছিল, ছিল স্বাস্থ্য, ছিল শক্তি, বিপুল জ্ঞান ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ। এ যুগে পুণ্য চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল, আর ঐ সমস্ত যুগে সমস্ত প্রাণীই ৪০০০ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকত।

এর পরে সদগুণাবলির সংখ্যা কমে যেতে থাকে আর সে স্থানে তার বিপরীত ক্রিয়াকর্ম এতটাই প্রবেশ করে যে, 'ত্রেতা যুগ'-এর শুরু থেকে পুণ্যের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে পাপের তুলনায় তিন-চতুর্থাংশে গিয়ে পৌঁছায় আর এভাবে সুখ বা আনন্দের মাত্রাও এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পায়। ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কোথাও বেশি হয়ে যায় এবং জীবৎকালও অতটাই দীর্ঘায়িত হয় যতটা ছিল পূর্ববর্তী যুগে। 'বিষ্ণুধর্ম'-এ তো একথাই বলা হয়েছে যে, সাদৃশ্যানুসারে জীবন-সুখের মাত্রা ততটাই অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ কমে যাওয়া উচিত। এ যুগে আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য তারা জীবন-নাশ করতে লাগল এবং বৃক্ষরাজিও কাটতে লাগল, যা এর পূর্ববর্তী যুগে ছিল না।

এভাবে 'দ্বাপর' যুগের শুরুতে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি হতে থাকে, তারপর পাপ ও পুণ্যের অনুপাত এক সময়ে সমান হয়ে যায় আর এভাবে সুখ ও দুঃখও। মৌসুমের মধ্যে পার্থক্য দেখা যেতে লাগল, সর্বত্রই রক্তপাত হতে লাগল আর ধর্মও পরিবর্তিত হয়ে গেল। 'বিষ্ণুধর্ম' অনুসারে জীবন ৪০০ বছর বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। 'তিষ্য' বা কলিযুগ আসতে আসতেই পাপের মাত্রা পুণ্যের তুলনায় তিনগুণ হয়ে গেল।

'ত্রেতা' ও 'দ্বাপর' যুগের অনেক ঘটনাই হিঁদুদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, রামের কথা, যিনি রাবণকে বধ করেছিলেন : পরশুরামের কথা যিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ আর যিনি সমস্ত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ

নিয়েছিলেন। তাদের মতে, তিনি স্বর্গেই আছেন এবং তিনি পৃথিবীতে একুশবার অবতরণ করেছিলেন এবং তিনি অবতার হবেন। এছাড়া পাণ্ডুপুত্রদের কাহিনি ছাড়াও তাদের যুদ্ধের কথাও এসেছে।

'কলিযুগ'-এ পাপ ততদিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যতদিন না পুণ্য পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ সময়ে পৃথিবীবাসী পুরোমাত্রায় নষ্টভ্রষ্ট হয়ে যায় আর সেই লোকেদের মধ্য থেকে এক নতুন বংশের ধারা প্রচলিত হয় যারা পাহাড়-পর্বতের কোণে-কিনারে লুকিয়ে থাকে, আর এরাই কেবল আরাধনার জন্য একত্রিত হয় এবং ঐ ভয়ংকর ও নারকীয় মানবজাতির কবল থেকে দূরে পালিয়ে যায়। এ কারণে এ যুগকে 'কৃতযুগ' বলা হয় যার অর্থ : 'কর্ম পরিসমাপ্তির পরে চলে যাওয়ার জন্য তৎপর থাকা।'

কলিযুগের বর্ণনা

শৌনক-এর কাহিনিতে যা শুক্র ব্রহ্মার কাছ থেকে শুনেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে একথা বলেছিলেন, 'যখন কলিযুগ আগমন করে তখন আমি ধর্মাত্মা শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধোদনকে জগতে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করি। কিন্তু, তারপর 'মুহম্মির' অর্থাৎ রক্তপটধারী যার উৎপত্তি তা থেকে হয়েছে, তার নিয়ে আসা সমস্ত বস্তুকে পরিবর্তিত করে দেবে, আর ব্রাহ্মণদের এতটাই অসম্মান হবে যে, শূদ্ররা তাঁর সেবকদের সঙ্গে ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকবে...। বিভিন্ন জাতি একে অন্যের বিরুদ্ধে উপদ্রবে লিপ্ত থাকবে, বংশধারা গড়বড় হয়ে যাবে, চতুর্বর্ণের বিলুপ্তি ঘটবে ও অনেক মতান্তরের জন্ম হবে...।'

['বিষ্ণু ধর্ম' ও কিছু অন্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে 'কলিযুগ'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।]

কিন্তু অবশেষে যুগ সমাপ্তির পর যখন পাপের পরাকাষ্ঠা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন T. S. V. (?)2-এর পুত্র গর্গ নামক ব্রাহ্মণের আগমন ঘটবে অর্থাৎ কলির আবির্ভাব হবে, যার নামানুসারে এই কলিযুগ, তিনি এতটাই শক্তির অধিকারী হবেন যে, কেউ যার প্রতিরোধ করতে পারবে না আর যে কোনো রকমের অস্ত্র প্রয়োগে তিনি এতটা কুশলী হবেন যে, মোকাবিলায় কেউ তার সমকক্ষ হতে পারবে না। তিনি তার অস্ত্রের সাহায্যে সমস্ত পাপময় বস্তুকে পুণ্যময় করে দেবেন ; পৃথিবীর অধিবাসীদের অপবিত্রতাকে মোচন করে দেবেন এবং পৃথিবীকে পাপমুক্ত করে দেবেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও পুণ্যবান লোকেদের একত্রিত করে প্রজননের জন্য একত্রিত করবেন। তারপর কৃতযুগ তার পিছন থেকে অপসৃত হয়ে যায় তারপর সেই সময় আসে যখন পৃথিবী পবিত্র হয়ে যায় এবং পুণ্য ও পরম সুখ আবার ফিরে আসে।

যুগ পরিক্রমা করতে করতে যখন চতুর্যুগে পৌঁছে যায় তখন তার এরকমই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

'চরক' নামক পুস্তকানুসারে আয়ুর্বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব

'চরক' নামক পুস্তকে, তাবারিস্তানের অধিবাসী আলী ইবনে জাইন যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে : 'আদিম যুগে পৃথিবী সর্বদাই উর্বর ও সমৃদ্ধ ছিল আর তত্ত্ব বা মহাভূতের সমান মিশ্রণ ছিল। মানুষ এদের সঙ্গে প্রেম ও সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাস করত। তাদের মধ্যে লোভ, লালসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের কোনো স্থান ছিল না, আর না ছিল এমন কোনো দোষ যা মানুষের আত্মা ও শরীরকে রোগগ্রস্ত করতে পারত। কিন্তু তার পরে দ্বেষ এল, সেই সঙ্গে লোভও। লোভের বশবর্তী হয়ে তারা সংগ্রহকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল, যা কিছু লোকের জন্য সহজ ও কিছু লোকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। সমস্ত রকমের বিচার, শ্রম ও চিন্তা এসে গেল, যারা যুদ্ধ, ছলনা, কপটতা, মিথ্যার জন্ম দিল। মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তাদের স্বভাব বদলে গেল আর তাদের মধ্যে রোগের বিস্তার শুরু হয়ে গেল আর তা এমনই চেপে বসল যে, তারা ঈশ্বরের উপাসনাকে উপেক্ষা করতে লাগল আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য তাদের মধ্যে আর আকাঙ্ক্ষাই থাকল না। তারা অজ্ঞানতাকে আশ্রয় করল আর বিপদাপদে পতিত হতে লাগল। তখন ধর্মপরায়ণ লোকেরা তাদের ঋষি কৃষ (?)-এর কাছে গেল, যিনি ছিলেন অত্রির পুত্র, তার সঙ্গে পরামর্শ করল ; তারপর এ মনীষী পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং সেখান থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিলেন। তারপর, ঈশ্বর তাঁকে আয়ুর্বিজ্ঞানের শিক্ষা দিলেন।

[এভাবে ইউনানিদের কথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়
মন্বন্তর

প্রত্যেক মন্বন্তর, তার ইন্দ্র ও ইন্দ্রের সন্তান

যেরকম ব্রহ্মার আয়ু ৭২০০০ কল্প বলে মান্য করা হয় ঐরকমই মন্বন্তর– মনুর কাল–ইন্দ্রের আয়ু বলে মনে করা হয়, কেননা, মন্বন্তরের শেষে তার রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপর ঐ পদে অন্য ইন্দ্র আসীন হয়, যে নতুন মন্বন্তরে জগৎ-সংসারে রাজত্ব করে।

[একটি সারণি দেওয়া আছে, যাতে মন্বন্তরের নাম ও সংখ্যা প্রদান করা হয়েছে আর 'বিষ্ণুপুরাণ', 'বিষ্ণুধর্ম' এবং অন্যান্য সূত্র থেকে ইন্দ্র ও মনুর নাম দেওয়া হয়েছে, যারা প্রতিটি কালের শুরুতে পৃথিবীতে রাজত্ব করে গিয়েছেন। কিছু মন্বন্তরের নামে যে ভেদ রয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল বিরুনী হিন্দুদের নামের উপর গভীর চিন্তাভাবনার পর টিপ্পনী প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তারা নামের ব্যাপারে খুবই মনোযোগী, 'তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্রমানুসারে তারা সেই নামগুলো লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।' দ্র. টিপ্পনী।]

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়

সপ্তর্ষির তারামণ্ডল

বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী সম্পর্কিত কাহিনি

তারামণ্ডলকে ভারতীয় ভাষায় 'সপ্তর্ষি' বলে। বলা হয় যে, এরা সবাই ঋষি ছিলেন আর যা কিছু খাদ্য তারা পেতেন তার দ্বারাই জীবন-ধারণ করতেন আর তাদের সঙ্গে 'আল-সুহা' নামক এক ধর্মপরায়ণা স্ত্রী ছিলেন (সপ্তর্ষি তারা ৮০ XZ)। তারা দিঘি থেকে কমল ফুলের ডাঁটা তুলে এনে তাই ভক্ষণ করতেন। ইতিমধ্যে 'ধর্ম'-এর প্রাদুর্ভাব হয় আর তাতে লুকিয়ে ফেলল। ফলে তাদের সবার মধ্যে লজ্জার অনুভব জেগে ওঠে আর তারা শপথ গ্রহণ করেন, আর ধর্ম তা অনুমোদন করে। তাদের সম্মানিত করার জন্য ধর্ম তাদের ঐ স্থানে পৌঁছে দেয়, যেখানে আজও পর্যন্ত তাদের দেখা যায়।

[বরাহমিহির-এর পুস্তক 'সংহিতা' থেকে সপ্তর্ষির বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। সপ্তর্ষির অবস্থানের ব্যাপারে ভারতীয় সূত্রগুলোতে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার পরীক্ষা ও আলোচনা করা হয়েছে। আল বিরুনী এক আনুষঙ্গিক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টিপ্পনী প্রদান করেছেন যা 'আমাদের সময়' (তাঁর বৃত্তান্ত সংকলনের সময় অর্থাৎ ১০৩০) শকাব্দ যা ৯৫২-র অনুরূপ। এ থেকে শকাব্দের (শক + অব্দ) সংবতের সামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। দেখুন, টিপ্পনী। তিনি এর উপরেই নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করে অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।]

ধর্মশাস্ত্রীয় মতামত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিভ্রান্তি

আমি এখানে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উদঘাটন করেছি তা একারণেই উদ্ভূত হয়েছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় গবেষণায় কুশলতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম, আর দ্বিতীয়ত, হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাবলিকে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জুড়ে দিত। কেননা, ধর্মশাস্ত্রীদের বিশ্বাস যে, সপ্তর্ষির স্থান স্থির-নক্ষত্রের উপরে আর তারা বলেন যে, প্রতিটি মন্বন্তরে একজন নতুন মানুষের আবির্ভাব হবে, যার সন্তান

পৃথিবীকে নষ্টভ্রষ্ট করে দেবে, কিন্তু ইন্দ্রের দ্বারা রাজ্যের প্রবর্তন করা হবে আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতা ও সাত ঋষি প্রকাশমান হবেন। দেবতাদের হওয়াটা আবশ্যক, কেননা, তাদের মানুষের যজ্ঞ করতে হয় আর তাদের জন্য আগুনে আহুতি দিতে হয় ; আর সাত ঋষির প্রয়োজন এজন্য যে, তাঁরাই বেদ-এর পুনঃরচনা করবেন, কেননা, প্রতিটি মন্বন্তরের পরেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন মন্বন্তরে সাত ঋষি

এ বিষয়ে আমি যেসব তথ্য প্রদান করেছি তার উৎস হলো 'বিষ্ণুপুরাণ'। ঐ উৎস থেকে আমরা প্রতিটি মন্বন্তরের সাত ঋষির নামও গ্রহণ করেছি, যা নিম্নলিখিত সারণিতে প্রদান করা হয়েছে।

[একটি সারণি প্রদান করা হয়েছে যাতে ১৪ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি বা তারামণ্ডলের তারাগুলোকে দেখানো হয়েছে। দ্র. টিপ্পনী।]

ষষ্ঠচত্বারিংশৎ অধ্যায়

নারায়ণ, বিভিন্ন যুগে অবতরণ ও তাঁর নাম

হিঁদুদের মতানুসারে নারায়ণ এক অলৌকিক শক্তি যে সিদ্ধান্তের রূপে না কাউকে পুণ্যকর্মে উৎসাহিত করে আর না পাপাত্মাকে পাপকর্মে ; বরং সে প্রাপ্ত সাধনসমূহ হতে অনিষ্টতাও পাপকে বিরত করে। এই শক্তির জন্য পুণ্যের অস্তিত্ব পাপের প্রথমেই থাকে কিন্তু যদি পুণ্যের সমুচিত বিকাশ না হয় অথবা হতে না দেয়, তাহলে সে শক্তি পাপেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, কেননা, তা করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায় তার তুলনা এমন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে করা যেতে পারে যা একটি শস্যক্ষেত্রে পৌছে যায়। যখন সে হুঁশ ফিরে পায় এবং দুষ্কর্ম থেকে বাঁচতে চায় এবং নিজে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত করতে চায় তখন তার কাছে এছাড়া তাঁর ঘোড়াকে ফেরানোর কোনো উপায় থাকে না এবং যে পথ ধরে সে ঐ শস্যক্ষেত্রে পৌছেছিল সে পথে তাকে আর ফেরানো যায় না। যদিও ফেরার সময় সেই আগের কর্মের পুনরাবৃত্তি সে করবে, যেমনটি সে আগে করেছিল ; বরং আরও বেশি করবে। কিন্তু তাকে শোধরানোর জন্য অন্য কোনো পথও থাকবে না।

হিঁদুরা এই শক্তি ও তাদের দর্শনে 'আদি কারণ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। জগৎ-সংসারে এর বসবাস এই রকমেরই যে, লোকেরা তার তুলনা ভৌতিক অবস্থার সঙ্গে করে থাকে– তাতে শরীর ও বর্ণকে আরোপিত করে, কেননা, তারা অন্য কোনো রূপে অবতারের কল্পনা করতে পারে না।

অন্যান্য যুগ ছাড়া নারায়ণ প্রথম মন্বন্তরের শেষেও অবতারত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই অবতারের উদ্দেশ্যে সমস্ত জগতে বালখিল্যের (?) সঙ্গে রাজত্ব করা। যিনি তার এই নাম দিয়েছিলেন এবং ঐ রাজ্যকে নিজের অধীনস্ত করতে চাচ্ছিলেন। নারায়ণ অবতীর্ণ হন এবং তিনি সে রাজ্য সৎকৃতকে অর্পণ করতে চাচ্ছিলেন যিনি শত যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং তাকে ইন্দ্র উপাধি দিয়েছিলেন।

[নারায়ণ-এর ষষ্ঠ মন্বন্তরে পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া আর বিরোচনের পুত্র বলিকে বধ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্র. অধ্যায় টিপ্পনী।]

তাঁর ঐ 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ আমি আর এক অবতারের বৃত্তান্ত জানতে পারি– 'বিষ্ণু, যা নারায়ণের অন্য নাম, তিনি প্রতি দ্বাপর যুগের শেষে বেদকে চারভাগে বিভক্ত করার জন্য অবতীর্ণ হন, কেননা, মানুষ দুর্বল হয়ে যায় এবং সমস্ত বেদকে পালন করতে অসমর্থ হয়। তার মুখ ব্যাসের মতো দেখতে।'

[সপ্তম মন্বন্তরে ব্যাসদেবের নাম গণনা করা হয়েছে। দ্র. টিপ্পনী।]

সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়
বাসুদেব ও ভারত-যুদ্ধ

সংসার জীবন বপন ও প্রজননের উপর নির্ভরশীল। এই দুই প্রক্রিয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে, যদিও এ জগৎ নশ্বর তা সত্ত্বেও এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

প্রকৃতির নিয়ম ও মানবেতিহাসে সাদৃশ্য

যখন কোনো বৃক্ষরাজি বা জীবজন্তুর বংশপালা বৃদ্ধি না পায় তখন তা এক বিশিষ্ট প্রজাতির রূপে স্থির হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার অনুযায়ী জন্মহার বজায় রাখার জন্য তাকে নিজস্ব প্রজাতির মধ্যে জন্মদানের ধারা অব্যাহত রাখতে হয়। আর এভাবেই জীবজন্তু ও বৃক্ষরাজির স্বাভাবিক প্রজাতি বজায় থাকে এবং নিজ-নিজ ক্ষেত্রে সম্ভবমত নিজেদের ছড়িয়ে দেয়।

কৃষক তার ধান নির্বাচিত করে এবং তাকে ঐ মাত্রায় উৎপাদন করে, যতটা তার প্রয়োজন হয়, তারপর অবশিষ্টকে উপড়ে ফেলে দেয়। মহীরুহের সেই শাখাগুলোকে রেখে দেওয়া হয় যেগুলোর প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় শাখা-প্রশাখাকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। মধুমক্ষীরা নিজের সেই সন্তানগুলোকে মেরে ফেলে যারা কেবল খেয়েই যায় অথচ যাদের দ্বারা কোনো কাজ না হয়।

প্রকৃতিরও এটাই ধারাবাহিক নিয়ম, কিন্তু সেখানে ভেদাভেদ থাকে না, কেননা, তার কার্যক্রম সকল পরিস্থিতিতেই এক রকম হয়ে থাকে। তা বৃক্ষরাজির পত্রপল্লব ও ফলাফলাদিকে নষ্ট করে দেয় এবং তাকে তার পরিণাম অবগত হতে দেয় না, প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে তা থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদন গ্রহণ করে। যে তাকে দূর করে দেয় যাতে সে স্থান অন্যে অধিকার করতে পারে।

ঠিক এভাবেই পৃথিবীর অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তা নষ্ট হয়ে গেলে বা নষ্টপ্রায় হলে তার নিয়ামক– কেননা, তার এক নিয়ন্তা আছে যা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে কোণে অবস্থিত– পৃথিবীতে নিজের দূত প্রেরণ করেন, যা সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা হ্রাস করে দেয় আর সমস্ত পাপ নাশ করে দেয়।

বাসুদেবের জন্মকথা

হিন্দুদের বিশ্বাস যে, এরকমই একজন দূতের নাম বাসুদেব, যাকে বিগত যুগে মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, আর তাকেই বাসুদেব বলে অভিহিত করা হয়। এ ছিল সেই যুগ, যে যুগে পৃথিবী দৈত্যদানবদের পদভারে সদা-তটস্থ থাকত ; তাদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী থরহরি কম্পমান হয়ে পড়ত, তা কাঁপতে থাকত। তখন মথুরা নগরীতে কংসের বোনের গর্ভে বাসুদেবের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কংস সে সময়ে নগরের রাজা ছিল। বাসুদেবের জাতির নাম ছিল জাঠ। জাঠরা পশু পালনের কাজ করত এবং তারা ছিল শূদ্রদের একটি নিম্নতম জাতির লোক। কংস তার বোনের বিয়ের সময় আকাশবাণী শুনেছিল যে, তার (বোনের) মৃত্যু হবে তার পুত্রের হাতে। এজন্য সে কিছু লোককে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করল, যাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো তার প্রতিটি পুত্রকে ধরে ধরে তার কাছে নিয়ে আসবে এবং সে একে একে সবকটা বাচ্চাকে মেরে ফেলে...। সবশেষে সে বলভদ্রকে জন্ম দেয় আর নন্দ নামক গোয়ালার পত্নী যশোদা বালককে নিয়ে নিজের গৃহে চলে যায়...। তারপর সে আটবার গর্ভবতী হয় আর সে ভাদ্রপাদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে প্রচণ্ড বর্ষণ-মুখর রাতে বাসুদেবের জন্ম দেয়। যখন পাহারাদার গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল... তখন তার পিতা বালককে চুপিসারে কোলে করে নিয়ে যশোদার প্রতি নন্দের গোয়ালঘরে নিয়ে যায়, যা মহুয়ার নিকটেই ছিল। বাসুদেবের লালন-পালন তার ধাত্রী যশোদাই করেন আর তাকে জানতেও দেওয়া হয়নি যে, তার কন্যার বদলে একে নিয়ে আসা হয়েছিল...। কিন্তু কংস যে কোনোভাবে তা জানতে পারে...।

[কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা নিম্নরূপ :]

পাণ্ডুর পুত্র পাণ্ডবদের দেখাশোনা করত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা, যারা ছিল তাদের চাচাতো ভাই। ধৃতরাষ্ট্র তাদের ডাকলেন এবং তাদের সঙ্গে জুয়া খেললেন। জুয়া খেলার পরাজয়ের পরিণামে তাদের সমস্ত সম্পদ অধিকার করার দাবি করা হলো। পাণ্ডবরা জুয়া খেলায় অনবরত হারতে হারতে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেল যে, সবশেষে শর্তারোপ করা হলো, শেষ পর্যায়ে পাণ্ডবরা হারলে দশ বছরের অধিক কাল যাবৎ তাদের বনবাসে যেতে হবে এবং তাছাড়া তাদের দেশের কোনো দূরবর্তী স্থানে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে, যেন কেউ জানতে বা চিনতে না পারে। যদি তারা অজ্ঞাতবাসের শর্ত পুরো করতে না পারে তাহলে পুনরায় বনবাস শুরু করতে হবে। এ শর্ত পুরো হয়ে গেল। কিন্তু অবশেষে এ সময় এসে গেল যখন দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তখন দু'পক্ষই নিজ-নিজ সমর্থকদের একত্রিত করতে ও মিত্রদের সন্ধানে নেমে পড়ল এবং অবশেষে থানেশ্বরের ময়দানে অসংখ্য যোদ্ধা একত্রিত হয়ে গেল। সে সৈন্যের সংখ্যা ছিল আঠারো অক্ষৌহিণী। প্রত্যেক পক্ষই বাসুদেবকে নিজেদের পক্ষে টানতে চাইল।

তখন তিনি শর্ত দিলেন যে, দু'পক্ষের যে কোনো পক্ষ হয় তাকে নিতে পারে, নতুবা সেনাদলসহ তার ভাই বলভদ্রকে নিতে পারে। কিন্তু বাসুদেবকেই নিল। পাণ্ডবরা ছিল পাঁচ ভাই ; যুধিষ্ঠির ছিলেন তাদের নেতা, অর্জুন ছিল সবচেয়ে পরাক্রমী, আর ছিল সহদেব, ভীমসেন ও নকুল। এদের ছিল সাত অক্ষৌহিণী সেনা, আর অপর পক্ষে তাদের শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাসুদেবের কুটিল চাল আর তার শিক্ষা যদি সহায়ক না হতো তাহলে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ত। কিন্তু অবশেষে তারাই বিজয় লাভ করল। কৌরবদের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল। অবশেষে বেঁচে রইল মাত্র পঞ্চপাণ্ডব। তারপর বাসুদেব আপন আবাসে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে চলে গেলেন। বাসুদেবের বংশকে যাদব বংশ বলা হতো। বাসুদেব সেখানেই মারা গেলেন। পাঁচ ভাইও বর্ষশেষে মারা গেলেন।

[আল বিরুনী বাসুদেব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। বাসুদেব তাঁর ভাই ও আত্মীয়দের মধ্যেকার কারো বস্ত্র পরে নিজের বস্ত্রের নিচে কড়াই লুকিয়ে (পেট উঁচু করে নিয়ে) দুর্বাসা নামক এক ঋষির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– বলুন তো, আমার গর্ভ থেকে কী উৎপন্ন হবে ? ঋষি তাঁর এ প্রতারণাত্মক উপহাসের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোর পেটে যে বস্তু আছে, তাই তোর বংশের লোকেদের মৃত্যুর কারণ হবে। বাসুদেব এ কথা জানতেন যে, এ অভিশাপ সত্য প্রমাণ হবে, তাই সে কড়াই খুলে নিয়ে তিনি নদীতে ফেলে দিলেন। তার এক ছোট টুকরো একটি মাছ খেয়ে ফেলে আর যে ধীবর সেই মাছকে ধরে কেটেছিল, তা দিয়ে তীরের একটি ফলা তৈরি করল। এই তীর দিয়ে ধীবর বাসুদেবকে নিশানা বানিয়ে একটি গাছের নিচে আলুথালুভাবে বসে রইল। ধীবর তাঁকে হরিণ মনে করে তার পায়ে তীর নিক্ষেপ করল। কড়াই-এর অন্য টুকরো থেকে তা বেরিয়ে এসেছিল। যখন যাদব তাঁর নিকট পৌঁছে মদিরা পান করতে লাগল তখন তার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হলো ; পরিণামে একে অন্যকে মুষল-এর গোছার আঘাতে মেরে ফেলল। অর্জুনকে, বাসুদেব যাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি আমার শরীরকে পুড়িয়ে দিয়ো এবং আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেয়ো, রাস্তায় ডাকাতেরা আক্রমণ করল। যদিও তিনি তাদের মেরে তাড়িয়ে দেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পারেন তিনি শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন। সেজন্য তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে উত্তরাভিমুখে পাহাড়ের উপরে চলে গেলেন। সেখানকার প্রচণ্ড শীতে তাঁরা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পৃ. ৪০৬-০৬।]

অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়

অক্ষৌহিণীর পরিমাণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা

এক	অক্ষৌহিণীতে	১০ অন্তকিনি হয়।
এক	অন্তকিনিতে	৩ চমু হয়।
এক	চমুতে	৩ পুতনা হয়।
এক	পুতনাতে	৩ বাহিনী হয়।
এক	বাহিনীতে	৩ গণ হয়।
এক	গণে	৩ গুল্ম হয়।
এক	গুল্মে	৩ সেনামুখ হয়।
এক	সেনামুখে	৩ পংক্তি হয়।
এক	পংক্তিতে	১ রথ হয়।

শতরঞ্জের হাতিকে 'রুখ' বলে আর ইউনানিরা একে 'যুদ্ধরথ' বলে। এর আবিষ্কার হয়েছিল এথেন্স-এ, 'মানকালুস' (মিন্তিলৌস) ছিলেন এর আবিষ্কর্তা। এথেন্সের অধিবাসীরা বলেন, সর্বপ্রথম ইনিই যুদ্ধরথে সওয়ার হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময়ের আগে তার আবিষ্কার এফ্রোডিসিয়াস-এর যুগে এক হিঁদু করেছিল, প্রলয়ংকর মহাপ্লাবনের প্রায় ৯০০ বছর পরে তিনি মিশরের অধিপতি ছিলেন। তাঁর রথ দুটি ঘোড়ায় টানত...।

রথে এক হাতি, তিন সওয়ার ও পাঁচ পেয়াদা থাকত।

যুদ্ধের প্রস্তুতি, তাঁবু খাটানো ও তাঁবু গোটানোর জন্য উপরোক্ত সমস্ত কিছুর প্রয়োজন হতো।

এক অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০ রথ, ২১,৮৭০ হাতি, ৬৫,৬১০ আরোহী (সওয়ার) ও ১০৯,৩৫০ পদাতিক সৈন্য হয়।

প্রত্যেক রথে চার ঘোড়া ও তাদের সারথি থাকে যারা বাণ দ্বারা সুসজ্জিত থাকে, তাদের দুই সাথির কাছে বল্লম থাকে আর থাকে এক রক্ষক, যে পিছনে সারথিকে রক্ষা করে এবং একজন গাড়োয়ান থাকে।

প্রত্যেক হাতির পিঠে, একজন মাহুত থাকে এবং তার পিছনে তার সহকারী তার আসনের পিছনে বসে হাতির লাগাম ধরে রাখে ; সেই আসনে বা কুরসিতে তার মালিক ধনুর্বাণে সুসজ্জিত থাকে আর তার সঙ্গে থাকে দুই সাথি যারা বল্লম নিক্ষেপ করে আর তাদের হৌহবা (?) নামে একজন বিদূষক থাকে যে যুদ্ধাবস্থায় তাদের সঙ্গ দেয়।

সে অনুসারে যত লোক রথ ও হাতিতে আরোহণ করে তাদের সংখ্যা ২৮৪,৩২৩ হয়। অশ্বারোহীদের সংখ্যা ৮৭,৪৮০ হয়। এক অক্ষৌহিণীতে হাতির সংখ্যা ২১,৮৭০ হয়, রথের সংখ্যাও ২১,৮৭০ হয়। ঘোড়ার সংখ্যা ১৫৩,০৯০ ও মানুষের সংখ্যা ৪৫৯,২৮৩ হয়।

এক অক্ষৌহিণীতে সমস্ত জীবধারী বা প্রাণী–হাতি, ঘোড়া ও মানুষের– মোট সংখ্যা ৬৩৪,২৪৩ হয়। আঠারো অক্ষৌহিণীর জন্য এই সংখ্যা ১১,৪১৬,৩৭৪ হয়ে যায় অর্থাৎ ৩৯৩,৬৬০ হাতি, ২,৭৫৫,৬২০ ঘোড়া ও ৮,২৬৭,০৯৪ মানুষ।

এই হলো অক্ষৌহিণী ও তার বিভিন্ন অঙ্গসমূহের ব্যাখ্যা।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

সংবতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হিঁদুদের কিছু সংবতের গণনা

ইতিহাস অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্র উল্লেখিত সময়ক্ষণকে নির্দিষ্ট করার জন্য সংবত-এর ব্যবহার করা হয়। হিঁদুরা বড় বড় সংখ্যা নির্ধারণেও কোনো রকমের দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করে না ; বরং এর বিপরীতে তারা এটা করে আনন্দ পায়। কিন্তু এর বাইরে তারা এ সংখ্যাকে ছোট (সুবিধাজনক) করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যায়।

তাদের সংবতগুলোকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে গণনা করতে পারি :

১. ব্রহ্মার অস্তিত্বের শুরু।
২. ব্রহ্মার বর্তমান অহর্নিশের দিনের শুরু বা কল্প-এর আরম্ভ।
৩. সপ্তম মন্বন্তরের শুরু, আমরা বর্তমানে যে সময়ে অবস্থান করছি।
৪. অষ্টবিংশ চতুর্যুগের শুরু আমাদের এই সময়েই।
৫. বর্তমান চতুর্যুগের চতুর্থ যুগের শুরু যাকে 'কলি-কাল' বলা হয়, এ পুরো যুগটিই কলির নামের সঙ্গে সম্পর্কিত, যদিও ঠিক ঠিক হিসেব করলে কলি-কাল এ যুগের শেষভাগেই পড়ে। এছাড়া হিঁদুরা 'কলি-কাল' বলতে কলি-যুগের শুরুকে বোঝায়।
৬. 'পাণ্ডব-কাল' অর্থাৎ মহাভারত-এর যুদ্ধের সময় ও তার চলমান অবধি।

এ সমস্ত সংবতকে তারা প্রাচীনতায় একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে আর প্রত্যেকটিকে তারা একে অন্যের চেয়ে কিছুটা আগে স্থান দিয়ে থাকে, আর তার ফলে তাদের বর্ষের পার্থক্য শত শত, হাজার হাজার এমনকি এর উপরেও হয়ে থাকে। কারণ এটাই যে, তা কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রী নয় ; বরং অন্য লোকেরাও তার ব্যবহারকে কেবল অযৌক্তিক মনে করে না ; বরং তাকে অব্যবহারযোগ্য বলেও মনে করে।

লেখক 'ইয়াজদজির্দ-এর বর্ষকে পরীক্ষণ-বর্ষ বলে মনে করেন

এ সমস্ত সংবতের স্থুল বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমরা প্রথমে স্থাপক বা বিন্দুবর্ষকে কেন্দ্রীয়বর্ষ হিসেবে দেখাব, যার অধিকাংশ ভাগ 'ইয়াজদজির্দ'-এর বর্ষের সঙ্গে মিলে যায়। এই বর্ষে কেবল শতক সংখ্যা সামিল রয়েছে, দশক ও একক নেই আর এই বিশেষত্বের কারণে তা অন্য বর্ষ থেকে ভিন্ন আর এজন্য তা চয়ন করা যেতে পারে। এছাড়া এ সময়ও বড়ই স্মরণীয়, কেননা, এ যুগে প্রায় এক বছর পূর্বে ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভটি ধ্বংস হয়েছিল, এক সময়েই 'জগৎ-কেশরী' মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন, যা ছিল সে সময়কার এক আশ্চর্যজনক ঘটনা– আল্লাহ তাঁর উপর অপার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন ! হিন্দুবর্ষ নওরোজ বা এই বর্ষের নব-দিবস থেকে কেবল বারো দিন আগে আসে আর বাদশাহের তিরোধান ঠিক এর দশম ইংরেজি মাসের প্রথমে হয়েছিল।

আমাদের অনুমান সঠিক, এ কথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা এই যুগ-সন্ধিক্ষণের জন্য বর্ষ গণনা করব যা হিন্দুবর্ষের প্রারম্ভের অনুরূপ, কেননা, ঐ সমস্ত বর্ষের অন্ত বা শেষ যা যথেষ্ট সন্দেহাস্পদ তা এরই সঙ্গে সম্পর্কিত হয় আর 'ইয়াজদজির্দ'-এর ৪০০ বর্ষের নওরোজ এর কিছুদিন (বারো দিন) পরে পড়ে।

[আল বিরুনী বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাবলি হতে গৃহীত উদাহরণের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত গণনা সম্পন্ন করেছেন ; (ক) ব্রহ্মা কত বছর আয়ু অতিবাহিত করেছেন, (খ) রামের যুগ এবং (গ) বর্তমান কলি-যুগ কত বছর সময় অতিক্রম করেছে।]

তিনি নিম্নলিখিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রচলিত যুগসমূহেরও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যথা– (১) শ্রীহর্ষ, (২) বিক্রমাদিত্য, (৩) শক, (৪) বল্লভ ও (৫) গুপ্তযুগ বলে মনে করা হয়। (দ্র. প্রথম অধ্যায়।)

শ্রীহর্ষের যুগ

শ্রীহর্ষ সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাস যে, তিনি সপ্তপৃথ্বীতলের নিচে পর্যন্ত যে তলগুলো আছে তাতে কী সম্পদ লুকিয়ে আছে তা পরীক্ষা করতেন। তারা একথাও স্বীকার করেন যে, তা তিনি পেয়েও ছিলেন তার পরিণামস্বরূপ তিনি প্রজাদের (কর ইত্যাদির মাধ্যমে) উপর সমস্ত উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়েছিলেন। ঐ যুগ বা কালের ব্যবহার মথুরা ও কনৌজ প্রদেশেও লক্ষ করা যায়। শ্রীহর্ষাব্দ ও বিক্রমাব্দের মধ্যে ৪০০ বছরের ব্যবধান রয়েছে, একথা ঐ এলাকার লোকেরা আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু কাশ্মিরি 'পঞ্চাঙ্গে' আমি পড়েছি যে, শ্রীহর্ষাব্দ বিক্রমাদিত্যের ৬৬৪ বছর পরে প্রচলন হয়েছিল। এই অসঙ্গতির কারণে যে

তথ্যগত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত তথ্যের অভাবে আমার মন থেকে সে অনিশ্চয়তা দূর হতে পারেনি।

বিক্রমাব্দ বা বিক্রমী-সংবত

যারা বিক্রমাব্দ বা বিক্রমী-সংবতের প্রয়োগ করে, তাদের নিবাস ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে। এর প্রয়োগ এভাবে করা হয় ; ৪৪২কে ৩ দিয়ে গুণ করা হয় যার গুণফল আসে ১,০২৬। এই 'সংখ্যার আপনি 'ষাষ্টিক সংবৎসর'কে যোগ করুন, তার যে যোগফল হবে তাই হবে তদনুরূপী বর্ষ বা বিক্রমী-সংবত...।

শক-কাল বা শকাব্দ

শক-সংবত বা শকাব্দের নির্দেশ-ক্ষণ বা শকাব্দে বিক্রমাদিত্যের ১৩৫ বর্ষ পড়ে। এখানে যে শকাব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সিন্ধুনদ ও মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানের সেই বিশাল ভূখণ্ডকে শাসন করতেন, যাকে আর্যাবর্ত বলা হয়। তিনি হিঁদুদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। নিজেকে শক ছাড়া অন্য কিছু বলে পরিচয় দিতেন। কিছু লোকের মতে, তিনি ছিলেন আল মনসুরার শূদ্র ; অন্য কিছু লোকের মতে, তিনি হিঁদুই ছিলেন না ; বরং পশ্চিমের কোনো দেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন। তারই কারণে হিঁদুদের খুবই দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। অবশেষে হিঁদুরা দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং বিক্রমাদিত্য তাঁর উপর আক্রমণ চালান। যুদ্ধে পরাজিত করে তাকে করুর প্রদেশে মুলতান ও লোনী দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করেন। তখন থেকে এই তিথি সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়, কেননা, সেই অত্যাচারীর হত্যার খবরে আনন্দিত লোকেরা উৎসব পালনে মেতে ওঠে এবং এই তিথিকে বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা একটি যুগ-সন্ধিক্ষণ বলে গ্রহণ করেন। লোকেরা বিজেতার সম্মানস্বরূপ তার নামের প্রথমে 'শ্রী' যুক্ত করে দিয়ে তাকে 'শ্রীবিক্রমাদিত্য' বলে অভিহিত করে। যেহেতু বিক্রমাদিত্য-সংবত ও শকের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এক দীর্ঘ ব্যবধান রয়েছে, যেহেতু তিনি এ বিক্রমাদিত্য নন যিনি শককে হত্যা করেছিলেন ; বরং ঐ নামের অন্য কেউ হয়ে থাকবেন।

বল্লভ-সংবত

বল্লভী নামক নগরের রাজা বল্লভের নামে নামকরণ হয়েছে এই সংবতের। বল্লভী আনহিলওয়াড়া থেকে প্রায় ৩০ যোজনের দূরে অবস্থিত। এ কাল-নির্ণয় চলে আসছে শকাব্দ গণনা শুরু হওয়ার ২৪১ বছর পর থেকে। লোকেরা একে

এইরূপেই প্রয়োগ করে থাকে। প্রথমে তো শকাব্দকে বর্ষ বলে গ্রহণ করে আর তা থেকে ৬ ঘন ও ৫ বর্গ (২১৬ + ২৫ = ২৪১) হ্রাস করে দেয়। তাতে যে অবশিষ্ট থাকে ঐ হয় বল্লভ-অব্দের বর্ষ। বল্লভের ইতিহাস তার নির্দিষ্ট স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে (দেখুন, সপ্তদশ অধ্যায়)।

গুপ্তযুগ

যেখানে গুপ্তযুগের সঙ্গে সম্পর্ক, সেখানে লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, গুপ্ত দুষ্ট ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি ধ্বংস হয়ে যান, তখন সেই যুগ-কালকে একটি সংবত বা অব্দ বলে মান্য করা হতে থাকে। মনে হয় গুপ্তযুগের অন্তিম সময়টি ছিল বল্লভেরই সমকাল। কেননা, গুপ্ত-সংবতের সন্ধিক্ষণ বল্লভের মতোই হয়ে থাকে, অর্থাৎ শক যুগের ২৪১ বর্ষ পরে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের সংবত

জ্যোতির্বিজ্ঞান সংবত শক-যুগের ৫৮৭ বছর পরে শুরু হয়। এই সংবত ব্রহ্মগুপ্তের 'খাণ্ডখাদ্যক' সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা মুসলমানদের মধ্যে 'আল আকন্দ' নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

শতাব্দী বা সংবৎসরের দ্বারা কাল-নিরূপণের পদ্ধতি

ভারতের সাধারণ মানুষেরা এক শতাব্দীর বর্ষের উপর ভিত্তি করে কাল-নিরূপণ করে থাকে, যাকে তারা 'সংবৎসর' বলে অভিহিত করে। যখন শতাব্দী সমাপ্ত হয়ে যায় তখন তাকে পরিত্যাগ করে এবং নতুন শতাব্দী থেকে কাল-নির্ণয় করে। এই কালকে 'লোককাল' অর্থাৎ সমস্ত রাষ্ট্রের কাল বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই কাল সম্পর্কে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকে। আমার বোধগম্য হয় না যে, এভাবে তারা কীভাবে সঠিক সত্যে পৌঁছাতে পারে। এই রকমই বর্ষারম্ভের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পরবর্তী বিষয়ে আমি যা কিছু শুনেছি তাই-ই প্রকাশ করছি এবং আশা করছি যে, এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন আমরা এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাব এবং নতুন কোনো ব্যবস্থার সন্ধান নেব।

[বর্ষের বিভিন্ন প্রারম্ভের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত। দ্র. প্রথম অধ্যায়।]

হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত কাল-নির্ণয়ের জনপ্রিয় পদ্ধতি ও তার আলোচনা

এ অধ্যায়ে যে সমস্ত তথ্য পেশ করা হয়েছে তার অপূর্ণতা সম্পর্কে আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি। আমি কালের সঠিক বিবরণ, যা এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু, তা এজন্য

পেশ করতে পারিনি, কেননা, ঐ সমস্ত যুগে এ কালাবধিও সামিল করার দরকার ছিল, যা এক শতাব্দীর চেয়েও কিছুটা দীর্ঘ এবং শতবর্ষের পূর্বেকার সমস্ত ঘটনাচক্র বড়ই গোলমেলে।

কাবুলশাহী বংশের উৎপত্তি

হিঁদুদের মধ্যে এমন রাজারও সন্ধান পাওয়া যায় যিনি কাবুলে বসবাস করতেন ; যিনি তুর্কি ছিলেন, যার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি মূলত, তিব্বতি ছিলেন। তাদের মধ্যেকার প্রথম ব্যক্তির নাম ছিল বরহাতকিন, যিনি সর্বপ্রথম এ দেশে এসেছিলেন এবং কাবুলের একটি গুহার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ গুহাতে কেবল তিনিই মাত্র প্রবেশ করতে পারতেন এবং তাতে গুড়ি মেরে প্রবেশ করতে হতো। গুহার মধ্যে পানি ছিল। আর তিনি এক সঙ্গে কয়েকদিনের খাদ্য নিয়ে সেই গুহায় প্রবেশ করতেন। এ গুহা আমাদের সময়েও সুপ্রসিদ্ধ এবং তাকে 'বর' বলা হয়। যারা বরহাতকিনের নামোচ্চারণ করাকে শুভকর্ম বলে জ্ঞান করে তারা ঐ গুহায় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে অতি কষ্টে পানি নিয়ে আসে।

কৃষকদের কিছু দল ঐ গুহামুখে কাজ করছিল। এই ধরনের ছলনা-কপটতা তখনই সফল হয় আর তা থেকে খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে, যখন প্রবর্তক অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ; বরং নিজের অনুচরদের সঙ্গে কোনো গুপ্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সমস্ত চালবাজি লোকেদের আকৃষ্ট করে এবং তারা সেখানে দিনরাত কাজ করতে থাকে যাতে ঐ স্থানটি কখনো নির্জন অবস্থায় পড়ে না থাকে।

গুহায় প্রবেশ করার কিছু দিন পরে সে লোকেদের উপস্থিতিতে, যারা তাকে নবজাতক বলে মনে করত, সেখান থেকে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তিনি তুর্কি পোশাকাদি পরে ছিলেন ; একটি ছোট কুর্তা ছিল যা আগে থেকে খুলে রাখা হয়েছিল, এক উঁচু টুপি, বুট ও অস্ত্র। আর যায় কোথায় ? লোকেরা এ অলৌকিক কাণ্ডদর্শনে তাকে এক অলৌকিক মহামানব বলে সম্মান করতে লাগল। যার ললাটে রাজ-ভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল, আর এ তথ্যও ঠিক যে, তিনি সমস্ত দেশকেই নিজের অধীনস্ত করে নিলেন এবং 'কাবুলশাহী' উপাধি ধারণ করে তাদের উপর শাসনকার্য চালালেন। এ রাজ্য তার অধস্তনদের মধ্যে বহু বছর পর্যন্ত চলতে থাকে, আর তা ষাট পুরুষের রাজত্ব ছিল বলে বলা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের কথা হলো এই যে, ঐতিহাসিক ঘটনা-ক্রম সম্পর্কে হিঁদুদের কোনো ধারণাই নেই এবং তারা তার প্রতি মনোযোগও দেয় না। তারা তাদের সম্পর্কে খুবই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকে। যখন তাদের রাজ-রাজড়াদের

কালক্রমের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করা হয় তখন তার সঠিক কোনো জবাব পাওয়া যায় না ; তখন তারা নানারকম আজগুবি গল্প শোনাতে থাকে। কিন্তু এজন্য আমি আমার পাঠকদের সমীপে একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করছি, তা হলো তাদের মধ্যেকার কিছু লোকের কাছে আমি শুনেছি যে, এই রাজধানীর বংশাবলি একটি রেশমি-কাপড়ে লিপিবদ্ধ করে তাকে নাগরকোটের দুর্গে রাখা আছে, যা সেখানে আজও মজুদ রয়েছে ; আর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম যে, তা স্বচক্ষে দেখে নিই, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

[এরপর সেই বৃত্তান্ত এসেছে, যাতে এই রাজবংশের এক শাসক, যার নাম কণিষ্ক, "যিনি পুরুষপুরের 'বিহার' নির্মাণ করেছিলেন"– যাকে কীভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তারই মন্ত্রী দ্বারা অপদস্থ করানো হয়েছিল। 'তারপর' ব্রাহ্মণ রাজারা রাজত্ব করেন।]

তিব্বতি রাজবংশের শেষ ও ব্রাহ্মণ রাজবংশের উদ্ভব

এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন 'লাগাতুরমান', কল্লর নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তার মন্ত্রী। মন্ত্রী বড়ই সৌভাগ্যবান ছিলেন। কেননা, সৌভাগ্যবশত, তিনি কিছু গুপ্তধন পেয়েছিলেন। সেই গুপ্তধনের কারণেই তিনি অর্থবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন, সেই সঙ্গে দূর-দূরান্তে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিণামে তিব্বতি বংশোদ্ভূত রাজার হাত থেকে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা অন্য হাতে চলে গেল। এছাড়া 'লাগাতুরমান' ছিলেন খুবই অশিষ্ট প্রকৃতির লোক এবং তার ব্যবহারও ছিল 'অত্যন্ত খারাপ' এ কারণে প্রজারা মন্ত্রীর কাছে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ হাজির করে। তখন মন্ত্রী তাকে বেড়ি পরিয়ে বন্দিশালায় বন্দী করে ফেললেন। এবার ধীরে ধীরে রাজক্ষমতাও মন্ত্রীর হাতে এসে গেল। অগাধ সম্পত্তি তার হাতে এসে গেল, তারই সহযোগিতায় মন্ত্রী তার পরিকল্পনা রূপায়িত করতে সমর্থ হলেন এবং সবশেষে রাজক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিকারী হয়ে গেলেন। তারপরে ব্রাহ্মণ-রাজ কায়েম হলো এবং পর্যায়ক্রমে–সামন্ত[৩৩], কমলু, ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল ও ত্রিলোচনপাল রাজকার্য চালিয়ে গেলেন। ত্রিলোচনপাল ৪১২ হিজরি (১০২১ খ্রি.)-তে মারা যান এবং ভীমপালকে তার পাঁচ বছর পরে (১০২৬ খ্রি.) হত্যা করা হয়।

হিন্দু শাহী বংশ যখন লোপ পেয়ে যায় তখন ঐ বংশের আর কোনো লোকের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট ছিল না। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এতটা বৈভবশালী হওয়া সত্ত্বেও যে কোনো প্রকারের কাজ করার মধ্যে তাদের কোনো অনীহা ছিল না। যা কিছু শুভ ও উচিত ছিল তা তারা অত্যন্ত উদারতা ও বদান্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন, তাদের ব্যবহারও ছিল খুবই ভব্য।

অনঙ্গপালের লেখা একটি পত্রের নিম্নলিখিত উদাহরণটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। তিনি সুলতান মাহমুদকে এই পত্রে লিখেছিলেন : 'আমি জানতে পারলাম যে, তুর্কিরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং তারা খুরাসান পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। যদি আপনি চান তাহলে ৫,০০০ অশ্বারোহী, ১০,০০০ পদাতিক ও ১০০ হাতি নিয়ে আমি আপনার সহায়তার জন্য এগিয়ে আসতে পারি অথবা আপনি চাইলে এর চেয়ে দু'গুণ বেশি সৈন্যসহ আমার পুত্রকে আপনার কাছে পাঠাতে পারি। এই সহায়তা প্রস্তাব আপনার মনে কী প্রভাব ফেলবে আমি জানি না। আমি আপনার কাছে পরাজিত হয়েছি, এজন্য আমি এটা চাই না যে, কেউ আপনাকে পরাস্ত করে দিক।'

ইনি ছিলেন সেই রাজা, যিনি নিজের পুত্রকে বন্দী করার পর থেকে মুসলমানদের খুবই ঘৃণার চোখে দেখতেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ত্রিলোচনপাল ছিলেন তাঁর পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সার্ধশত অধ্যায়
এক 'কল্প' ও এক 'চতুর্যুগ'-এ কতটা তারা-চক্র হয়

'কল্প'-র এক শর্ত হলো এই যে, তাতে গ্রহগুলোকে তার নিজের চক্র ও অক্ষরেখার সঙ্গে মেষের অর্থাৎ মহা-বিষুব-এর বিন্দুর উপর ০°-তে মেলানো উচিত। সে জন্য প্রত্যেক গ্রহ এক কল্পের ভিতর এক নিশ্চিত সংখ্যা পরিক্রমা বা চক্কর লাগিয়ে থাকে।

আল ফাজারী ও ইয়াকুব ইবনে তারিকের ঐতিহ্য

এই তারা-চক্র যাকে আল ফাজারী ও ইয়াকুব ইবনে তারিকের সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করা হয়, তা এক হিঁদুর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল যাকে সিন্ধুর শাসক এক রাজনৈতিক প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে ১৫৪ হিজরিতে (৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদের খলিফা আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি আমরা এসব গৌণ তথ্যাবলির তুলনা হিঁদুদের মুখ্য তথ্যাবলির সঙ্গে করি তাহলে তাতে যে সমস্ত অসঙ্গতি পাওয়া যাবে, সে সবের যুক্তিসঙ্গত কারণ আমার জানা নেই। এ সমস্ত তথ্যের মূল উৎস আল ফাজারী ও ইয়াকুবের নয় তো ? অথবা এও হতে পারে যে, কালান্তর এ সমস্ত গণনা ব্রহ্মগুপ্ত অথবা অন্য কেউ সংশোধন করে থাকবেন।

সরখস-এর অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে ইসহাক

কেননা, একথা নিশ্চিত যে, যদি কোনো তথ্যানুসন্ধানী জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীর গণনায় কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ থাকে তাহলে তিনি তা শুধরে নেওয়ার প্রয়াস চালাবেন ; উদাহরণত, সরখস-এর অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে ইসহাকও এমনটাই করেছিলেন...।

ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক আর্যভট্টের উদাহরণ

ব্রহ্মগুপ্ত চাঁদের চক্র ও অক্ষরেখা সম্পর্কে এক ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করেছেন যার ভিত্তি আর্যভট্ট। আমি এখানে ব্রহ্মগুপ্তের উদাহরণ পেশ করছি, কেননা, আর্যভট্টের

মূলগ্রন্থ আমি দেখতে পাইনি ; আমি এ তথ্য ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তকের উদাহরণ থেকে পেয়েছি।

[এক সারণি দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রহসমূহের নাম, এক কল্পে তার পরিক্রমার সংখ্যা আর তার চক্র ও অক্ষরেখাসমূহের পরিক্রমার সংখ্যা দেখানো হয়েছে। দ্র. দ্বিতীয় অধ্যায়।]

আরবদের মধ্যে 'আর্যভট্ট' শব্দের পরিবর্তন

... আল ফারাজী ও ইয়াকুব হিঁদু পুরুদের সম্পর্কে কখনো শুনে থাকবেন যে, তারা-চক্র সম্পর্কে তাঁর গণনা 'মহাসিদ্ধান্ত'-র উপরে নির্ভরশীল, যদিও আর্যভট্ট তার হাজার ভাগকে বিশ্বস্ত বলে মান্য করেন। স্পষ্ট যে, তারা তা ঠিকমত বুঝতে পারেননি এবং তাঁরা এ কল্পনা করে নেন যে, 'আর্যভট্ট' (আরব, 'আর্জমাদ)-এর অর্থ সহস্রতম ভাগ। অতএব, এই ব্যঞ্জন বদলে গিয়ে 'র' হয়ে গিয়েছে, আর লোকেরা 'আর্জভার' লিখে দেন। পরবর্তীতে তা যদি আরও বিকৃত হয়ে যায় আর প্রথম 'র' বদলে গিয়ে 'জা' হয়ে যায় আর হিঁদুদের কাছে ফিরে যায় তাহলে সম্ভবত তারা একে চিনতেও পারবে না...।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

'অধিমাস', 'ঊনরাত্রি' ও 'অহর্গন' শব্দসমূহের ব্যাখ্যা যা দিবসের বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীক

অধিমাস

হিঁদুরা মাস গণনা করেন চাঁদের হিসেবে আর বর্ষ গণনা করে সূর্যের হিসেবে, সে জন্য তাদের নববর্ষের দিন প্রত্যেক সৌরবর্ষে অতটা দিন আগে পড়ে যতটা দিন সৌরমাসের চেয়ে ছোট হয় (স্থূলরূপে বলতে গেলে এগারো দিন)। যদি এই পূর্বানুবর্তিতা থেকে পুরো এক মাস হয়ে যায় তাহলে তাকে তারা ঐভাবে ব্যবহার করে, যেমনটি করে ইহুদিরা, অর্থাৎ তাঁরা আদর মাসকে দুবার গণনা করে ঐ বর্ষকে তেরো মাসে অধিবর্ষ হিসেবে গণ্য করেন। অমুসলিম আরবদের সঙ্গে তাদের এ ব্যবহারের মিল লক্ষ করা যায়, যারা তথাকথিত বিলম্বিত বর্ষের কারণে নববর্ষকে এগিয়ে দিয়েছে এবং এভাবে পূর্ববর্তী বর্ষকে বাড়িয়ে তেরো মাসের করে দিয়েছে।

হিঁদুরা ঐ বর্ষকে সাধারণ ভাষায় 'মল মাস' বলে অভিহিত করে। মলের অর্থ হাতে লেগে যাওয়া ময়লা। যেভাবে ময়লাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় ঐ রকমই অধিমাসের গণনা করা হয়, ফলে, বর্ষের মাসের সংখ্যা বারোই থেকে যায়। শুদ্ধ ভাষায় এই মাসকে 'অধিমাস' বলা হয়।

ঐ মাসই পুনর্গণনা করা হয় যাতে দুই চান্দ্র মাস পুরো হয়ে যায় (একে সৌর মাস বলে মান্য করা হয়)। যদি চান্দ্র মাসের অন্ত ও সৌর মাসের প্রারম্ভ হয় ; বরং যদি বাস্তবে চান্দ্র মাস সৌর মাসের কোনো অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলে এ মাস দুবার নিয়ে আসা হয়, কেননা, চান্দ্র মাসের অন্ত– তা সে নতুন সৌর মাসের সঙ্গে তখনো মিলতে পারুক বা না পারুক– একে ব্যতীত পরবর্তী মাসের অঙ্গ হয়ে যেতে পারে না।

যদি মাসকে দু'বার আনা হয় তাহলে তো প্রথম বারে সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, কিন্তু পরের বারে এই সংজ্ঞার প্রথমে 'দূর' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয় যাতে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণত, যদি আষাঢ় মাস দুবার এসে

যায় তাহলে প্রথমটিকে প্রথম আষাঢ় এবং পরেরটিকে দূরাষাঢ় বলা হয়। প্রথম মাস সেইটি, যাকে গণনা করা হয় না। হিদুরা একে অশুভ বলে মান্য করে আর ঐ মাসগুলোতে তারা কোনো পর্বই পালন করে না। এই মাসের সবচেয়ে অশুভ দিন বলে ঐ দিনকে মান্য করা হয়, যে মাসে চান্দ্রমাস সমাপ্ত হয়ে যায়...।

'অধিমাস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'প্রথম মাস', কেননা, এ. ডি. (আনা ডোমিনা)-এর অর্থ হয় শুরু (অর্থাৎ আদি)। ইয়াকুব ইবনে তারিক ও আল-ফাজারীর পুস্তকাবলিতে এর নাম লেখা হয়েছে 'পাদমাস'। 'পাদ'-এর মূলার্থ হয় 'অন্ত' (বা শেষ) আর সম্ভবত, হিদুরা একে দুই নামেই অভিহিত করে থাকবে ; কিন্তু পাঠকের একথা জানা থাকা উচিত যে, এ দুই লেখক ভারতীয় পারিভাষিক শব্দাবলিকে বরাবরই অশুদ্ধভাবে লিখে থাকেন অথবা সেগুলোকে বিকৃত করে লেখেন আর এজন্যই তাঁদের এ ধারাবাহিক বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণীয় হতে পারে না। আমি এর উল্লেখ এ জন্যই করেছি, কেননা, পুলিশ এই দুই নামকে, প্রকৃতপক্ষে যার একটাই নাম, এর পরের মাসের ব্যাখ্যা অধিসংখ্যক রূপে করেছেন।

বিশ্বজনীন এবং আংশিক মাস ও দিনসমূহের ব্যাখ্যা

এক সংযোগ থেকে অন্য সংযোগ পর্যন্ত সময়কে মাস হিসেবে গণ্য করা হয় আর তা চাঁদের এক পরিক্রমার পরিচারক হয় যা কান্তিবৃত্তের অক্ষরেখায় ঘুরতে থাকে, কিন্তু তার মার্গ (পথ) সময়ের মার্গ থেকে দূরে হয়ে থাকে। এ দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পিণ্ডের গতির মধ্যে এটাই পার্থক্য আছে, যদিও যে দিকের প্রতি যে গতিশীল থাকে, তা একই। যদি সূর্যের পরিক্রমাকে অর্থাৎ এক কল্পের সৌরচক্রকে তার চান্দ্রচক্র থেকে হ্রাস করা হয় তাহলে তার অবশেষে থেকে জানা যায় যে, কল্প ও সৌর মাসের তুলনায় কতটা বেশি চান্দ্র মাস হয়। সমস্ত মাস অথবা দিবস– যেগুলোকে আমরা সম্পূর্ণ কল্পের অঙ্গ বলে মান্য করি, আমি এখানে তাকে 'সার্বদেশিক' বা বিশ্বজনীন বলে অভিহিত করেছি, আর ঐ সমস্ত মাস ও দিবসকে যাকে আমরা এক কল্পাঙ্গ বলে মান্য করি, যেমন চতুর্যুগ, তবে আমরা তাকে 'আংশিক' বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকি আর এ কেবল শাব্দিক সরলীকরণের উদ্দেশ্যেই করেছি।

বিশ্বজনীন 'অধিমাস' মাস

এক বর্ষে বারোটি সৌর মাস হয় আর এভাবে বারো চান্দ্র মাস হয়। চান্দ্রবর্ষ বারো মাসে পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু সৌরবর্ষে এই দুই প্রকারের বর্ষের পার্থক্যের কারণে অধিমাস মাসের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার ফলে তেরো মাস হয়। এ থেকে একথা স্পষ্ট

হয়ে যায় যে, সার্বদেশিক সৌর ও চান্দ্র মাসের মধ্যে পার্থক্য এই অধিসংখ্য মাসই নিরূপণ করে, যার ফলে, একই বর্ষ তেরো নামে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব এই মাসই সার্বদেশিক বা বিশ্বজনীন অধিমাস...।

'ঊনরাত্রি' শব্দের ব্যাখ্যা

যেখানে ঊনরাত্রি-হ্রাসপ্রাপ্ত দিন-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়, তা আমরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি :

যদি আমরা এক বর্ষ বা কিছু বর্ষ ধরি এবং তার প্রত্যেককে বারো মাস হিসেবে গণনা করি তাহলে তার অনুরূপ সৌর মাস বেরিয়ে আসবে আর ঐ মাসগুলোকে ৩০ দিয়ে গুণ করলে অনুরূপ সৌরদিবসের সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। একথা তো স্পষ্ট যে, ঐ অবধির চান্দ্র মাস অথবা চান্দ্রদিবসের সংখ্যা এটাই হবে, কেবল বৃদ্ধি হলে তা অতটাই হবে যা থেকে এক বা একাধিক অধিমাস মাস সৃষ্টি হয়। যদি আমরা বিশ্বজনীন সৌর ও বিশ্বজনীন অধিমাসের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুসারে এই বৃদ্ধি থেকে প্রস্তুত কালাবধির অনুরূপ অধিমাস তৈরি করি এবং তা থেকে তৈরি বর্ষ ও মাসে বা দিবসে জুড়ে দিই তাহলে সে জোড় আংশিক চান্দ্রদিবসকে দর্শাবে আর সে সমস্ত দিবস প্রদত্ত সংখ্যার অনুরূপ হবে।

কিন্তু আমার অভীষ্ট শুধু এটাই নয়। আমাদের তো প্রয়োজন বর্ষের সংখ্যা বিশেষের ব্যবহারিক দিনের সংখ্যায়, যা চান্দ্রদিবসের সংখ্যার চেয়ে কম, কেননা, এক ব্যবহারিক দিবস এক চান্দ্রদিবসের চেয়ে বড় হয়। এজন্য যে বস্তুটি আমাদের প্রয়োজন তা পাওয়ার জন্য আমাদের চান্দ্রদিবসের সংখ্যা থেকে কিছুটা হ্রাস করতে হবে, আর ঐ যাকে হ্রাস করা হয় তাকে 'ঊনরাত্রি' বলা হয়...।

দ্বাপঞ্চাশৎ অধ্যায়

সাধারণভাবে অহর্গনের হিসাব এবং বছরের ও মাসের দিনে রূপান্তর ও তার বিপরীত পদ্ধতি

শাবনাহর্গন শাবন + অহর্গন বের করার সাধারণ নিয়ম বিয়োজনের সাধারণ পদ্ধতি নিম্ন রকমের :

সম্পূর্ণ বর্ষকে ১২ দিয়ে গুণ করা হয়, গুণফলে চলমান বর্ষের অতিক্রান্ত মাসগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয় (আর এই যোগকে ৩০ দিয়ে গুণ করা হয়) : এই গুণফলে চালু মাসের অতিক্রান্ত হওয়া দিনকে জুড়ে দেওয়া হয়। এর যোগ শাবনাহর্গন অর্থাৎ আংশিক সৌর-দিবসগুলোর যোগফল বলে দেয়।

আপনি সংখ্যার দু'জায়গায় লিখুন। এক জায়গায় আপনি তাকে ৫৩১১-এর সঙ্গে অর্থাৎ ঐ সংখ্যার সঙ্গে গুণ করুন যা সার্বদেশিক বা বিশ্বজনীন অধিমাস মাসের সংখ্যা দেখিয়ে দেবে। গুণফলকে ১৭২,৮০০ অর্থাৎ ঐ সংখ্যার সঙ্গে ভাগ করলে সার্বদেশিক সৌর মাসের সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। এ থেকে যে ভাগফল বেরুবে, তাতে যে পর্যন্ত পুরো দিন হবে তাকে অন্য জায়গার সংখ্যায় জুড়ে দিলে তার যে যোগফল হবে তাই-ই চান্দ্রাহর্গন অর্থাৎ আংশিক-চান্দ্র দিবসসমূহের যোগফল।

পরবর্তী সংখ্যাকে পুনরায় দুটি জায়গায় সরিয়ে নিন। এক জায়গায় আপনি তাকে ৫৩,৭৩৯ দিয়ে অর্থাৎ ঐ সংখ্যা দিয়ে গুণ করুন যা থেকে সার্বদেশিক ঊনরাত্র দিবস বেরিয়ে আসবে আর গুণফলকে ৩,৫৬২,২২০ দিয়ে অর্থাৎ ঐ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সার্বদেশিক চান্দ্রদিবস বেরিয়ে আসবে। এর যে ভাগফল বেরুবে, তাতে যা পুরো দিন হবে তাকে অন্য জায়গায় লেখা সংখ্যা থেকে হ্রাস করলে শেষে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই-ই হবে শাবনাহর্গন অর্থাৎ ব্যবহারিক দিনসমূহের যোগ হবে যা আমরা পেতে চেয়েছি।

এই প্রয়োজনের জন্য অধিক বিস্তৃত নিয়ম

কিন্তু পাঠকের এ তথ্য অবগত হওয়া উচিত যে, এ গণনা ঐ সমস্ত তিথির উপর প্রযুক্ত হয় যা কোনো ভিন্নতা ছাড়া পুরো অধিমাস ও ঊনরাত্রির দিন হয়ে থাকে।

এজন্য যদি বর্ষের কোনো সংখ্যার শুরু কোনো কল্প বা চতুর্যুগ বা কোনো কলিযুগের সঙ্গে করা হয় তা হলে তো এ গণনা সঠিক হয়। কিন্তু যদি ঐ বর্ষসমূহের প্রারম্ভ অন্য কোনো সময় থেকে হয় তাহলে এ গণনা কাকতালীয়ভাবে সঠিক সিদ্ধ হয় ; কিন্তু এও সম্ভব যে, তা থেকে অধিমাসের সময় বলে সিদ্ধ হতে পারে এবং এমতাবস্থায় সে গণনা সঠিক হবে না। এও হতে পারে যে, দুই সম্ভাব্য ঘটনার বিপরীত ফলাফল বেরুতে পারে। তা সত্ত্বেও যদি একথাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কল্প, চতুর্যুগ বা কলিযুগের কোনো ক্ষণবিশেষে বর্ষের সংখ্যা-বিশেষের শুরু হয়, তাহলে তার জন্য আমরা একটি বিশেষ গণণা-পদ্ধতি অবলম্বন করি, আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে আমরা তা উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করব।

[অধ্যায়ের শেষাংশে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে : (ক) পূর্বোক্ত পদ্ধতি (i) শকাব্দ ৯৫৩ ধরা হয়েছে, (ii) পুলিশের সিদ্ধান্তানুসারে চতুর্থ গণনা করা হয়েছে ; (খ) অহর্গনের পদ্ধতি আর্যভট্ট ও ইয়াকুব ইবনে তারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে ; (গ) ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্তানুসারে ঊনরাত্রি দিনসমূহের গণনার জন্য (অবলম্বিত পদ্ধতি) ; (ঘ) কল্প, চতুর্যুগ বা কলিযুগের বর্ষসমূহের জন্য অধিমাসের গণনা পদ্ধতি এবং (ঙ) দিনগুলোর কোনো সংখ্যা-বিশেষের সহায়তা থেকে কোনো কালানুক্রমিক তিথি বের করার নিয়ম অর্থাৎ অহর্গনের বিলোপ। দ্র. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়।]

ত্রয়পঞ্চাশৎ অধ্যায়

কালের কতিপয় তিথি অথবা পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য বিশেষ নিয়মানুসারে যে পঞ্চাঙ্গ অবলম্বন করা হয় অহর্গন অথবা বর্ষের মাসসমূহের বিয়োজন

বিশেষ তিথিসমূহের জন্য গৃহীত অহর্গন পদ্ধতি

সমস্ত সংবত, যার পঞ্চাঙ্গ দ্বারা দিবস গঠিত হয় ঐ সবের মধ্যে এমন যুগ আসে না যা এমন পঞ্জিকার মধ্যে পড়ে না, যখন তা ঊনরাত্রি বা অধিমাসের সংযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এর কারণ হলো পঞ্চাঙ্গ নির্মাতাদের অধিমাস ও ঊনরাত্রির গণনার জন্য এমন কিছু বিশেষ সংখ্যার প্রয়োজন হয় যা ঠিকমত গণনা করতে গেলে তাতে কিছু জুড়তে হয় অথবা হ্রাস করতে হয়। হিন্দুদের পঞ্চাঙ্গ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন হতে আমি যে নিয়মেরই কথা জানতে পারি তা আমি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেব।

সর্বপ্রথম, আমরা 'খাণ্ডখাদ্যক'-এর নিয়মের উল্লেখ করছি, কেননা এটাই পঞ্চাঙ্গর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আর জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা অন্য পঞ্চাঙ্গগুলোর চেয়ে একেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

[আল বিরুনী 'খাণ্ডখাদ্যক'-এর নিয়মের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, 'কেননা, জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীরা অন্য পঞ্চাঙ্গগুলোর চেয়ে একেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, সেই সঙ্গেই তিনি অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলিরও উল্লেখ করেছেন আর তাঁদের দ্বারা গৃহীত মাপন-বর্ষের জন্য সেগুলোর উপযোগিতা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। দ্র. অষ্টম অধ্যায়।]

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

নক্ষত্রপুঞ্জের মাধ্যস্থানসমূহের বর্ণনা

কোনো কাল-বিশেষে কোনো নক্ষত্রের মাধ্যস্থানসমূহ জানার সাধারণ পদ্ধতি

যদি আমরা কোনো কল্প বা চতুর্যুগে নক্ষত্রপুঞ্জের চক্রসংখ্যা জ্ঞাত হতে পারি এবং একথাও যদি আমাদের জানা থাকে যে, কোনো পঞ্জিকা-বিশেষ পর্যন্ত কত চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে আমরা একথাও জানতে পারব যে, কল্প বা চতুর্যুগের দিনপঞ্জির জোড়ের চক্রসমূহের সঙ্গে ঐ সম্পর্কই থাকবে যা কল্প বা চতুর্যুগের অতিক্রান্ত হওয়া দিনপুঞ্জের সংখ্যা নক্ষত্রপুঞ্জের রাশির অনুরূপ হবে। এ সম্পর্কে যে পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রযুক্ত হয় তা হলো এই :

কল্প বা চতুর্যুগের অতিক্রান্ত হওয়া দিনপুঞ্জের নক্ষত্রপুঞ্জের চক্রসমূহ আপদূরক বিন্দু বা তার পাতের সঙ্গে গুণ করা হয় যা এক কল্প বা চতুর্যুগে নির্মিত হয়। যদি আপনি কল্প বা চতুর্যুগের দিনসমূহের যোগ থেকে গুণফলকে বিভক্ত করেন তাহলে ভাগফল পূর্ণ কালচক্রকে প্রকাশ করবে। কিন্তু যেহেতু এর কোনো প্রয়োজন হয় না সেজন্য একে উপেক্ষা করা হয়।

ভাগ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ১২ দিয়ে করা হয় আর তার গুণফলকে কল্প বা চতুর্যুগের দিনসমূহের যোগ থেকে, যা থেকে আমরা প্রথমেই একবার বিভাজন সম্পন্ন করেছি, তাকে বিভক্ত করা হয়। ভাগফল কান্তিবৃত্তের চিহ্নকে দর্শায়। এই বিভাজনের অবশিষ্টকে ৩০ দিয়ে গুণ করা হয় আর গুণফলকে ঐ ভাজক থেকে বিভক্ত করা হয়। ভাগফল অংশাবলিকে দর্শায়। এর বিভাজনের অবশিষ্টকে ৬০ দিয়ে গুণ করা হয় আর তাকে ঐ ভাজক থেকে ভাগ করা হয়। ভাগফল মিনিটকে দর্শায়।

যদি আমরা সেকেন্ড বা তা থেকেও গৌণতর মূল্য জানতে চাই তাহলে এ গণনাকে জারি রাখা যেতে পারে। ভাগফল ঐ নক্ষত্রের স্থানকে তার মাধ্য-গতির অনুসারে বা ঐ আপদূরক বিন্দু বা ঐ পাতের স্থানের পরিচায়ক যার নির্ধারণ ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

[এই প্রয়োজনের জন্য পুলিশের পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত রীতির কথাও উল্লেখিত হয়েছে এবং 'খাণ্ডখাদ্যক', 'করণতিলক' ইত্যাদির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ; অধ্যায় একাদশ ও দ্বাদশ। আল বিরুনী উপসংহারে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেছেন।]

...কিন্তু এ পদ্ধতি খুবই সূক্ষ্ম এবং সংখ্যা এত অধিক যে, তা থেকে কোনো বিশেষ প্রামাণ্য তথ্য পাইনি। সেজন্য আমি তা এখানে দিচ্ছি না, কেননা, তাতে অনেক সময় লেগে যাবে, আর তাতে কোনো লাভও হবে না।

নক্ষত্রপুঞ্জের মাধ্যস্থানসমূহের গণনায় অন্য পদ্ধতির সঙ্গে ঐ প্রকারের গণনার উপর লেখা পুস্তকের কোনো সম্পর্ক নেই।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

নক্ষত্রপুঞ্জের ক্রম, সে সবের দূরত্ব ও আয়তন

সূর্যের চন্দ্রের নিচে অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহ্যগত ধারণা

লোকসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'পতঞ্জলি'র ভাষ্য থেকে একটি উদাহরণ আমি প্রথমেই পেশ করেছি, সে অনুসারে সূর্যের অবস্থান নক্ষত্রপুঞ্জের ক্রমানুসারে চাঁদের নিচে। হিঁদুদের ঐতিহ্যগত ধারণা এটাই...।

এবার সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে এই ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি হতে কিছু উদাহরণ পেশ করব আর সেই সঙ্গে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের মতও পেশ করব, যদিও সে সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত।

[সূর্যের আকার, তার উষ্ণতা, প্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে 'বায়ুপুরাণ'-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দ্র. দ্বাদশ অধ্যায়।]

তারকাপুঞ্জের স্বরূপ

তারকাপুঞ্জের সমস্ত তারকা সম্পর্কে সমস্ত হিঁদুরই ধারণা হলো যে, তা গোলাকার, তা তত্ত্বত, জলীয়, তারা চমকায় না ; কিন্তু অন্য দিকে, উপরে অবস্থিত সূর্য মূলত অগ্নিময়, সদা আলোকমান এবং সংযোগবশত তা অন্যান্য তারকাকেও আলোক প্রদান করে এবং তা প্রকাশমান হয়। তারা এমন তেজোদ্দীপ্ত পিণ্ডসমূহকেও নক্ষত্র বলে গণ্য করে, যা দেখতে নক্ষত্রের মতোই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না ; বরং আলোকপিণ্ড মাত্র হয়, যেখানে তারা মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, ঈশ্বর যাদের শাশ্বত পুরস্কার প্রদান করেছেন আর যারা ঊর্ধ্ব আকাশে তাঁদের মহা-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত...।

এ সমস্ত নক্ষত্রকে তারা বলা হয় আর এ শব্দ তরণ থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ পারে যাওয়া (বা অতিক্রমণ)। এর ভাবার্থ হলো, সাধুজনেরা পাপময় জগৎ থেকে জীবনের অপর পারে চলে গিয়েছেন আর পরমানন্দ লাভ করেছেন, আর তারকারা

আকাশে বৃত্তাকার গতিতে ঘুরতে থাকে। 'নক্ষত্র' শব্দ কেবল চান্দ্রস্থানসমূহে তারকা পর্যন্ত সীমিত থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্তকে 'স্থিরতারকা' বলা হয়, সেহেতু নক্ষত্র শব্দও সমস্ত স্থির তারকার জন্য প্রযুক্ত হয়, কেননা, তার অর্থ হলো বাড়েও না, কমেও না (হ্রাস-বৃদ্ধিহীন)। আমি নিজস্ব পদ্ধতিতে এটাই বুঝি যে, এই বাড়া বা না বাড়া বোঝাতে একে অন্যের পার্থক্যই স্পষ্ট হয়, কিন্তু উপসংহারে উপরে উল্লেখিত পুস্তক (বিষ্ণুধর্ম)-এর রচয়িতা একে তার প্রকাশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

[নক্ষত্রসমূহের ব্যাস ও স্থির তারকাপুঞ্জের পরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। (দ্র. দ্বাদশ অধ্যায়) আর এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হয়েছে :]

একই বিষয় সম্পর্কে হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতামত

এ সমস্ত বিষয়ে হিঁদুদের যা-কিছু ভ্রান্ত মতামত আছে তা থেকে কেবলমাত্র আমি এতটুকুই জানতে পেরেছি। এবার আমি হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের ঐ সমস্ত মতামতের উল্লেখ করব যা থেকে আমরা গ্রহের ক্রম ও অন্য বিষয়ের প্রতি সহমত পোষণ করি ; অর্থাৎ, সূর্য গ্রহসমূহের মাধ্যভাগ, শনি ও চাঁদ তার দুটি দিক আর স্থির তারকারা ঐ গ্রহগুলোর উপরে অবস্থিত। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে সামান্য কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

হিঁদু ধর্মবিজ্ঞানীদের মধ্যেকার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির ; বরং তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের তো এ সম্পর্কে অধিক বিশ্বাস যে, চাঁদের অবস্থান শুধু সূর্যেরই নয় ; বরং অন্যান্য গ্রহসমূহের সকলের নিচে।

তারকাপুঞ্জের দূরত্ব সম্পর্কে ইয়াকুব ইবনে তারিকের মত

তারকাপুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের কাছে হিঁদুদের সেই ঐতিহ্যই বিদ্যমান যার উল্লেখ ইয়াকুব ইবনে তারিক তাঁর 'বিশ্বসৃষ্টি' নামক গ্রন্থে করেছেন আর তার মূল উৎস সেই প্রখ্যাত হিঁদু পণ্ডিত যিনি ১৬১ হিজরি সনে দৌত্যকর্মের জন্য বাগদাদ গিয়েছিলেন।

[গ্রহসমূহের নাম ও তার পৃথ্বীর মধ্যেকার যে দূরত্ব তার ব্যাস ইত্যাদি দেখানোর জন্য একটি সারণি দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ত্রয়োদশ অধ্যায়।]

তারকাদের অবস্থান : উচ্চতা ও নিচতা অনুযায়ী

একথা সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মধ্যেই ভালো মতো প্রসিদ্ধ আছে যে, দুই গ্রহের মধ্যে এ দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয় যে, কোনটি উচ্চে আর কোনটি নিচে

অবস্থিত। এমনটি কেবল তারা-প্রচ্ছাদন অথবা লম্বনের বৃদ্ধির সঙ্গেই করা যেতে পারে। কিন্তু তারা-প্রচ্ছাদন এলোমেলোই হয়ে থাকে আর একই গ্রহ অর্থাৎ চাঁদের লম্বনই দৃষ্টিগোচর হতে পারে। হিঁদুরা বিশ্বাস করে যে, গতিসমূহের সাম্য তো রয়েছেই কিন্তু তাদের পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উচ্চতর গ্রহে নিম্নতর গ্রহ অপেক্ষা মন্দগতি থেকে চলার কারণে তার বৃত্তে (বা কক্ষের) বৃহত্তর বিস্তার পরিদৃশ্য হয় ; আর নিম্নতম গ্রহের গতি অধিক তীব্রতর হওয়ার কারণে তার বৃত্ত বা কক্ষের বিস্তার কম হয়। এ ধরনের উদাহরণের জন্য শনির কক্ষের একটি কলা চন্দ্র কক্ষের ২৬২ কলার সমতুল হয়। এর কারণ হলো, যে শনি ও চন্দ্র একই পথে যাত্রা করে তা ভিন্ন, যদিও তার গতি সমান হয়।

এ বিষয়ের উপরে হিঁদুদের লেখা কোনো গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইনি, অবশ্য এ সম্পর্কিত তথ্য আমি অন্যান্য গ্রন্থে পেয়েছি, যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তবে তা অশুদ্ধ।

[এ অধ্যায়ের শেষ ভাগে আল বিরুনী নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করেছেন : (ক) গ্রহের ব্যাসার্ধ বা পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব, (খ) গ্রহসমূহের ব্যাস, (গ) কোনো সময় বিশেষে সূর্য ও চাঁদে পিণ্ডসমূহের গণনার বিধি, (ঘ) ছায়ার ব্যাসের গণনার জন্য ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক অনুসৃত বিধি ও (ঙ) কতিপয় অন্য ভারতীয় উৎস অনুসারে সূর্য ও চাঁদের ব্যাসের গণনা। দ্র. চতুর্দশ অধ্যায়।]

ষটপঞ্চাশৎ অধ্যায়
চন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষ

সাতাশ নক্ষত্র

হিঁদুরা নক্ষত্রের প্রয়োগ ঠিক এভাবেই করে, যেমনটি রাশির প্রয়োগ করে। কান্তি বৃত্তকে যেভাবে রাশির দ্বারা বারোটি সমানভাগে ভাগ করা হয় তেমনি তাকে নক্ষত্র দিয়ে সাতাশটি সমানভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক নক্ষত্র কান্তিবৃত্তের $\frac{৩১}{৩}$ ভাগ অথবা ৪০০টি কলায় ব্যাপ্ত। গ্রহ তার মধ্যে প্রবেশ করে আর পুনরায় তা থেকে ১২ বেরিয়ে আসে আর তার উত্তর ও দক্ষিণ-অক্ষাংশের পথ ধরে এক স্থান হতে অন্য স্থান পর্যন্ত পরিক্রমা করে। ফলিত জ্যোতিষী প্রত্যেক নক্ষত্রের উপর এক বিশেষ প্রকৃতি, ঘটনারও পূর্বাভাস দেন ও বিশেষ লক্ষণ আরোপ করেন। এটি ঐভাবেই করা হয় যেমনটি করা হয় রাশিসমূহের সঙ্গে।

আরবদের নক্ষত্রসমূহ

২৭ সংখ্যার আধার হলো এ তথ্য যে, চাঁদের সমস্ত কান্তিবৃত্ত থেকে অতিক্রম করতে $\frac{২৭১}{৩}$ দিন লাগে, যা থেকে $\frac{৩১}{৩}$-এর ভিন্নতাকে ত্যাগ করা যেতে পারে। এর সঙ্গে মেলানো একটি মিশ্র রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত আছে, যারা নক্ষত্রপুঞ্জের নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাঁদের সবচেয়ে পশ্চিমে উদয় হওয়া থেকে নিয়ে পূর্বদিকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বলে গণ্য করেন...।

কিন্তু আরবরা তো অশিক্ষিত মানুষ, তারা না জানে লেখাপড়া, আর না জানে গণনা। তারা তো কেবল সংখ্যা ও দৃষ্টির উপর ভরসা রাখে। তাছাড়া তাদের কাছে দেখা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই এবং তারা নক্ষত্রসমূহের নির্ধারণ তাদের অন্তর্নিহিত তারকাদের সহায়তা ছাড়া করতে পারে না। যদি হিঁদুরা সম্মিলিত নক্ষত্রের বর্ণনা করে তাহলে দেখা যাবে যে, কিছু তারকা সম্পর্কে আরবদের সঙ্গে তাদের মতৈক্য আছে, কিন্তু আরও কিছু তারকা সম্পর্কে আরবদের মতভেদ আছে। সব মিলিয়ে আরবরা চাঁদের কক্ষের নিকটে থাকে আর নক্ষত্রসমূহের বর্ণনা করার সময় কেবল তারকাসমূহের প্রয়োগ করে যাদের সঙ্গে

অথবা চাঁদের কোনো সময়-বিশেষে নিকটবর্তী হয় অথবা সম্পূর্ণই প্রতিবেশীরূপে বিরাজ করে।

হিঁদুদের নক্ষত্র সাতাশ বা আটাশ

হিঁদুরা ঠিক ঠিক এই পদ্ধতির অনুসরণ করে না ; বরং তারা একটি বিভিন্ন অবস্থানের উপর অন্য তারকার অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। অথবা এক তারকার অন্য তারকার বা তার উপরে অবস্থানের উপরেও মনোযোগ রাখে। এছাড়া তারা নক্ষত্রের সঙ্গে Falling Eagle-এরও গণনা করে যাতে সংখ্যা ২৮ হয়ে যায়।

এ সমস্ত কথাই আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রী ও 'আনওয়া' পুস্তকাবলির রচয়িতাদের বিভ্রান্ত করেছে, কেননা, তারা বলেন যে, হিঁদুরা আটাশ নক্ষত্রকে মান্য করে কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটিকে ছেড়ে দেয় যা সর্বদাই সূর্যকিরণ এর আড়ালে থাকে। সম্ভবত, তারা শুনে থাকবেন যে, হিঁদুরা ঐ নক্ষত্রকে যাতে চাঁদ অবস্থান করে, তাকে 'জ্বলন্ত' আর যে নক্ষত্রকে তারা সবেমাত্র ত্যাগ করেছে তাকে 'আলিঙ্গনের পরে ছেড়ে দিয়েছে', নক্ষত্রও যে নক্ষত্রে সে এখন প্রবেশ করবে তাকে 'পরিক্রমণ' বলে। আমাদের কিছু মুসলমান লেখকের এই মত যে, হিঁদুরা অঞ্জুবান (বিশাখা) নামক নক্ষত্রকে ছেড়ে যায় আর এর কারণস্বরূপ তারা বলেন যে, চাঁদের কক্ষ তুলারাশির শেষে এবং 'বৃশ্চিক' রাশির শুরুতে 'জ্বলন্ত' থাকে।

এ সমস্ত সিদ্ধান্তের উৎস একই আর তাঁদের মত যে, হিঁদুদের এখানে আটাশ নক্ষত্রকে মান্য করা হয় আর কিছু পরিস্থিতিতে তারা একটিকে বের করে দেয়। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি এর বিপরীত ; তাদের ওখানেও নক্ষত্রের সংখ্যা সাতাশই কিন্তু কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তারা আরও একটি জুড়ে দেয়...।

'খাণ্ডখাদ্যক' থেকে গৃহীত নক্ষত্রসমূহের তালিকা

স্থির তারকা সম্পর্কে হিঁদুদের জ্ঞান খুবই অল্প। আমি তাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাইনি যিনি স্থির জায়গায় অবস্থিত তারকাকে কেবল নিজের দৃষ্টিতে চিহ্নিত করতে পারেন এবং আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন। আমি এ বিষয়টি পর্যালোচনা করেছি আর সমস্ত রকমের তুলনা করে এদের অধিকাংশ সম্পর্কে আমি রায় দেওয়ার ব্যাপারে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছি আর এই গবেষণা কর্ম আমি 'নক্ষত্রসমূহের নির্ধারণ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। এ বিষয়ে তাদের যা কিছু সিদ্ধান্ত আছে সে সবের উপর ততটাই আলোচনা করব যতটা প্রস্তুত বিষয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তার আগে আমি নক্ষত্রসমূহের অবস্থান দেশান্তর ও অক্ষাংশে এবং তাদের সংখ্যা নিরূপণ 'খাণ্ডখাদ্যক'-এর নিয়মানুসারে করব, যা থেকে নিচে প্রদত্ত তালিকার বিবরণ অনুধাবন করে এ বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হয়।

[তালিকা ষোড়শ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে।]

লেখক কর্তৃক বরাহমিহিরের বক্তব্যের আলোচনা

তারকাপুঞ্জের সম্পর্কে আমি হিঁদুদের অস্পষ্ট ধারণাবলির উপর যে টিপ্পনী দিয়েছিলাম তা পূর্ণতা লাভ করেছে। যদিও সম্ভবত একথা হিঁদুরা নিজেরা স্পষ্টভাবে জানে না ; উদাহরণত, বরাহমিহিরের 'আলশরতন' অর্থাৎ অশ্বিনী সম্পর্কিত টিপ্পনী যা প্রথমোল্লিখিত ছয় নক্ষত্রের একটি, কেননা, তার বক্তব্য যে, এটা করার ফলে গণনা অপেক্ষা প্রেক্ষণকে প্রাথমিকতা দেওয়া হয়েছে। এখন দেখুন যে, অশ্বিনীর দুটি তারা আমাদের যুগে মেষ-এর দুই-তৃতীয়াংশ ভাগে (অর্থাৎ মেষের ১০° ও ২০° ডিগ্রির মধ্যে) অবস্থিত এবং বরাহমিহিরের যুগে, আমাদের চেয়ে ৫২৬ বছর আগে। এজন্য আপনি স্থির তারকার গতি (বা অয়ন)-র গণনার যে কোনো সিদ্ধান্তানুসারে করলে অশ্বিনীর অবস্থিতি তার সময়েও মেষের এক-তৃতীয়াংশের ভাগ থেকে কোনো রকমেই কম হবে না (অর্থাৎ তারা অয়নে মেষ থেকে ১° সে. ১০° সে. গ্রেডের আগে আসবে না।)।

[আল বিরুনী স্থির তারকার গতি সম্পর্কে হিঁদুদের অজ্ঞতারও আলোচনা করেছেন আর তারই উদাহরণস্বরূপ তিনি বরাহমিহিরের 'সংহিতা' থেকেও এক উদাহরণ পেশ করেছেন। দ্র. ষোড়শ অধ্যায়।]

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

তারকাপুঞ্জের সূর্য-সাপেক্ষ উদয় ও সে সকল সংস্কার ও অনুষ্ঠান যা এ সময়ে হিঁদুরা করে

তারকারাজির দৃশ্যমান হওয়ার জন্য সূর্যের অবস্থান কত দূরে হওয়া উচিত

তারকারাজি ও নবচন্দ্রের সূর্য-সাপেক্ষ উদয়ের গণনা সম্পর্কে আমাদের মত হলো হিঁদুদের ঐ সমস্ত বিধিমালা যার ব্যাখ্যা 'সিন্দহিন্দ' নামক পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। তারা যে কোনো তারকার সূর্য থেকে দূরত্বের মাত্রাকে 'কালাংশক' বলে অভিহিত করে, যাকে সূর্য-সাপেক্ষ উদয়ের জন্য আবশ্যক বলে গণ্য করা হয়।

স্পষ্ট যে, এ সম্পর্কে তারকারাজিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যা থেকে প্রথম বর্গে এমন তারকারাজি আসে যাকে ইউনানিরা প্রথম তথা দ্বিতীয় ঔজ্জ্বল্যের তারকারাজি ও তৃতীয় বর্গের তারকারাজি পঞ্চম তথা ষষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যের তারকারাজি বলে গণ্য করা হয়।

ব্রহ্মগুপ্তের 'খাণ্ডখাদ্যক'-এর পাঠ-সংশোধনে এরকমের বর্গীকরণের উল্লেখ করা উচিত ছিল কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি তার নিজের কথা অতিসাধারণভাবে বলেছেন আর কেবল একথাই বলেছেন যে, সমস্ত নক্ষত্রের সূর্যসাপেক্ষ উদয়ের জন্য সূর্য থেকে ১৪° ডিগ্রির পার্থক্য আবশ্যক।

[অগস্ত্য অর্থাৎ 'সুহাইল' বা 'ক্যানোপস'-এর সূর্য সাপেক্ষের গণনার জন্য কিছু পদ্ধতি দিয়েছেন ; সেই সঙ্গে ব্রহ্মগুপ্তের 'খাণ্ডখাদ্যক'-এর পাঠ সংশোধন থেকে কিছু উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। দ্র. ষোড়শ অধ্যায়।]

কতিপয় তারকার সূর্য-সাপেক্ষ উদয়ের সময় সম্পন্নকারী সংস্কারাদি

'সংহিতা' নামক গ্রন্থে কতিপয় যজ্ঞ ও সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে যা বিভিন্ন তারকার সূর্য-সাপেক্ষ উদয়ের সময় সম্পন্ন করা হয়। এখন আমরা ঐ সবের

উল্লেখ করব, সেই সঙ্গে অনুবাদও পেশ করব যাতে সারবস্তু খুবই কম, কেননা, আমরা এ দায়িত্ব স্বীকার করেছি যে, আমরা হিঁদুদের পুস্তকাবলিতে বর্ণিত তথ্যসমূহ পুরোপুরিভাবে অবিকৃতভাবে পেশ করে।

[অগস্ত্য, রোহিণী, স্বাতী ও শ্রবণের সূর্য-সাপেক্ষ উদয় তথা ঐ অবস্থার অনুকূল যজ্ঞের উপর বরাহমিহিরের পুস্তকের সুদীর্ঘ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। দ্র. ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়।]

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়

সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা কীভাবে আসে

[এ অধ্যায় 'মৎস্যপুরাণ' থেকে রাজা ঔর্বয়ের কাহিনি উদাহরণ দিয়ে শুরু হচ্ছে যেখানে 'সমুদ্রের পানির স্থির থাকার কারণ' বলা হয়েছে। রাজা দেবতাদের প্রতি বড়ই ক্রুদ্ধ হন কিন্তু পরে (দেবতারা) তা মেনে নেন এবং 'ক্রোধাগ্নি'-কে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দেন। আগুন পানিকে শুকিয়ে দেয় ফলে তাতে জোয়ার আসে না।

এরপর 'প্রজাপতি'র প্রসঙ্গ আসে যেখানে সে চাঁদকে অভিশাপ দেয় তার ফলস্বরূপ তার মুখে দাগ পড়ে যায়। কালান্তরে চাঁদ অনুশোচিত হয় এবং প্রজাপতির কাছে অনুনয় বিনয় করে যাতে তার কলঙ্ক মোচন হয়। প্রজাপতি বলেন যে, এমনটি তখনই হওয়া সম্ভব যখন চাঁদ পুজোর জন্য মহাদেবের লিঙ্গের মূর্তি স্থাপন করে। চাঁদ এমনটাই করে আর সে যে মূর্তি স্থাপন করে তাই সোমনাথ নামে অভিহিত হয়।

ইতিপূর্বে আল বিরুনী এক বিরল রাজনৈতিক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সোমনাথের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি। কেননা, তা ছিল এক প্রধান বন্দর যেখানকার ব্যবসায়ীরা পূর্ব আফ্রিকা ও চীনের সমুদ্রতীরে অধিবাসীদের বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করত। দ্র. অষ্টাদশ অধ্যায়।]

সোমনাথের মূর্তি

'সোম'-এর অর্থ চাঁদ আর 'নাথ'-এর অর্থ প্রভু আর এভাবে এর (সোমনাথ) অর্থ হয় চাঁদের প্রভু। এই মূর্তিকে শাহ মাহমুদ– রহমত উল্লাহ আলাইহি* ৪১৬ হিজরিতে নষ্ট করে দেন। তিনি আদেশ দেন যে, মূর্তির উপরিভাগ ভেঙে দেওয়া হোক আর তার শেষ ভাগ তাঁর স্বদেশ গজনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক এবং তার

* আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

সঙ্গে সমস্ত স্বর্ণাচ্ছাদন ভূষণ ও অলঙ্কারখচিত বস্ত্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তার কিছু অংশকে কাঁসার মূর্তি চক্রস্বামীনসহ, যা থানেশ্বর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা নগরের রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করা হোক। সোমনাথের মূর্তির একটি অংশ গজনীর মসজিদের দ্বারপ্রান্তে পড়ে আছে যাকে লোকেরা তাদের পায়ের ময়লা মোছার কাজে ব্যবহার করত।

'লিঙ্গ' মহাদেবের লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গের মূর্তি যার বর্ণনা নিচে দেওয়া হয়েছে :

লিঙ্গের উৎপত্তি

[এখানে আল বিরুনী লিঙ্গের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন আর বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' অবলম্বনে তার নির্মাণ শৈলীর কথাও উল্লেখ করেছেন।]

সোমনাথ মূর্তির পূজা

সিন্ধু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এ ধরনের মূর্তি হিঁদুদের আরাধনা গৃহগুলোতে পাওয়া যায়, কিন্তু এসবের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল সোমনাথ। প্রতিদিনই তারা গঙ্গাজলের একটি লোটা ও কাশ্মির থেকে ফুলের একটি করে টুকরি নিয়ে আসে। তারা বিশ্বাস করত যে, সোমনাথের লিঙ্গ প্রত্যেকটি বদ্ধমূল ব্যাধি নির্মূল করবে আর দুরারোগ্য ব্যাধির উপকার করবে।

সোমনাথের বিশেষরূপে এতটা প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো যে, তা ছিল মাঝি ও নাবিকদের বন্দর আর লোকেদের প্রতীক্ষাক্ষেত্র যারা চীন ও আফ্রিকার নানা দেশের মধ্যে যাতায়াত করত।

জোয়ার-ভাটার কারণ সম্পর্কে ধারণা

যেখানে ভারত মহাসাগরে জোয়ার-ভাটার প্রশ্ন, সেখানে তারা জোয়ারকে বলে 'ভর্ন' আর ভাটাকে বলে 'বুহার'। আমরা বলতে পারি যে, এ সম্পর্কে সাধারণ হিঁদুদের ধারণা হলো সমুদ্রে 'বাড়বানল' নামক আগুন থাকে যা সর্বদাই প্রজ্বলিত থাকে। আগুন যখন শ্বাস টানে তখন তা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেলে জোয়ার আসে, আর যখন শ্বাস ছাড়ে তখন হাওয়ায় উড়িয়ে না নিয়ে যেতে পারলে ভাটা আসে।

সোমনাথের পবিত্রতার উৎস

এই জোয়ার-ভাটার কারণেই সোমনাথের এই নামকরণ (অর্থাৎ চাঁদের প্রভু) হয়েছে ; কেননা, সোমনাথের পাথর (অথবা লিঙ্গ) মূলরূপে সমুদ্রোপকূলের পশ্চিমে স্বরস্বতী নদীর মোহনা থেকে তিন মাইলের কিছু কম দূরত্বে, স্বর্ণ দুর্গ

বরাইয়ের পূর্বে স্থাপন করা হয়েছিল যা বাসুদেবের বাসস্থান রূপে প্রকাশ হয়েছিল আর ঐ স্থান থেকে দূরে ছিল না, যেখানে তাকেসহ তার পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়েছিল আর শেষ সংস্কার করা হয়েছিল। প্রতিবারই যখন চাঁদের উদয়াস্ত হয় তখন সাগরের পানি বন্যার মতো ফুলে-ফেঁপে ওঠে আর এই স্থানকে ঢেকে দেয়। তারপর যখন চাঁদ মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রির গন্তব্য-বৃত্তে পৌঁছে যায় তখন ভাটার কারণে পানি পিছনে সরে যায়, ফলে ঐ স্থানটি আবার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এভাবে চাঁদ মূর্তির সেবা ও তাকে স্নান কর্মে সদা-নিরত থাকে। এই কারণে ঐ স্থানটিকে চাঁদের পুনীত বলা হয়। যে দুর্গে সেই মূর্তি ও তার কোষ ছিল, তা প্রাচীন ছিল না ; বরং প্রায় শত বছর আগেই তা নির্মিত হয়েছিল।

ঊনষষ্টি অধ্যায়

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

হিঁদু জ্যোতিষশাস্ত্রীরা একথা ভালোভাবেই জানেন যে, চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর ছায়া পতিত হয় বলেই চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্যের উপরে চাঁদের ছায়া পতিত হয় বলে সূর্যগ্রহণ হয়। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থে এটাই তাঁদের গণনার ভিত্তি।

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় এর কতিপয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে বরাহমিহিরের 'সংহিতা' থেকে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। বরাহমিহিরের মতে, 'চন্দ্রগ্রহণ তখনই হয় যখন চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সূর্যগ্রহণ তখনই হয় যখন চাঁদ সূর্যকে আড়াল করে নিজে গুপ্ত হয়ে যায়। এই কারণে চন্দ্রগ্রহণ কখনো পশ্চিম দিক থেকে এবং সূর্যগ্রহণ কখনো পূর্ব দিক থেকে আবর্তিত হবে না।' বরাহমিহির গ্রহণ সম্পর্কে জনসাধারণের অবৈজ্ঞানিক ধারণাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'কিন্তু জনসাধারণ অবশ্যই জোর গলায় প্রচার করে থাকে যে, এর মূল কারণ জগদীশ্বর। তিনি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ না ঘটাতেন তাহলে ব্রাহ্মণেরা ঐ সম্পর্কিত কৃচ্ছ্রসাধনের বিধান জারি করতেন না।'

আল বিরুনী এ ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করেছেন যে, বরাহমিহির যেখানে প্রথম ব্যাখ্যাতেই নিজের মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন এবং সত্যিকারের বিজ্ঞানীরূপে যেখানে সঠিক মতটি প্রকাশ করেছেন, সেখানে আবার এই অবৈজ্ঞানিক ধারণাটি পুনর্ব্যক্ত করেছেন কেন। সম্ভবত, নিজেই ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষ অবলম্বন করতে চেয়েছেন বলে নিজেকে এ ধরনের বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। এর অতিরিক্ত দোষ তাঁকে দেওয়া যায় না, কেননা, সব মিলিয়ে তিনি এখানে সঠিক ধারণাটি প্রকাশ করেছেন...।

[এরপর আল বিরুনী গ্রহণের ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন এবং ব্রহ্মগুপ্ত রচিত 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' থেকে নিম্নলিখিত উদাহরণ পেশ করেছেন।]

ব্রহ্মগুপ্ত থেকে উদাহরণ

'কিছু লোকের মতে গ্রহণের কারণ 'পরমেশ্বর' নয় কিন্তু সিদ্ধান্ত মূর্খতার নামান্তর, কেননা, বাস্তবে তা যা তাকে গ্রাস করে আর জনসাধারণের মতে, গ্রাসকারী পরমেশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে, যা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ভগবদ্‌বাণী, তাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বরই গ্রাস করেন। এরকমই মনু কর্তৃক রচিত 'স্মৃতি' ও ব্রহ্মা-পুত্র গর্গ রচিত 'সংহিতা'তেও এ কথাই বলা হয়েছে। এর বিপরীতে বরাহমিহির, শ্রীসেন, আর্যভট্ট ও বিষ্ণুচন্দ্রের মতে, গ্রহণের কারণ পরমেশ্বর নন ; বরং চাঁদ ও পৃথিবীর ছায়া। এ মত সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের ধ্যান-ধারণার বিরোধী, আর যে মত এইমাত্র উল্লেখিত হলো, তা বিদ্বেষ-প্রসূত। কেননা, পরমেশ্বরের কারণে গ্রহণ লাগে না, এসব হলো প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ, যা গ্রহণের সময় ব্রাহ্মণরা পালন করে থাকে, যথা– শরীরে গরম তেল মালিশ করা আর নির্দিষ্ট পূজাপাঠ ইত্যাদি সবটাই ভ্রষ্টাচার, আর তা থেকে কোনো পুণ্যলাভ হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি এ সমস্তকে মায়া-মোহ বলে অভিহিত করে তাহলে তা স্বীকৃত সিদ্ধান্তেরই বিপরীত আর এর অনুমতিও দেওয়া যায় না...।

[এখানেও আল বিরুনী বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত সর্বজনপ্রতিষ্ঠ জ্যোতিষশাস্ত্রীদের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ : তা সত্ত্বেও এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কেন তিনি বারবার টিপ্পনী হিসেবে উল্লেখ করলেন ?]

ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, 'এ সর্বসাধারণের সিদ্ধান্ত।' যদি এ থেকে তিনি একথা বোঝাতে চান যে, এরা জগতের সমস্ত মানুষ, তাহলে একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, তিনি তার যথার্থ গবেষণা-কর্মের মাধ্যমে 'তাদের সবার' মতামত জানতে সম্ভবত সমর্থ হতে পারেন। এর কারণ এই যে, সমস্ত বাসযোগ্য জগতের তুলনায় স্বয়ং ভারতই একটি নগণ্য দেশ, আর ধর্ম তথা বিধিবিধানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বাকি অংশের মানুষদের যে সংখ্যা সে তুলনায় হিঁদুদের সিদ্ধান্তের বিরোধী-মত পোষণকারীর সংখ্যা অনেক বেশি।

ব্রহ্মগুপ্তের পক্ষে সম্ভাব্য যুক্তি

অথবা যদি ব্রহ্মগুপ্তের অভিপ্রায় 'হিঁদু সর্বসাধারণ' হয়ে থাকে তাহলে আমরা একথা অবশ্যই স্বীকার করব যে, তাদের মধ্যে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা শিক্ষিত লোকেদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আমি একথাও অবশ্যই বলব যে, দৈবতত্ত্বানুযায়ী সমস্ত অশিক্ষিতকে সর্বদাই অজ্ঞ, সন্দিগ্ধ ও অকৃতজ্ঞ বলেও অভিহিত করা হয়।

ব্যক্তিগতভাবে এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মগুপ্ত যে কথা উপরোক্ত শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যাতে অন্তরাত্মার বিরুদ্ধে

পাপভাব নিহিত রয়েছে, তা অত্যন্ত আপত্তিকর বলে প্রতীত হবে- কিছুটা এমনও আছে যার মোকাবিলা সক্রেটিসকেও করতে হয়েছিল- যা তাঁর প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অপরিপক্ব বয়স হওয়ার কারণেই হয়ে থাকবে। তিনি 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' গ্রন্থ সেই সময়ে প্রণয়ন করেছিলেন, যখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। যদি এটাই হয় তার প্রধান কারণ তাহলে আমি এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি...।

[আল বিরুনী এ মন্তব্যের কিছু আগে এ কথাও বলেছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবত এ কারণেই প্রস্তুত করে থাকবেন, কেননা, ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে তিনিও ঐ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। অথবা এমনও হতে পারে যে, এ ধরনের মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্তকে বারবার উল্লেখের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে উপহাস করেছেন, যারা ঐ ধরনের মতবাদ সমর্থন করত।]

ষষ্টি অধ্যায়
পর্বণ

'পর্বণ' শব্দের ব্যাখ্যা

যে সময়ের মধ্যবর্তী কালে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সে সমস্ত চান্দ্র মাসের সংখ্যার বিশদ বর্ণনা 'আলমজীস্তী'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা সেই কালক্রমকে, যার শুরু ও শেষে চন্দ্রগ্রহণ হয় তাকে 'পর্বণ' বলে অভিহিত করেন।

[এ বিষয়ে বরাহমিহিরের 'সংহিতা' থেকে কিছু তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে, আর তার তালিকাও দেওয়া হয়েছে, যাতে গ্রহণ-চক্র ও তার বিশিষ্ট 'গুণ ও মৌসুমের বার্তা' দেখানো হয়েছে। শেষোক্তটির ব্যাপারে আল বিরুনী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'পর্বগুলোর ফলিত-জ্যোতিষ-সম্বন্ধের পূর্বলক্ষণ সম্পর্কে বরাহমিহির যা কিছু বলেছেন, তা তাঁর 'পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে না।'

পর্বগুলোর গণনার ব্যাপারে 'খাণ্ডখাদ্যক' গ্রন্থ হতে নিয়ম উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

একষষ্টিতম অধ্যায়
ধর্ম ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সময়ের অধিষ্ঠাতা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

কোন কাল মানে অধিষ্ঠাতা হয় আর কোনটার না হয়

কাল বা মহাকাল সম্পর্কিত বিষয়টি সরাসরি (কেবলমাত্র) স্রষ্টার সঙ্গেই সম্পর্কিত আর তিনিই 'তাঁর' আয়ুর প্রতীক– না তার কোনো আদি আছে, আর না আছে তাঁর অন্ত। বাস্তবে এটাই তাঁর নিত্যতা। তাঁর একে 'আত্মা' বা 'পুরুষ' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু যেখানে সময়ের সম্পর্ক, যার নির্ধারণ গতির মাধ্যমেই করা হয়, তার পৃথক-পৃথক অংশ স্রষ্টা ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর উপরেও প্রযুক্ত হয়, আর তা সম্পর্ক 'আত্মা' ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের সঙ্গেও সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এজন্য 'কল্প' এর প্রয়োগ সর্বদাই ব্রহ্মার সঙ্গেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে, কেননা, দিনও তাঁর, রাতও তাঁর, আর তাঁর জীবন এতেই নির্ধারিত।

প্রত্যেক মন্বন্তরের একজন বিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা বা অধিপতি হন, একে বলা হয় 'মনু'। মনুর বর্ণনা কিছু বিশেষত্বের সঙ্গে করা হয়ে থাকে, যার উল্লেখ পূর্ববর্তী কোনো অধ্যায়ে করা হয়েছে। এর বিপরীতে আমি 'চতুর্যুগ' বা 'যুগগুলো'র অধিষ্ঠাতাদের ব্যাপারে কখনো কিছু শুনিনি।

[আল বিরুনী বর্ষ ও মাসের নিয়ামকের নির্ধারণ সম্পর্কিত নিয়মগুলোর উল্লেখ করেছেন, যা 'খাণ্ডখাদ্যক'-এ দেওয়া হয়েছে, 'যা তারা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে থাকে।' তিনি কিছু তালিকাও দিয়েছেন, যাতে 'বিষ্ণুপুরাণ' অনুসারে বিভিন্ন গ্রহের অধিষ্ঠাতাদের তালিকাও দিয়েছে।]

দ্বাষষ্টি অধ্যায়
সংবৎসর বা ষষ্টাব্দ প্রসঙ্গ

'সংবৎসর' তথা 'ষষ্টিঅব্দ' শব্দাবলির ব্যাখ্যা

সংবৎসর শব্দটির অর্থ হলো 'বর্ষ', আর তা এমনই এক পারিভাষিক শব্দ যে, তা বর্ষচক্রের জন্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে যা বৃহস্পতি ও সূর্যের আবর্তনকে অবলম্বন করে নির্ধারিত হয়। আর বৃহস্পতির সহসূর্যের উদয়কে এর শুরু বলে মান্য করা হয়। এ ষাট বছরে তার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে আর এ কারণে একে 'ষষ্টিঅব্দ'– অর্থাৎ 'ষাট বছর'– বলা হয়।

ষাট বর্ষের চক্রে নিহিত লঘুতর চক্র

মহাযুগসমূহের প্রারম্ভে বৃহস্পতি সহসূর্য বহিষ্ঠা ও মাঘ মাস নক্ষত্রের প্রারম্ভে উদিত হয়। ছোট যুগের সঙ্গে মহাযুগের একটি বিশেষ ক্রম রয়েছে যা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। আর এই দলগুলো বিশেষ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত আর সেগুলোর প্রত্যেকটির একজন করে অধিপতি করেছেন। এ বিভাজন নিম্নলিখিত তালিকায় দেখানো হয়েছে...।

[সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।]

সংবৎসরের পৃথক পৃথক বর্ষগুলোর নাম

ষষ্টি বর্ষের প্রতিটি বর্ষের পৃথক পৃথক নাম রয়েছে এবং যুগগুলোর নামকরণ তাদের অধিপতিদের নামানুসারেই হয়ে থাকে। এর সবকটি নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

এই তালিকাটির ব্যবহারও পূর্বের তালিকাটির ন্যায়ই করা উচিত, এর ফলে, আপনি সমস্ত কাল-চক্রের (ষাট বর্ষের) প্রত্যেক বর্ষের নাম ঐ সংখ্যাগুলোর নিচে পেয়ে যাবেন। যদি আমি ঐ নামগুলোর অর্থ ও তার আনুমানিক ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে তা হবে অত্যন্ত পরিশ্রম-সাধ্য ও দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। এর সমস্তটাই আপনি 'সংহিতা' নাম পুস্তকে পেয়ে যাবেন।

[তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।]

ত্রিষষ্টি অধ্যায়

এমন বিষয় যা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা তাদের আজীবন মেনে চলতে হয়

ব্রাহ্মণদের জীবনের প্রথম অবস্থা

সাত বছর পরে ব্রাহ্মণদের জীবন চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ শুরু হয় আট বছর বয়সে, যে সময় ব্রাহ্মণরা তাকে দীক্ষা দেন, তার কর্তব্য পালনের শিক্ষা দেন এবং সারাজীবন তা যথাযথরূপে পালন করে চলার শিক্ষা দেন। সে সময়ে তাদের কোমরে একটি কটিবন্ধ বেঁধে দেন এবং তাকে একজোড়া যজ্ঞোপবীত পরিয়ে দেন– এই যজ্ঞোপবীত এক মজবুত সুতো দিয়ে তৈরি, যার নয়টি স্তবক হয়ে থাকে– আর তৃতীয় একটি উপবীত হয় যা কাপড় দিয়ে তৈরি হয়। এই কটিবন্ধ বাম কাঁধ থেকে ঝোলানো হয় যা ডান ধারের কোমর পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তাছাড়া তাকে একটি দণ্ড প্রদান করা হয় আর 'দর্ভ' (দূর্বা ?) নামক এক প্রকারের ঘাসের তৈরি একটি আংটি ডান হাতের অনামিকা আঙুলে পরিয়ে দেওয়া হয়। এই 'আংটি' (মুদ্রিকা)-কে পবিত্র বলেও অভিহিত করা হয়। অনামিকার এই আংটি পরার উদ্দেশ্য হলো যে, তা সকলের জন্য এক শুভ লক্ষণ ও আশীর্বাদ বলে সিদ্ধ হয়। এই আংটি পরিধানের বিধান যজ্ঞোপবীত ধারণের ন্যায় সঠিক নয়। কেননা, যজ্ঞোপবীতকে কোনো অবস্থাতেই সে দেহ থেকে আলাদা করতে পারবে না। যদি ভোজন বা মলত্যাগের সময়েও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তবুও তাকে পাতকী হতে হয় এবং তা নিবারণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যা ব্রত বা ভিক্ষাদান ব্যতীত সম্ভব হয় না।

ব্রাহ্মণের জীবনের এ প্রথমাবস্থা তার জীবনের পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত বা 'বিষ্ণুপুরাণ' অনুসারে আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকে। এ সময় তার কর্তব্য হলো সংযতভাবে জীবন অতিবাহিত করা, মাটিতে শয়ন, বেদ তথা ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায় সম্পর্কিত ভাষ্যগুলোর অধ্যয়ন শুরু করা এবং তার যে গুরু এসব বিষয় শিক্ষাদান করেন দিনরাত তাঁর সেবা করা। তারা দিনে তিন বার স্নান করে এবং সকাল

সন্ধ্যায় হবন (যজ্ঞ) করে। হবনের পরে নিজের গুরুকে তারা পুজো করে। সে সময়ে তারা একদিনও ব্রত পালন করে, পরদিন ভোজন করে, এ সময়ে তাদের জন্য মাংস খাওয়া বারণ। তারা গুরুগৃহেই বাস করে, আর তখনই তারা গুরুগৃহের বাইরে যেতে পারে, যখন তাদের ভিক্ষা করতে হয়, এ সময়ে তারা দিনে পাঁচটি গৃহের বাইরে ভিক্ষা করতে পারে না। এই ভিক্ষাযাত্রা তারা দুপুরে অথবা সন্ধ্যার সময়ে করে। ভিক্ষা হিসেবে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় তা গুরুর চরণে নিবেদন করে, তা থেকে গুরু যতটা ইচ্ছা গ্রহণ করেন। বাকিটুকুই গুরুর কাছ থেকে সে লাভ করে। এভাবে শিষ্যরা গুরুর অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করে। এছাড়া তারা আগুনে আহুতির জন্য জ্বালানি সংগ্রহ করে– যা দুই প্রকার বৃক্ষ থেকে আসে– পলাশ ও দর্ভ (দূর্বা ?)– তাই হয়ে থাকে যজ্ঞের জ্বালানিকাঠ। এর কারণ এই যে, হিঁদুরা আগুনের উপাসনা করে আর তাতে পুষ্পার্পণ করে। অন্যান্য জাতির মধ্যেও এর প্রচলন আছে। তাদের ধারণা যে, যজ্ঞকে দেবতারা তখনই গ্রহণ করেন যখন তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, আর অন্য কোনো প্রকারের পুজো– তা সে মূর্তিপুজো, গ্রহনক্ষত্রাদির পুজো, গরু অথবা গর্দভ অথবা অন্যান্য মূর্তির পুজো– তাদের যজ্ঞ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এই কারণেই বশশর ইবনে বুর্দ বলেন, 'অগ্নি আছে বলেই আরাধনা।'

ব্রাহ্মণ জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা

তাদের জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা বা পর্যায় হলো পঁচিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত– অথবা 'বিষ্ণুপুরাণ' মতে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। গুরু তাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন। সে বিবাহ করে, গৃহী হয় এবং সন্তান কামনা করে এবং সে প্রতি মাসে মাসিক ধর্ম থেকে নিবৃত্ত হবার পর তার পত্নীকে সম্ভোগ করতে পারে। সে বারো বছরের অধিক বয়সী মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার অনুমতি পায় না। সে জীবিকা উপার্জন করে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়দের শাস্ত্রজ্ঞানদানের দক্ষিণা-স্বরূপ, এ দক্ষিণা পারিশ্রমিক নয় ; বরং তা উপহার হিসেবে গ্রহণ করা হয়– অথবা তার জীবিকানির্বাহ ঐ সমস্ত উপহারাদি থেকে হতে পারে যা যজ্ঞাদি বা রাজা বা সামন্তদের কাছ থেকে উপহার চাওয়ার পরিণাম স্বরূপ, তবে, শর্ত যে, তা বিশেষ আগ্রহবশত হতে হবে, অনিচ্ছাবশত হলে হবে না। তাদের ঘরে সর্বদাই একজন ব্রাহ্মণ থাকেন যিনি ধর্মীয় বিধিবিধান ও আচারাদির শিক্ষা দেন এবং পালন করিয়ে থাকেন এবং ধর্মকর্মের মাধ্যমে তাদের (মুক্তির) পথ দেখিয়ে থাকেন। এদের পুরোহিত বলা হয়। ব্রাহ্মণের জন্য অন্তিম শর্ত এই যে, তিনি মাটি (নিচে) থেকে অথবা বৃক্ষলতাদি হতে যা কিছু পাবেন তাই দিয়ে জীবনযাপন করবেন। তিনি কাপড়-চোপড় তথা পানসুপারির ব্যবসা

করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে, তার জন্য এটাই শ্রেয়তর যে, ব্যবসা তিনি নিজে না করে কোনো বৈশ্যকে দিয়ে করাবেন। মূলরূপে তার জন্য ব্যবসা নিষিদ্ধ এই কারণে যে, তার মধ্যে ধোঁকাবাজি ও ছলচাতুরীর ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে। তার জন্য ব্যবসায়ের অনুমতি কেবলমাত্র ঐ অবস্থাতেই রয়েছে যেখানে জীবিকার জন্য তার আর কোনো পথ খোলা না থাকে। অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণের জন্য কোনো প্রকার কর দেওয়া বা রাজ-রাজড়াদের সেবা-যত্ন করা বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়া তাদের জন্য লাগাতারভাবে ঘোড়া বা গরুর পাল রেখে দেওয়ার অনুমতি নেই ; তারা না পশুপালন করতে পারে আর না সুদখোরির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করতে পারে। তাদের জন্য নীল রং অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়, এজন্য তাদের শরীরে নীল রং লেগে গেলে স্নানের বিধান রয়েছে। অবশেষে, তাদের জন্য যজ্ঞের সময় ঢোল বাজানো এবং অবসর সময়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থাবলির পাঠও তাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় অবস্থা

ব্রাহ্মণের জীবনের তৃতীয় অবস্থা পঞ্চাশ বছর বয়সের পর থেকে পঁচাত্তর বছর বা 'বিষ্ণুপুরাণ' অনুসারে নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। যে সময়ে তারা ব্রত পালন করে, গার্হস্থ্য ত্যাগ করে ঘরের বাইরে, তার পত্নী যদি তার সঙ্গে বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকতে রাজি না হয় তাহলে তাকে তার পুত্রের হাতে সোপর্দ করে চলে যায়। সে সমাজের বাইরে চলে যায় এবং জীবনের প্রথমাবস্থার ন্যায় জীবনযাপন করে। সে কোনো বন্ধনের মধ্যে থাকে না, আর বল্কল ছাড়া অন্য কোনো বস্ত্র পরিধান করে না। সে কোনো বিছানা ছাড়াই মাটিতে শয়ন করে এবং ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। তার কেশ বড় করে নেয় এবং তাতে তেল পর্যন্ত লাগায় না।

চতুর্থ অবস্থা

চতুর্থ অবস্থা জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত জারি থাকে। সে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে এবং হাতে একটি ছড়ি রাখে। সে সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকে ; সে নিজের মন থেকে শত্রুতা ও মিত্রতার ভাব মুছে ফেলে। কাম, ক্রোধ, মোহ পরিত্যাগ করে। সে কারো সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করে না। সে যদি দৈবী আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য কোনো বিশিষ্ট স্থানে যাত্রা করে তাহলে পথিমধ্যে কোনো গ্রামে একদিনের বেশি এবং কোনো নগরে পাঁচদিনের বেশি যাত্রা বিরতি করে না। যদি তাকে কেউ কিছু দেয় তাহলে সে পরবর্তী দিনের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখে না। সে মুক্তির যে যাত্রাপথে অগ্রসর হয় সেই পথে মুক্তি সাধন ছাড়া আর তার কোনো কাজ থাকে না এবং সেখান থেকে ফিরে সে পুনরায় সংসার জীবনে প্রবেশ করে না।

ব্রাহ্মণদের সাধারণ ধর্ম

সারাটি জীবন ধরে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত সার্বজনীন কর্তব্য পালন করতে হয় তা হলো, পুণ্যকর্ম , ভিক্ষাদান তথা ভিক্ষাপ্রাপ্তি, কেননা, ব্রাহ্মণ যা কিছু দান করে তা তাদের পিতৃপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেজন্য তাদের নিরন্তর পড়তে থাকা, যজ্ঞ করা, যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় তাতে তা নিরন্তর প্রজ্বলিত রাখা, তাতে নৈবেদ্য চড়ানো, তার পুজো করা, আর তাকে নিভতে না দেওয়াটাই হলো অনিবার্য বা অত্যাবশ্যক কর্ম ; যাতে মৃত্যুর পরে তাতেই তার দাহ-সংস্কারকর্ম সম্পন্ন হতে পারে। একে বলা হয় 'হোম'।

প্রতিদিন তিনবার স্নান করা তাদের অত্যাবশ্যক : সূর্যোদয়ের সন্ধির সময়, সূর্যাস্তের সন্ধির সময় আর এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সময়। প্রথম স্নান তো নিদ্রার কারণেই করা হয়, কেননা, তাতে শরীরের গ্রন্থিগুলো দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই স্নান আকস্মিক অশুচিতা, পবিত্রতা অর্জন ও প্রার্থনার প্রস্তুতির জন্য করা হয়ে থাকে।

তাদের প্রার্থনার স্তুতি, কীর্তন ও তাদের বিশিষ্ট রীতি অনুসারে প্রণিপাতের বিধান রয়েছে, অর্থাৎ তারা তাদের দুই হাতের দুই আঙুলকে দণ্ডবৎ সোজা রেখে জুড়ে দিয়ে নিজের মুখকে সূর্যের দিকে ফেরায়। এর কারণ এই যে, সূর্য দক্ষিণ ছাড়া আর যে দিকেই থাকুক না কেন, সেটা তাদের 'কিবলা' স্বরূপ মনে করে, কেননা, তারা তাদের মুখকে দক্ষিণ দিকে ফেরানোটা পুণ্যজনক মনে করে না! তারা দক্ষিণাভিমুখী তখনই হয় যখন তারা অমঙ্গল বা অশুভ কিছু কামনা করে।

সূর্য যখন অপরাহ্ণকাল অতিক্রম করে বা অপরাহ্ণের নিচে নেমে যায় তখন সেই সময়কে তারা কোনো দৈবী পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অনুকূল বলে মনে করে। সে জন্যে ঐ সময়ে ব্রাহ্মণদের পবিত্র হওয়া উচিত।

সন্ধ্যায় তারা পুজো-পাঠ ও রাতের ভোজন সম্পন্ন করে। ব্রাহ্মণ রাতের ভোজন সম্পন্ন করে স্নান ছাড়াই সন্ধ্যা পুজো করতে পারে। সে জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় স্নানের তুলনায় এ স্নানটির বিধান অনেকটা শিথিল।

রাতের স্নান ব্রাহ্মণদের জন্য কেবল সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময়েই অনিবার্য ; যাতে ঐ সময়টির জন্য তারা যথাবিহিত নিয়ম পালন ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

ব্রাহ্মণরা আজীবন দিনের মধ্যে কেবলমাত্র দু'বার ভোজন করে থাকে– দুপুরে এবং রাতে। আর যখনই তারা খেতে বসে তখন খাওয়া শুরুর আগে সে ততটা খাদ্যবস্তু আলাদা পাত্রে রেখে দেয় যা এক বা দুই ব্যক্তির জন্য, বিশেষভাবে কোনো অপরিচিত ব্রাহ্মণের ভোজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে, যারা সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা করতে বেরোয়। তাদের ভরণ-পোষণকে উপেক্ষা করাটা পাপ বলে বিবেচনা করা হয়। এর অতিরিক্ত কিছু খাদ্যসামগ্রী পশুপাখিদের ভক্ষণ ও অগ্নিদেবতার

জন্য পৃথক করে রেখে দেয়। অবশিষ্ট ভোজনসামগ্রীকে মন্ত্রোচ্চারণের পর ভক্ষণ করে। তাদের খাদ্যপাত্রে যা-কিছু অবশিষ্ট থাকে তা তাদের গৃহের বাইরে অরক্ষিতভাবে রেখে দেয় আর তারপরে তারা সেখানে আর যায় না, কেননা, তা তাদের জন্য বারণ। আর তা কেবল ঐ সমস্ত পথিক বা পশুপাখি বা কুকুরের জন্য নির্ধারিত থাকে যারা সংযোগবশত এদিক-ওদিক থেকে এসে পড়ে।

ব্রাহ্মণের কাছে পানপাত্র থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি কেউ তা ব্যবহার করে তাহলে তা ভেঙে ফেলা হয়। একই নিয়ম খাদ্যপাত্রের জন্যও প্রযোজ্য। আমি এমন ব্রাহ্মণকে দেখেছি যিনি তাঁর স্বজনদের নিজেরই খাদ্যপাত্রে খাওয়াচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যেকার অধিকাংশ লোকেরই তা ছিল অপছন্দের।

তারা উত্তরে সিন্ধু নদ ও দক্ষিণে চর্মাবতী নদীর মধ্যস্থলে বসবাস করে। তাদের এ দু'দিকের কোনো সীমা লংঘন করার অনুমতি নেই যাতে তারা উত্তরে তুর্কিদের দেশ ও দক্ষিণে কর্ণাটের মধ্যে প্রবেশ না করে। সেই সঙ্গে তারা মনে করে তাদের পূর্ব ও পশ্চিম মহাসাগরের মধ্যে বসবাস করা উচিত। তাদের লোকেরা বলে থাকে যে, তাদের এমন কোনো দেশে বসবাসের অনুমতি নেই, যেখানে অনামিকা আঙুলের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাস জন্মায় না আর যেখানে কালো পশমওয়ালা হরিণ চরে বেড়ায় না। এ বিবরণ ঐ সমস্ত দেশগুলোর জন্য (প্রযোজ্য) যা উপরে উল্লেখিত সীমানাগুলোর মধ্যে অবস্থিত। ঐ সমস্ত সীমা অতিক্রম করাটা তারা পাপ বলে মনে করে।

এমন দেশে যেখানে ঘরের ঐ সমস্ত জায়গাগুলো এ কারণে তৈরি করা হয় যে, সেখানে লোকেরা বসে ভোজন করে কিন্তু মাটি দিয়ে লেপা হয় না ; বরং তার বিপরীতে ভোজনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক চতুষ্কোণ জায়গা তৈরি করা হয় এবং সে জায়গাগুলো গোবর জল ছিটিয়ে লেপে দেওয়া হয়, ব্রাহ্মণের চৌকো আসন চতুর্বর্গাকার হওয়া উচিত। যাদের মধ্যে ও ধরনের চতুষ্কোণ আকৃতির বানাবার প্রথা আছে তারা বলেন, যেখানে বসে খাওয়া হয় এবং জায়গাটি এঁটো লেগে অপবিত্র হয়ে যায়। সেজন্য খাওয়ার পরে গোবর-জল দিয়ে লেপে ওটাকে পবিত্র করে তোলা হয়। এঁটোর স্থানটিতে সামান্য দাগ থাকলে অন্য জায়গাটিও এঁটো ও অপবিত্র বলে মনে করা হয়। কেননা, তারা পরস্পর সংলগ্ন।

ধর্মশাস্ত্রে তাঁদের জন্য পাঁচ রকমের সবজি খাওয়া নিষেধ : পেঁয়াজ, রসুন, এক বিশেষ প্রকারের লাউ, গাজরের মতো কন্দ যাকে 'ক্রঞ্চন' বলে, আর এক ধরনের তরকারি যা পুকুর বা দিঘিতে জন্মায় যাকে তারা 'নালী' (নাল বা শাপলা ?) বলে।

চতুঃষষ্টি অধ্যায়

ধার্মিক কৃত্য রীতি-রেওয়াজ যা ব্রাহ্মণেতর জাতিদের আজীবন পালন করতে হয়

বিভিন্ন জাতির কর্তব্যকর্ম

ক্ষত্রিয়রা বেদাধ্যয়ন করতে পারে, তা কণ্ঠস্থও করতে পারে কিন্তু কাউকে তা শিক্ষা দিতে পারে না। তারা অগ্নিতে নৈবেদ্য চড়ায় এবং পৌরাণিক বিধিমত আচরণ করে। তারা ভোজনের জন্য ত্রিকোণাকার আসন তৈরি করে। তারা প্রজা-শাসন করে, তাদের রক্ষা করে, কেননা, ঐ কাজের জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা তিন সুতার তৈরি সুতা দিয়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, আর কাপড়ের দড়ি এবং একটা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। বারো বছর বয়স পূর্ণ হলেই তা ধারণ করা হয়।

বৈশ্যদের কাজ হলো চাষবাস করা, জমি-জিরেত দেখাশোনা করা, পশুপালন করা ও ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন পূরণ করা। এদের দুই সুতার একটি উপবীত ধারণের অধিকার রয়েছে ...।

শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের সেবকের ন্যায় হয়ে থাকে, তারা তাদের কাজকর্ম ও দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। সর্বদাই দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও যদি যজ্ঞোপবীত ধারণ তারা করতে চায় তাহলে তারা একটি কাপড়ে দড়ি ধারণ করতে পারে। ব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত যে কোনো কাজই তাদের জন্য নিষিদ্ধ–যেমন– সান্ধ্যপূজাপাঠ, বেদপাঠ, আগুনে আহুতি দেওয়া। এমনকি যদি উদাহরণস্বরূপ, কোনো বৈশ্য বা শূদ্র সম্পর্কে যদি একথা প্রমাণ হয় যে, তারা বেদপাঠ করেছে, তখন অপরাধী হিসেবে তাদের রাজার কাছে হাজির করা হয়, রাজা তখন তার জিভ কেটে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু পরমাত্মার উপাসনা বা অন্যান্য পুণ্যকর্ম ও ভিক্ষাদানের মতো কাজগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।

প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট কাজের বাইরে কোনো কাজ করা নিষিদ্ধ, যেমন– ব্রাহ্মণদের জন্য ব্যবসা করা, শূদ্রদের জন্য চাষবাস করা– তা এমন পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য হয়, যা চৌর্যবৃত্তির সমতুল্য।

[আল বিরুনী হিঁদুদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, রামের যুগে মানুষেরা অনেক দিন বাঁচত আর তা ছিল সুনিশ্চিত, এমনকি পিতার আগে পুত্র কখনোই মরে না। কিন্তু একবার পিতার আগে পুত্র মারা যাওয়ার মতো একটি ঘটনা ঘটে। পিতা তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, দেশে কিছু অঘটন-কুঘটন ঘটে যাচ্ছে, যার ফলে এই অবস্থা...। তখন রাম তার কারণ জানার জন্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক চণ্ডালের সন্ধান পেলেন, যে বড় পরিশ্রম সহকারে ভগবত-পুজো ও তপস্যায় রত ছিল, রাজা ঘোড়ায় চড়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। তিনি দেখলেন যে, সে গঙ্গাতীরে পা উপরের দিকে দিয়ে মাথাটা নিচে কোনো কিছুর সঙ্গে লটকে রেখেছে। রাজা ধনুকে বাণ সংযোজন করে তীর নিক্ষেপ করে তার নাড়িভুঁড়ি বের করে দিলেন। তারপর তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোকে এই সৎকর্মের জন্য হত্যা করেছি, যা করার অধিকার তোর নেই।' এবার রাজা রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে দেখলেন, ব্রাহ্মণের পুত্র পুনর্জীবন লাভ করেছে।]

চণ্ডাল ছাড়া সমস্ত অহিঁদুকেই তারা ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র বলে অভিহিত করে। যারা মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখি হত্যা করে এবং গোমাংস ভক্ষণ করে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত মানুষের সমান হওয়ার ব্যাপারে দার্শনিক মতামত

এসবের মূলেই রয়েছে জাতি ও শ্রেণীবিচার, যার ফলে এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর লোককে মূর্খ বা অশুভ বলে মনে করে। এর বাইরে সমস্ত মানুষই পরস্পর সমান। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে বাসুদেবের অভিমত হলো যে, মুক্তিকামী মানুষেরা পরস্পর সমান। তিনি বলেন, 'বুদ্ধিমান মানুষের বিচারে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, শত্রু ও মিত্র সমান, বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসঘাতক সমান, এমনকি সাপ ও নেউলেও সমান।' কেবলমাত্র মূর্খদের বিচারে তারা অসমান ও ভিন্ন।

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়
যজ্ঞ

অশ্বমেধ

বেদসমূহের অধিকাংশতেই যজ্ঞবিষয়ক আলোচনা রয়েছে এবং তাতে প্রত্যেক যজ্ঞের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞসমূহের কোনো কোনোটা এমনই যে, তা কেবলমাত্র চক্রবর্তী রাজারাই সম্পন্ন করতে পারেন, যেমন– 'অশ্বমেধ'। এ যজ্ঞে এক অশ্বকে সমগ্র দেশ পরিক্রমার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, কেউ যেন তার পথরোধ না করে। সৈনিকেরা তার পিছু-পিছু হাঁক দিতে দিতে এই বলে চলতে থাকে যে, 'এ পৃথিবীর সম্রাট, যে তা মানতে অস্বীকার করে, সে মোকাবিলার জন্য সামনে আসুক।' ব্রাহ্মণ তার পিছে-পিছেই চলে এবং যে সমস্ত স্থানে সে বিষ্ঠা ত্যাগ করে সে তাতে যজ্ঞ করে। এভাবে সমস্ত ভূখণ্ড ঘুরে সে যখন তার আপন জায়গায় ফিরে আসে তখন সে তার মালিক ও ব্রাহ্মণদের ভোজ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

সাধারণ যজ্ঞ

হিঁদুদের মতে, আগুন সর্বভুক। এজন্য যে কোনো অপবিত্র বস্তু– যেমন জল– এতে মিশে গেলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। এজন্য অগ্নি ও জল অহিঁদুদের হাতে চলে গেলে হিঁদুরা তা নিজেদের জন্য আর পবিত্র বা বৈধ জ্ঞান করে না, কেননা, তাদের স্পর্শে তা-ও নষ্টভ্রষ্ট হয়ে যায়।

আগুনের উপরে যা কিছু অর্পণ করা হয় তা দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়, কেননা, আগুন তাদের মুখ থেকেই নির্গলিত হয়। ব্রাহ্মণরা যা কিছু আগুনে নিক্ষেপ করে বা আহুতি দেয়, তা হলো তেল, খাদ্যবস্তু– গম, যব ও চাল। এ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু তাতে আহুতি দিলে তার জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হয়। কিন্তু তা যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে তাতে চড়ানো হয় তাহলে কোনো মন্ত্র পড়ে না...।

[অগ্নির কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হওয়ার কাহিনি 'বিষ্ণুধর্ম' থেকে নেওয়া হয়েছে।]

ষষ্ঠষষ্টি অধ্যায়
তীর্থক্ষেত্র দর্শন ও তীর্থযাত্রা

হিঁদুদের জন্য তীর্থযাত্রা অনিবার্য নয় ; বরং তা অন্য একটি বৈকল্পিক ব্যবস্থা ও অনন্য পুণ্যকর্ম। কোনো মানুষ কোনো তীর্থক্ষেত্রে গমনের জন্য ঘর থেকে রওনা দেয় আর কেউ প্রখ্যাত বিগ্রহ দর্শনের জন্য অথবা পবিত্র নদীসমূহে পুণ্যস্নান করতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা ঐ সমস্ত স্থানে পুজো করে, মূর্তির উপাসনা করে, তাতে কিছু অর্ঘ্য অর্পণ করে, স্তব-স্তুতি করে, প্রার্থনা করে, ব্রত পালন করে, ব্রাহ্মণ, পূজারি ও অন্যান্যদের ভিক্ষাদান করে। সে তার মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে তারপর ঘরে ফিরে আসে।

বহু ক্ষেত্র ও পবিত্র সরোবর মেরুপর্বতের হিমগিরিতে অবস্থিত...।

পবিত্র সরোবর খবব

আমি হিঁদুদের পুরাণসমূহ হতে এ বিষয়ে পূর্বেই অবহিত করেছি যে, দ্বীপগুলোতে গঙ্গার ন্যায় বেশ কিছু নদী আছে। এরকম প্রতিটি স্থানেই বিশেষ পবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানগুলোতে হিঁদুরা পুণ্যস্নানের জন্য সরোবর নির্মাণ করে। এতে তারা অনেক উচ্চস্তরের কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়েছে, যা আমরা মুসলমানরা দেখে বিস্মিত হয়ে যাই, আর তারই মতোই সুন্দর কোনো বস্তু নির্মাণ তো দূরের কথা, তার বর্ণনাও করতে পারি না। তারা এ সমস্ত সরোবর নির্মাণের সময় ভারী-ভারী এবং বড় বড় পাথর মজবুত লোহাদণ্ডের সাহায্যে উঠিয়ে পরস্পর সাজিয়ে সরোবরের চারপাশে (তলায়) মানুষ-সমান ভিতের সাহায্যে গেঁথে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করে। এই ধরনের সিঁড়িগুলো একরকম সড়কের ন্যায় কাজ করে (যা পুকুরের অভ্যন্তরে পর্যন্ত বিস্তৃত)। আর যার মাধ্যমে তারা উপর-নিচে ওঠানামা করে। সিঁড়িগুলো এরকম হওয়ার কারণে লোকেরা নির্বিঘ্নে ওঠানামা করতে পারে, কেউ কারো দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সিঁড়িগুলো বেষ্টিত হওয়ার কারণে যে কেউ যে কোনো দিকে যাতায়াত করতে পারে। এটা এমন এক ব্যবস্থা যে ভিড় বৃদ্ধি হলেও তা কারো জন্য কষ্টকর প্রতীত হয় না।

বিভিন্ন পুণ্যসরোবর

মুলতানে একটি সরোবর আছে, সেখানে হিঁদুরা স্নান সেরে সেখানেই পুজো করে। [থানেশ্বরে অবস্থিত পবিত্র সরোবর সম্পর্কে বরাহমিহিরের 'সংহিতা' থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।]

বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে অসমতা ও দেশপ্রেমের উদ্গম : শৌনক ভাষ্য

এ সমস্ত সরোবরের পবিত্রতার প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে জনশ্রুতি, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো পৌরাণিক বৃত্তান্ত। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমি শৌনকের ভাষ্যের উল্লেখ করেছি। শুক্র ব্রহ্মার আদেশে একথা তাকে বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে যা ছিল ব্রহ্মকর্তৃক সম্বোধিত। যাতে বলা হয়েছে, সে ঐ সময় পর্যন্ত কী করবে, যতক্ষণ নারায়ণ তাকে পাতালপুরিতে নিয়ে না যায় ! ঐ পাঠে এ ঘটনাও এসেছে : 'আমি তার সঙ্গে এজন্যই এমনটি করছি যে, মানুষের মধ্যে সাম্যের যে নীতি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান তা তারই প্রতিরোধের কারণেই। জীবনের প্রতিটি স্তরে স্তরে মানুষে মানুষে প্রভেদের ভিত্তিতেই পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হবে। অধিকন্তু, মানবজাতি তাকে পুজো না করে আমাকেই করবে, আমার প্রতিই আস্থা রাখবে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে মানুষের মধ্যে প্রবেশ এবং পার্থক্য আছে বলেই সভ্য মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রচলন আছে। অনুরূপ নীতিতেই ঈশ্বরও পৃথিবীর মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বা বিভেদের সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে, দেশে দেশে এত প্রভেদ। কোনো দেশ শীতল, কোনো দেশ অত্যধিক উষ্ণ ; কোনো দেশে জমি, জল, বায়ু অত্যুত্তম আবার কোনো দেশে নোংরা, বা নিকৃষ্ট, ভূমি অনুর্বর, আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর ; এই ধরনের প্রভেদ এবং পার্থক্য আরও বহু প্রকারের আছে, কোথাও বা অত্যধিক সুবিধা আবার কোথাও বা সীমাহীন উৎপীড়ন। পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে ঘটে সীমাহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবার কোথাও তার নামগন্ধ পর্যন্ত থাকে না। এজন্য শহর গড়ার আগে সভ্য জাতি স্থান নির্ণয় করে অত্যন্ত সাবধানে।

যে সমস্ত বস্তু এসব কাজ সম্পন্ন করে তার মূলে রয়েছে তাদের রীতি-রেওয়াজ। কিন্তু ধর্মীয় নীতি-নির্দেশের তুলনায় তা অনেকটাই শক্তিশালী। প্রথা এবং রীতিনীতি সাধারণত বিচার এবং বিবেচনা সাপেক্ষ। ধর্মীয় নির্দেশ কিন্তু তা নয়। অধিকাংশ মানুষ অন্ধবিশ্বাসেই তা মেনে নেয়। তর্ক করে না, কারণ অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করে না। তাদের অবস্থা ঐ অনুর্বর ভূমির ন্যায়, যারা ঐ আবহাওয়ায় জন্মায় এবং সেখানকার উৎপন্ন বস্তুকে তারা ইতরবিশেষ মনে করে না, তারা ঐ দেশকে মাতৃভূমি বলে মানে আর তারা (শত অসুবিধা সত্ত্বেও) দেশত্যাগের কথা কখনোই ভাবে না। প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় বা আইন-সংক্রান্ত দৃষ্টিতেও যদি পার্থক্য থেকে থাকে তবুও দেশের প্রতি তাদের আকর্ষণ এত গভীর যে, মন থেকে তা মুছে ফেলা সম্ভব হয় না।

বারানসি : সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল

হিঁদুদের এমন কিছু পুণ্যতীর্থ আছে, যা তাদের ধর্মসম্পর্কিত নিয়মকানুনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যেমন বেনারস (বারানসি)। সাধু-সন্ন্যাসীরা সেখানে এসে পড়ে থাকাটাকে পুণ্যজ্ঞান করে, যেমনটি কাবাগৃহের কারণে অনেকেই মক্কায় থেকে যায়। তারা আজীবন সেখানেই রয়ে যায় যাতে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করতে পারে। তাদের মতে, হত্যার অপরাধে যে ব্যক্তি তারই অনুরূপ দণ্ডভাগী হয়, সেও যদি বারানসিতে আসে তাহলে সে ক্ষমা লাভ করে...।

এরকমই আরেকটি পুণ্যতীর্থের নাম থানেশ্বর, যাকে কুরুক্ষেত্র বা কুরুর দেশ বলেও অভিহিত করা হয়, যিনি ছিলেন এক ধার্মিক কৃষক, ধর্মপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা, যিনি দৈবশক্তির বলে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন। এই কারণে তাঁরই নামানুসারে ঐ প্রদেশের নামকরণ হয়েছে, আর ঐ কারণেই তা পুণ্যতীর্থ রূপে প্রসিদ্ধ। তাছাড়া ঐ থানেশ্বরই ছিল বাসুদেবের লীলাভূমি যিনি মহাভারতের যুদ্ধে দুষ্টদের দমন করে তাঁর পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। এসব কারণেই লোক ওখানে (তীর্থ করতে) যায়।

মাহুর (মাথুর বা মথুরা ?) এরকম একটি তীর্থক্ষেত্র, যে স্থানটির ব্রাহ্মণে গিজগিজ করছে। এটিও এ কারণে তীর্থস্থান যে, বাসুদেবের জন্ম ও লালন পালন হয় পাশেই 'নন্দগোলা' নামক স্থানে।

আজকাল হিঁদুরা কাশ্মিরেও যায়। মূর্তিসহ মন্দির ধ্বংসের পূর্বে তারা মুলতানেও যেত।

সপ্তষষ্টি অধ্যায়

দান, অর্থোপার্জন ও ব্যয়ের বিধিমালা

প্রতিদিন যথাসাধ্য দান করা হলো তাদের জন্য একটি অনিবার্য বিধান। তারা তাদের অর্পিত সম্পদকে এক বছর তো দূরের কথা এক মাসের জন্যও (জমা করে) রাখেন না, কেননা, তা তাদের মতে, এমনই এক অজানা বা অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ যে, ততদিন তাঁরা বাঁচবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

যেখানে উৎপাদিত ফসল ও পালিত পশুর সঙ্গে তাদের অর্থোপার্জনের সম্পর্ক, সেখানে ঐ জমিন বা তৃণক্ষেত্রের কর দেশের রাজাকে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। তার উপর উপার্জনের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে হয় সম্পত্তি, সংসার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর বাবদ। এ ধরনের নিয়ম জনসাধারণের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য কিন্তু তারা সর্বদাই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সম্পত্তির সঠিক হিসেব না দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের প্রতিও এ নিয়ম প্রযোজ্য। কেবল ব্রাহ্মণরাই এ ধরনের সমস্ত রকমের কর থেকে মুক্ত।

রাজস্ব প্রদানের পর উপার্জনের অবশিষ্টাংশ কীভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ তার নয় ভাগের এক ভাগ রাখেন ভিক্ষা দানের জন্য। কিন্তু তারা একে তিন ভাগে ভাগ করেন। এর এক ভাগকে তো মানসিক উৎকণ্ঠা নিরসনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এক ভাগ থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগের তিন ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ, পুরো হিসেবের নয় ভাগের এক ভাগ) বরাদ্দ থাকে ভিক্ষা দানের জন্য এবং বাকি তিন ভাগের এক ভাগ ব্যয় করা হয় ঐ একই নিয়মে।

এমন কিছু লোক আছে, যারা অবশিষ্ট অংশকে চার ভাগে ভাগ করেন। এর এক-চতুর্থাংশ সাধারণ ব্যয়ের জন্য আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হয়, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ মহত্তর কোনো উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া, তৃতীয় চতুর্থাংশ ভিক্ষাদানের জন্য এবং শেষের চতুর্থাংশ সঞ্চিত রাখা হয় ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু তিন বছরে যে

সাংসারিক ব্যয় হয় তার অধিক রাখা নীতিবিরুদ্ধ (কাজ)। আর সঞ্চয় অতিরিক্ত হলে সেই অতিরিক্ত অংশ বরাদ্দ হয় ভিক্ষাদানের জন্য।

সুদের মাধ্যমে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ। এ ব্যবসায় যা লাভ হয় তার পাপের গুরুত্ব উপার্জিত সম্পদেরই অনুরূপ। কেবলমাত্র শূদ্রই সুদের ব্যবসা করতে পারে কিন্তু তা তাদের মোট পুঁজির পঞ্চাশের বেশি হওয়া নিষিদ্ধ (অর্থাৎ শতকরা দুয়ের বেশি হবে না)।

অষ্টষষ্টি অধ্যায়

পানাহার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ

হিঁদুদের জন্য যে কোনো প্রকারের পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল, যেমনটি ছিল খ্রিষ্টান ও মানিকীয়দের জন্য। কিন্তু মাংসপ্রিয় মানুষেরা স্বভাবতই নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কারণে সে নিষেধাজ্ঞা দূরে সরিয়ে রাখে। আর তার পরিণামে এই নিয়ম কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, কেননা, ধর্মরক্ষকের ভূমিকা তারাই পালন করেন, সুতরাং এসব ঐ শ্রেণীর কামনা-বাসনা থেকে তাদের মুক্ত থাকতে হবে।

সেই সমস্ত পশুপাখি যাদের মাংস ভক্ষণ অবৈধ বা নিষেধ

এমতাবস্থায় কিছু পশুকে কণ্ঠ নিষ্পেষণের সাহায্যে বধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা কেবলমাত্র বিশেষ কয়েকটি পশুপাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এর বাইরে নিষিদ্ধ। যাদের মাংস খাওয়া বৈধ সে সমস্ত পশুর হঠাৎ মৃত্যু হলে তাদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। যে সমস্ত পশুপাখি বধ করার অনুমতি আছে সেগুলো হলো : ভেড়া, ছাগল, হরিণ, খরগোশ, গণ্ডার, মহিষ, মাছ, জল-স্থলের পাখি, যেমন চড়ুই, ঘুঘু, বুনো-কবুতর, তিতির, ময়ূর এবং অন্যান্য পশুপক্ষী যা মানুষের পক্ষে ঘৃণা ও ক্ষতিকর নয়।

যে সমস্ত পশুপক্ষী বধ করা নিষিদ্ধ, সেগুলো হলো : গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট, হাতি, গৃহপালিত পাখি, কাক, টিয়া, বুলবুলি, বিভিন্ন ধরনের ডিম আর মদিরা (মদ)। মদিরা পান শূদ্রদের জন্য বৈধ, তবে বিক্রি নিষেধ। তাদের জন্য মাংস বিক্রি করাও নিষেধ।

গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ কেন

কিছু হিঁদুর মতে, ভারত যুদ্ধের আগে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না আর সে যুগে গো-বধ ছাড়া যজ্ঞও হতো না। কিন্তু এরপর তাদের প্রতি মানুষের দুর্বলতার কারণে গোহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল বেদের

বিধান। কিন্তু পরে বেদ-কে চারভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়, বেদপাঠের সুবিধা হয়। কিন্তু নিয়ম পরিবর্তনের এই ব্যাখ্যা সঠিক কি না বলা দুষ্কর, কেননা, গোমাংস ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞার পিছনে হালকা-পাতলা কোনো কারণ নেই ; বরং বলা যায় যে, এ কারণটি পূর্ববর্তী কারণটির চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ, কঠিন এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রক।

আরও কিছু হিঁদু আমাকে বলেন যে, গোমাংস ভক্ষণের ফলে ব্রাহ্মণরা অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এর কারণ ছিল যে, দেশের আবহাওয়া তো গরম কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরভাগ শীতল, তার ফলে, তাদের শরীরের প্রাকৃতিক উষ্ণতা কমে যায় এবং হজম শক্তি এতটা দুর্বল হয়ে যায় যে, ভোজন-শেষে পান-সুপারি চিবিয়ে হজম শক্তি বাড়িয়ে নিতে হয়। পান-পাতার উষ্ণতা শরীরে তাপ বৃদ্ধি করে, চুন অভ্যন্তরীণ সিক্ততা দূর করে আর সুপারি দাঁত, মাড়ি এবং পাকস্থলির একত্র বন্ধনে সাহায্য করে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন কারণে, অত্যন্ত শীতল এবং শক্ত গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এ দুই বক্তব্যের মধ্যে কোনটা সঠিক তা নিশ্চিতভাবে বলতে আমি সংকোচ বোধ করি।

(এরপর গ্রন্থে ফাঁক আছে)

অর্থনৈতিক কারণ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, গরু এমনই একটি প্রাণী যা মানুষের বিবিধ কাজে আসে– যেমন, যাত্রাকালে তারা মানুষের ভার বহন করে, কৃষি কাজে সাহায্য করে, সংসারে দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য দান করে। এছাড়া মানুষ তার গোবর ব্যবহার করে আর শীতের মৌসুমে তো তার নিশ্বাসের উষ্ণতা কাজে আসে। এ সমস্ত কারণেই গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আল হাজ্জাজ যেমনটি করেছিলেন, যখন লোকেরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, ব্যাবিলোনিয়া ক্রমশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে...।

সপ্তষষ্টি অধ্যায়

দান, অর্থোপার্জন ও ব্যয়ের বিধিমালা

প্রতিদিন যথাসাধ্য দান করা হলো তাদের জন্য একটি অনিবার্য বিধান। তারা তাদের অর্পিত সম্পদকে এক বছর তো দূরের কথা এক মাসের জন্যও (জমা করে) রাখেন না, কেননা, তা তাদের মতে, এমনই এক অজানা বা অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ যে, ততদিন তাঁরা বাঁচবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

যেখানে উৎপাদিত ফসল ও পালিত পশুর সঙ্গে তাদের অর্থোপার্জনের সম্পর্ক, সেখানে ঐ জমিন বা তৃণক্ষেত্রের কর দেশের রাজাকে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। তার উপর উপার্জনের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে হয় সম্পত্তি, সংসার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর বাবদ। এ ধরনের নিয়ম জনসাধারণের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য কিন্তু তারা সর্বদাই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সম্পত্তির সঠিক হিসেব না দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের প্রতিও এ নিয়ম প্রযোজ্য। কেবল ব্রাহ্মণরাই এ ধরনের সমস্ত রকমের কর থেকে মুক্ত।

রাজস্ব প্রদানের পর উপার্জনের অবশিষ্টাংশ কীভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ তার নয় ভাগের এক ভাগ রাখেন ভিক্ষা দানের জন্য। কিন্তু তারা একে তিন ভাগে ভাগ করেন। এর এক ভাগকে তো মানসিক উৎকণ্ঠা নিরসনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এক ভাগ থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগের তিন ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ, পুরো হিসেবের নয় ভাগের এক ভাগ) বরাদ্দ থাকে ভিক্ষা দানের জন্য এবং বাকি তিন ভাগের এক ভাগ ব্যয় করা হয় ঐ একই নিয়মে।

এমন কিছু লোক আছে, যারা অবশিষ্ট অংশকে চার ভাগে ভাগ করেন। এর এক-চতুর্থাংশ সাধারণ ব্যয়ের জন্য আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হয়, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ মহত্ত্বর কোনো উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া, তৃতীয় চতুর্থাংশ ভিক্ষাদানের জন্য এবং শেষের চতুর্থাংশ সঞ্চিত রাখা হয় ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু তিন বছরে যে

সাংসারিক ব্যয় হয় তার অধিক রাখা নীতিবিরুদ্ধ (কাজ)। আর সঞ্চয় অতিরিক্ত হলে সেই অতিরিক্ত অংশ বরাদ্দ হয় ভিক্ষাদানের জন্য।

সুদের মাধ্যমে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ। এ ব্যবসায় যা লাভ হয় তার পাপের গুরুত্ব উপার্জিত সম্পদেরই অনুরূপ। কেবলমাত্র শূদ্রই সুদের ব্যবসা করতে পারে কিন্তু তা তাদের মোট পুঁজির পঞ্চাশের বেশি হওয়া নিষিদ্ধ (অর্থাৎ শতকরা দুয়ের বেশি হবে না)।

অষ্টষষ্টি অধ্যায়

পানাহার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ

হিঁদুদের জন্য যে কোনো প্রকারের পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল, যেমনটি ছিল খ্রিষ্টান ও মানিকীয়দের জন্য। কিন্তু মাংসপ্রিয় মানুষেরা স্বভাবতই নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কারণে সে নিষেধাজ্ঞা দূরে সরিয়ে রাখে। আর তার পরিণামে এই নিয়ম কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, কেননা, ধর্মরক্ষকের ভূমিকা তারাই পালন করেন, সুতরাং এসব ঐ শ্রেণীর কামনা-বাসনা থেকে তাদের মুক্ত থাকতে হবে।

সেই সমস্ত পশুপাখি যাদের মাংস ভক্ষণ অবৈধ বা নিষেধ

এমতাবস্থায় কিছু পশুকে কণ্ঠ নিষ্পেষণের সাহায্যে বধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা কেবলমাত্র বিশেষ কয়েকটি পশুপাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এর বাইরে নিষিদ্ধ। যাদের মাংস খাওয়া বৈধ সে সমস্ত পশুর হঠাৎ মৃত্যু হলে তাদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। যে সমস্ত পশুপাখি বধ করার অনুমতি আছে সেগুলো হলো : ভেড়া, ছাগল, হরিণ, খরগোশ, গণ্ডার, মহিষ, মাছ, জল-স্থলের পাখি, যেমন চড়ুই, ঘুঘু, বুনো-কবুতর, তিতির, ময়ূর এবং অন্যান্য পশুপক্ষী যা মানুষের পক্ষে ঘৃণা ও ক্ষতিকর নয়।

যে সমস্ত পশুপক্ষী বধ করা নিষিদ্ধ, সেগুলো হলো : গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট, হাতি, গৃহপালিত পাখি, কাক, টিয়া, বুলবুলি, বিভিন্ন ধরনের ডিম আর মদিরা (মদ)। মদিরা পান শূদ্রদের জন্য বৈধ, তবে বিক্রি নিষেধ। তাদের জন্য মাংস বিক্রি করাও নিষেধ।

গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ কেন

কিছু হিঁদুর মতে, ভারত যুদ্ধের আগে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না আর সে যুগে গো-বধ ছাড়া যজ্ঞও হতো না। কিন্তু এরপর তাদের প্রতি মানুষের দুর্বলতার কারণে গোহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল বেদের

বিধান। কিন্তু পরে বেদ-কে চারভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়, বেদপাঠের সুবিধা হয়। কিন্তু নিয়ম পরিবর্তনের এই ব্যাখ্যা সঠিক কি না বলা দুষ্কর, কেননা, গোমাংস ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞার পিছনে হালকা-পাতলা কোনো কারণ নেই ; বরং বলা যায় যে, এ কারণটি পূর্ববর্তী কারণটির চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ, কঠিন এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রক।

আরও কিছু হিংদু আমাকে বলেন যে, গোমাংস ভক্ষণের ফলে ব্রাহ্মণরা অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এর কারণ ছিল যে, দেশের আবহাওয়া তো গরম কিন্তু শরীরের অভ্যান্তরভাগ শীতল, তার ফলে, তাদের শরীরের প্রাকৃতিক উষ্ণতা কমে যায় এবং হজম শক্তি এতটা দুর্বল হয়ে যায় যে, ভোজন-শেষে পান-সুপারি চিবিয়ে হজম শক্তি বাড়িয়ে নিতে হয়। পান-পাতার উষ্ণতা শরীরে তাপ বৃদ্ধি করে, চুন অভ্যান্তরীণ সিক্ততা দূর করে আর সুপারি দাঁত, মাড়ি এবং পাকস্থলির একত্র বন্ধনে সাহায্য করে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন কারণে, অত্যান্ত শীতল এবং শক্ত গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এ দুই বক্তব্যের মধ্যে কোনটা সঠিক তা নিশ্চিতভাবে বলতে আমি সংকোচ বোধ করি।

(এরপর গ্রন্থে ফাঁক আছে)

অর্থনৈতিক কারণ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, গরু এমনই একটি প্রাণী যা মানুষের বিবিধ কাজে আসে– যেমন, যাত্রাকালে তারা মানুষের ভার বহন করে, কৃষি কাজে সাহায্য করে, সংসারে দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য দান করে। এছাড়া মানুষ তার গোবর ব্যবহার করে আর শীতের মৌসুমে তো তার নিশ্বাসের উষ্ণতা কাজে আসে। এ সমস্ত কারণেই গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আল হাজ্জাজ যেমনটি করেছিলেন, যখন লোকেরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, ব্যাবিলোনিয়া ক্রমশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে...।

ঊনসপ্ততি অধ্যায়

বিবাহ, রজঃস্রাব, ভ্রূণ এবং সন্তান প্রসব

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

সুব্যবস্থিত বিবাহিত জীবন ছাড়া কোনো জাতিই বাঁচতে পারে না, কেননা, এ এমনই একটি প্রথা যা মানুষের বন্য আবেগকে প্রশমিত করতে পারে, যাকে সভ্য মানুষেরা ঘৃণার চোখে দেখে থাকে, আর বিবাহ ঐ সমস্ত কারণগুলোর মূলোৎপাটন করতে পারে। পশুদের ন্যায় উন্মাদনাপূর্ণ জীবনাচরণ পরিণামে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যদি পশুদের জোড়গুলোকে গভীরভাবে অবলোকন করা যায় তাহলে সেখানে তাদের একে অন্যের প্রতি সহযোগিতা দেখে এবং তাদের কামবাসনা চরিতার্থ করতে দেখে মানুষ তার সুব্যবস্থিত বিবাহিত জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে পারে না। এর বিপরীতে মানুষ যদি অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগ ও বেশ্যাবৃত্তির প্রতি প্রবৃত্ত হয় তাহলে তা এমনই একটি লজ্জাজনক আচরণ বলে প্রতীত হবে যাকে পশুদের তুলনায় নিকৃষ্টতম আচণ ছাড়া আর অন্য কিছু বলে অভিহিত করা যাবে না।

বিবাহের নিয়ম

প্রত্যেক দেশেই বিবাহ-সম্পর্কিত নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত আছে ; বিশেষ করে সেই দেশের অধিবাসীরা, যারা ধর্ম ও সমস্ত নিয়মাবলিকে ঐশীসূত্র থেকে প্রাপ্ত বলে মনে করেন। হিঁদুদের বিবাহ অতি অল্প বয়সে হয় বলে তাদের পিতা-মাতারাই তাদের বিবাহ স্থির করেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অন্যান্য দাক্ষিণাদি লাভ করেন। বিয়ের সময় আনন্দ করার জন্য গান-বাজনাও করেন। বর-কনের মধ্যে কোনো উপহার নির্ধারিত থাকে না। বর কনেকে উচিত সঙ্গত কোনো উপহার দিয়ে থাকে, আর উপলক্ষ-ভিত্তিক সেই পুরস্কার সে ফেরত চাইতে পারে না। অবশ্য, পত্নী ইচ্ছা করলে তা তাকে ফেরত দিতে পারে। তাদের এ বিবাহ বন্ধন অটুট, কেননা, তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনো প্রথা নেই।

পুরুষ এক থেকে চারটি পর্যন্ত মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, তাদের চারটির বেশি স্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি নেই কিন্তু তাদের মধ্যেকার একটি স্ত্রী মারা গেলে সেই সংখ্যা পূরণের জন্য সে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এর বেশি নয়।

বিধান

কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। বিকল্প হিসেবে তার সামনে দুটি পথ খোলা থাকে, হয় সে আজীবন বিধবা হয়ে থাকবে, নতুবা মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সহমরণ বরণ করবে ; আর এই দ্বিতীয় বিকল্প পথটিই তাদের কাছে শ্রেয়ঃকর বলে বিবেচিত হয়, কেননা, বিধবা হয়ে বেঁচে থাকতে গেলে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় এবং অন্যের দুর্ব্যবহারে পতিত হতে হয়। রাজাদের পত্নীরা তো সরাসরি সহমরণের পথটাই বেছে নেয়, কেননা, সেখানে তাদের এই আশঙ্কা থাকে যে, যদি তাদের কোনো অপকর্মের কারণে তাদের যশস্বী পতির কোনো অমর্যাদা হয় ! তবে, এ ব্যাপারে বৃদ্ধাদের মুক্ত রাখা হয়, যাদের সন্তানাদি রয়েছে। এর কারণ হলো, তারা তাদের মায়েদের সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

কোন পরিস্থিতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ

তাদের বিবাহ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন অনুসারে তারা পরিচিতের চেয়ে অপরিচিতদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে বেশি পছন্দ করে। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আত্মীয়তার সম্পর্ক যত দূরের হবে ততই ভালো। এমন কোনো মহিলার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন তাদের মধ্যে সর্বথায় নিষিদ্ধ, যারা বংশানুক্রমিকভাবে উপর থেকে নিচে নাতনি বা নাতি-নাতনির কন্যা আর উপরের দিকে মা, পিতামহী এবং প্রপিতামহী। সগোত্রীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, যেমন ভগ্নী, ভাগ্নী বা ভাইজি, খালা, ফুফু বা তাদের কন্যা, তবে পাঁচ শ্রেণীর দূরত্ব হলে বিবাহে ঠিক আপত্তি না থাকলেও তা অনেকেই পছন্দ করেন না।

পত্নীদের সংখ্যা

কিছু হিঁদুর মতে, পত্নীদের সংখ্যা জাতের উপর নির্ভরশীল। সে হিসেবে ব্রাহ্মণ চার, ক্ষত্রিয় তিন, বৈশ্য দুই এবং শূদ্র একজনমাত্র স্ত্রী রাখতে পারে। যে কোনো ব্যক্তিই হোক না কেন, সে তার নিজের জাতি অথবা নিজের জাতির থেকে নিম্নতর যে কোনো জাতি থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে কিন্তু কোনো ব্যক্তি নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোনো জাতির মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না।

সন্তানের জাত-বিচার করা হয় তার মায়ের দিক থেকে পিতার দিক থেকে নয়। এজন্য কোনো স্ত্রী ব্রাহ্মণ হলে তার সন্তানও ব্রাহ্মণ হবে, স্ত্রী শূদ্র হলে সন্তানও শূদ্র হবে। কিন্তু আমাদের কালে ব্রাহ্মণরা নিজের জাতি ছাড়া অন্য জাতির মহিলাকে কখনোই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে না।

রজঃস্রাবের পর্যায়

রজঃস্রাবের দীর্ঘতম অবধি ষোলোদিন পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু বাস্তবিকই তা প্রথম চারদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় আর তখনই পতি তার পত্নীকে সম্ভোগ করে ; তাছাড়া পতি তার পত্নীর নিকটবর্তী হতে পারে না, কেননা, এই সময়কালের মধ্যে সে অপবিত্র থাকে। রজঃস্রাব পরিপূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর, অর্থাৎ তা চারদিন জারি থাকার পর স্ত্রী স্নানসমাপনান্তে পবিত্র হওয়ার পরই পতি তার সঙ্গে সহবাস করতে পারে। অবশ্য, তখনো অল্পস্বল্প রক্ত নির্গলিত হলেও তাকে স্রাবের রক্ত মনে না করে বরং তাকে ভ্রূণেরই রক্ত বলে মনে করা হয়। যা থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।

গর্ভ ও প্রসব

ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হলো সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ করার সময় 'গর্ভাধান' নামক যজ্ঞ করা, কিন্তু তারা তা করতে লজ্জা পায়, কেননা, যজ্ঞের সময় স্ত্রীকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হয়। পরিণামে তারা যজ্ঞের এ প্রথাকে তুলে দিয়ে গর্ভের চতুর্থ মাসে 'সীমান্তোন্নয়নম' নামক প্রথায় পরিণত করেছে। পত্নীর সন্তান জন্মদানের পর একটি তৃতীয় যজ্ঞ করা হয়, যা সন্তানের জন্ম ও মায়ের পালন-পোষণের মধ্যবর্তী সময়ে করা হয়। তারা এ যজ্ঞকে 'জাতকর্মণম' বলে অভিহিত করে।

প্রসূতির সন্তান জন্মদানের দিনগুলো অতিক্রমের পর নামকরণ করা হয়। নাম রাখার জন্য কৃত ও যজ্ঞকে তারা 'নাম-কর্মণ' বলে।

সন্তান জন্মদানের পর প্রসূতি অবস্থায় তারা কোনো পাত্র স্পর্শ করতে পারে না, আর তার ঘরেরও কিছু ভক্ষণ করা হয় না, আর ব্রাহ্মণ সে সময়ে বাড়িতে চুলা জ্বালায় না। এর সময়কাল হলো ব্রাহ্মণদের জন্য আট দিন, ক্ষত্রিয়ের জন্য বারো দিন, বৈশ্যদের জন্য পনেরো দিন এবং শূদ্রদের জন্য এক মাস। আর যে সমস্ত নিচু জাতির লোক আছে, যারা কোনো জাতিগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

শিশুদের স্তন্যদানের নিয়ম তিন বছর, কিন্তু এ সম্পর্কে বাধ্যতামূলক কিছু নেই। বালকের প্রথম মুণ্ডনকর্ম সম্পন্ন করা হয় তিন বছর বয়সে আর নাক-কান ফোঁড়া হয় সাত-আট বছর বয়সে।

বেশ্যাবৃত্তির কারণ

তারা (হিঁদুরা) বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধ বলে জ্ঞান করে। এর কারণ এই যে, মুসলমানরা যখন কাবুল অধিকার করেন, তখন কাবুলের ইস্পাহপাদ ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, তিনি গোমাংস ভক্ষণ ও পায়ুকামে লিপ্ত হবেন না। এ থেকে স্পষ্ট যে, এ দুটি কাজকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। আর তাছাড়া বেশ্যাবৃত্তি বৈধ ব্যবসা হলেও হিঁদুরা এর জন্য কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু জনসাধারণকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, দোষী স্বয়ং রাজা। যদি তা না হতো তাহলে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতেরা নাচগান করা দেবদাসীদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং নজরের আকর্ষণ বৃদ্ধি ও প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য মন্দিরে থাকতে দিতেন না। রাজা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং নজরের আকর্ষণ বৃদ্ধি ও প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই ব্যবসা থেকে কর ও জরিমানা বাবদ যে রাজস্ব আসে তাই দিয়ে সৈন্য-সামন্তদের ব্যয়ভার বহন করেন।

বুইদের রাজা আজাদউদ্দৌলাও এমনটাই করতেন, তবে তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অবিবাহিত সৈনিকদের দৌরাত্ম্য থেকে তাঁর প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।

সপ্ততি অধ্যায়

মামলা-মোকদ্দমা

বিধি

বিচারক বাদির নিকট থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে উপযুক্ত ভাষায় অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন, যাতে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ থাকবে। যদি কোনো লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করা না হয় তাহলে সাক্ষীদের মাধ্যমে মোকদ্দমা চালানো হয়।

সাক্ষীর সংখ্যা

সাক্ষীর সংখ্যা চারজনের কম হওয়া উচিত নয়, অবশ্য এর বেশিও হতে পারে। বিচারক মোকদ্দমা তখনই গ্রহণ করেন যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য পূর্ণত সিদ্ধ ও সুনিশ্চিত হয় ; আর তখনই তিনি সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতে মামলার নিষ্পত্তি করেন। পরন্তু ইয়াস ইবনে মুআবিয়ার ন্যায় গোপন অনুসন্ধান ও ইশারা-ইঙ্গিত থেকে প্রমাণ আহরণ বা বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন ও যুক্তিতর্কের দ্বারা সত্য প্রমাণ করার কোনো অনুমতি বিচারক দেন না।

বাদি তার দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে বিবাদিদের শপথ গ্রহণ করতে হয় কিন্তু এই কথা বলে বাদিদেরও শপথ করতে হয় যে, 'তুমিও শপথ করে বল যে, তোমার দাবি সত্য, আর তোমার দাবি সত্য হলে আমি তা সহজেই মেনে নেব।'

বিভিন্ন ধরনের শপথ ও অগ্নিপরীক্ষা

দাবিকৃত বস্তুর মূল্যানুসারে শপথ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যদি ঐ বস্তুর বিশেষ কোনো গুরুত্ব না থাকে আর বাদি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির শপথ গ্রহণে স্বীকৃত হয় তাহলে পাঁচজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণের সামনে অভিযুক্তকে এই বলে শপথ করতে হয় যে, 'যদি আমি মিথ্যা বলি তাহলে বাদিকে তার দাবির আটগুণ বেশি খেসারত আমার সম্পত্তি থেকে দেব।'

[কিছু অন্য রকমের শপথ ও অগ্নিপরীক্ষার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এ পদ্ধতিগুলোও অন্তর্ভুক্ত আছে : (ক) অভিযুক্তকে বিষাক্ত পানীয় গ্রহণের নির্দেশ, (খ) অভিযুক্তকে নদীতে ফেলে দেওয়া, (গ) এবং তার হাতে তপ্ত লোহা শলাকা ধরিয়ে দেওয়া। যদি সে দোষী না হয়, তাহলে সর্বাবস্থাতেই সে সুরক্ষিত থাকবে।]

একসপ্ততি অধ্যায়

দণ্ডবিধান ও প্রায়শ্চিত্ত

হিঁদুদের এ সম্পর্কিত আচার-বিচার খ্রিষ্টানদের অনুরূপ, কেননা, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সদাচারের ধ্যান-ধারণা খ্রিষ্টানদের মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন– কাউকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা কোরো না, যে তোমার কোটটি খুলে নেয়, তাকে নিজের জামাটাও দিয়ে দাও। যে তোমার এক গালে চড় মারে, তার দিকে আর একটি গালও বাড়িয়ে দাও। নিজের শত্রুকে আশীর্বাদ করো এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। আমি আমার প্রাণের শপথ করে বলতে পারি, এ বড়ই মহৎ চিন্তাকল্পনা কিন্তু বর্তমান জগৎ-সংসারের মানুষ আর যাই হোক, এতটা মহানুভব নয়। তারা অধিকাংশই মূর্খ এবং বিপথগামী, যারা তরবারির আঘাত আর বেত্রাঘাত ছাড়া কখনোই সোজা পথে চলে না।

ব্রাহ্মণরাই দেশ শাসন করতেন

ভারত এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। হিঁদুরা বলে যে, মূলত, শাসনকাজ ও যুদ্ধ-সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্রাহ্মণরাই পরিচালনা করতেন, কিন্তু যেহেতু তারা ধর্মশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করতেন, সেহেতু তারা প্রজাদের অনিষ্টকর ও দুষ্টচক্রের মোকাবিলায় ব্যর্থ হন, ফলে, দেশের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এমনকি ধর্মীয় কার্যক্রমের উপরেও তাঁদের আর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেজন্য আরাধ্য দেবতাদের সামনেও তারা অপদস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলস্বরূপ ব্রহ্মা তাদের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন, যা আজও তাদের কাছে আছে। অন্য দিকে ব্রহ্মা, যুদ্ধ ও শাসনকার্য ক্ষত্রিয়দের উপর অর্পণ করেন। তা চলে যায় রাজাদের হাতে, বিদ্বানদের হাতে নয়।

হত্যা বিষয়ক নিয়ম

হত্যা সম্পর্কে নিয়ম হলো : হত্যাকারী যদি ব্রাহ্মণ হয় আর যাকে হত্যা করা হয়েছে, সে যদি ভিন্ন জাতির হয় তাহলে তাকে উপবাস, প্রার্থনা ও ভিক্ষাদানের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

নিহত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হলে হত্যাকারী ব্রাহ্মণকে পরবর্তী জন্মে তার জবাব দিতে হবে, কেননা, তার প্রায়শ্চিত্তের অনুমতি নেই, এজন্য প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির পাপ ধুয়ে যায়, যদিও নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত কোনো মহাপাপের মার্জনা হয় না। মহাপাপসমূহ হলো এই : ব্রাহ্মণের হত্যাকে 'বজ্রব্রহ্ম' হত্যা বলা হয় ; এছাড়া গোহত্যা, মদপান, ব্যভিচার বিশেষ করে পিতার এবং গুরুপত্নীর সঙ্গে কৃত ব্যভিচার। কিন্তু এর মধ্যেকার কোনো অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে হত্যার শাস্তি দিতে পারেন না ; বরং তার সম্পত্তি ক্রোক করে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন।

যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ইতর কোনো জাতির কোনো ব্যক্তি ঐ জাতির কাউকে হত্যা করে তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কিন্তু সেই সঙ্গে রাজাও অন্যের জন্য উদাহরণস্বরূপ তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

চুরির শাস্তি

চুরি সম্পর্কে নির্দেশ হলো এই যে, চোরের দণ্ড হবে চুরি হওয়া বস্তুর মূল্যমানের অনুরূপ। সে অনুসারে কখনো-কখনো কঠোর অথবা মাঝারি ধরনের দণ্ডদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর কখনো বা অপরাধীকে শুধরে দেওয়ার জন্য তার উপর জরিমানা ধার্য করা এবং লোক-সমক্ষে তাকে লজ্জা দেওয়া এবং তাকে উপহাস করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। বস্তু মূল্যবান হলে রাজা ব্রাহ্মণকে অন্ধ করে দেন এবং তার ডান হাত বা বাম হাত, অথবা ডান পা বা বাম পা কেটে দিয়ে তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। কিন্তু ঐ একই পাপে ক্ষত্রিয়কে বিকলাঙ্গ করা হলেও অন্ধ করে দেওয়া হয় না। আর অন্য জাতির চোরেদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

পরপুরুষগামিনীর দণ্ড

পরপুরুষগামিনী বা ব্যভিচারী রমণীকে স্বামীগৃহ থেকে বের করে দিয়ে দেশছাড়া করে দেওয়া হয়।

হিঁদু যুদ্ধবন্দিরা দেশে ফিরলে তাদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা হয়

হিঁদুদের কাছ থেকে আমি প্রায়ই শুনতাম যে, মুসলিম দেশ থেকে হিঁদু দাসেরা পালিয়ে স্বদেশে স্বধর্মে ফিরে এলে হিঁদুরা তাদের প্রায়শ্চিত করার জন্য উপবাসে থাকার আদেশ দিয়ে থাকে, তারপর তাদের এতদিন ধরে গরুর গোবর, গোমূত্র ও গোদুগ্ধ একসঙ্গে ভক্ষণের যে দাওয়াই তাদের দেওয়া হয় যে, তাতে তাদের দফারফা হয়ে যায়। তা ভক্ষণের পর তারা বারবার বমি করা সত্ত্বেও তাই-ই খেতে তাদের বাধ্য করা হয়।

আমি এ কথার সততা যাচাইয়ের জন্য ব্রাহ্মণদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা আমাকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন যে, এ ধরনের লোকেদের এরকম প্রায়শ্চিত্ত কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় ; কেননা, তাদের পক্ষে তাদের সেই পূর্ব জীবনে ঐ পরিস্থিতিতে ফিরে আসার অনুমতি আর দেওয়া হয় না। আর এ কীভাবে সম্ভব হতে পারে ? যদি কোনো ব্রাহ্মণ কোনো শূদ্রের ঘরে কিছুদিনের জন্য অন্নভোজন করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে জাতিচ্যুত করা হয়, সেখানে তাকে পুনরায় কিছুতেই জাতিভুক্ত করা হয় না।

দ্বাসপ্ততি অধ্যায়

উত্তরাধিকার এবং মৃতের অধিকার

দায়ভাগ

তাঁদের (হিঁদুদের) উত্তরাধিকার আইনের বিশেষত্ব হলো এই যে, কন্যার অতিরিক্ত অন্য কোনো মেয়ে উত্তরাধিকারী হতে পারে না। 'মনুস্মৃতি'র এক বিধানানুযায়ী কন্যা পুত্রের চার ভাগের এক ভাগ পায়। বিয়ে না হলে বিয়ে পর্যন্ত ঐ অংশের সম্পদ তার জন্য ব্যয় করা হয় এবং তা থেকে তার যৌতুকও প্রদান করা হয়। তাছাড়া পিতৃগৃহে তার আর কোনো অধিকার থাকে না।

কোনো বিধবা সতী না হয়ে বেঁচে থাকতে চাইলে তার স্বামীর উত্তরাধিকারীরা তার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

মৃত ব্যক্তির ঋণ তার উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করতে হয়, তা সে নিজের অংশ থেকেই হোক বা মৃতব্যক্তির অংশ থেকেই হোক। সেখানে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আছে কি না, সেখানে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এরকমই, যে কোনোভাবেই হোক, বিধবা ব্যক্তিকে এভাবে পালন-পোষণ করতে হয়।

পুরুষ উত্তরাধিকারীর নিয়মানুযায়ী পিতা এবং পিতামহের তুলনায় পুত্র এবং পৌত্রের দাবি অনেক বেশি। এছাড়া, পূর্বপুরুষ ও অধোপুরুষের মধ্যে যার সম্পর্ক অধিক নিকটতর, তিনিই উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হন।

সগোত্রীয় ভাইদের দাবি কম এবং নিকটাত্মীয় না থাকলে তবেই তারা উত্তরাধিকারী হতে পারেন। ঠিক এই কারণেই, ভগ্নীর পুত্রের তুলনায় ভ্রাতার পুত্রের দাবি অনেক বেশি। আত্মীয়তার দাবি একাধিক হলে সবাই সমান অংশ পায়। এ হিসেবে নপুংসক[৩৮] (হিজড়া)-কেও পুরুষ হিসেবে ধরা হয়।

মৃত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে এবং মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হলে তার সম্পত্তি রাজকোষাগারে চলে যায়। মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ না হলে তার সম্পত্তিতে রাজার কোনো অধিকার থাকে না। এমতাবস্থায় তার সম্পত্তি দানধ্যানে ব্যয় হয়।

মৃত ব্যক্তির প্রতি তার উত্তরাধিকারীর কর্তব্য

মৃত ব্যক্তির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার উত্তরাধিকারীদের ষোলোটি ভোজ দেওয়া একটি প্রধান কর্তব্য। এতে অতিথিদের ভোজন ছাড়াও ভিক্ষাও দেওয়া হয়। অর্থাৎ, মৃত্যুর পঞ্চদশ ও ষোড়শ দিনে ; এছাড়া বর্ষভর প্রতি মাসে একবার করে ভোজ দেওয়া কর্তব্য।

মৃত্যুর পরে ষান্মাসিক ভোজে ব্যঞ্জন বেশি হওয়া উচিত। তাতে অন্যান্য ভোজনের চেয়ে অধিক উদারতার সঙ্গে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত। সেই সঙ্গে, বছরের শেষ দিনের একদিন আগে একটি ভোজ দিবংগত তথা তার পিতৃপুরুষদের জন্য দেওয়া হয়, অন্তত বছরের শেষদিন। বর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিবংগতের প্রতি কর্তব্যকর্ম সমাধা হয়ে যায়।

উত্তরাধিকারী পুত্র হলে বর্ষভর তাকে শোকবস্ত্র পরিধান করা উচিত ; সে বৈধ এবং কুলীন সন্তান হলে তার শোক পালন করা উচিত এবং সেই সঙ্গে তার স্ত্রীসম্ভোগ না করা উচিত। এছাড়াও শোকবর্ষের প্রথম দিককার একটি দিনে উত্তরাধিকারীদের জন্য পানাহার নিষেধ।

উপরে উল্লেখিত ষোলোটি ভোজের মধ্যে ভিক্ষাদান ছাড়াও উত্তরাধিকারীদের তাদের গৃহের প্রবেশ-দ্বারের উপরে বড় একটি পাত্র বানিয়ে রাখতে হয়, সেটি অবশ্য প্রাচীরের বহির্ভাগে থাকবে। তাতে তারা প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু পূর্ণ ভোজনপাত্র ও পানি রেখে দেয় মৃত্যুর পরে দশদিন পর্যন্ত। তাদের এমনটি করার কারণ সম্ভবত, তাদের বিশ্বাসমতে দিবংগত আত্মা তখনো অশান্ত থাকে তাই খাদ্য-পানীয়ের আশায় বাড়ির আশপাশে তারা ঘোরাফেরা করে।

প্লেটোর মতোই ধ্যান-ধারণা

'ফাইডো' গ্রন্থে প্লেটোও এরকম মত লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে তিনি আত্মাকে কবরগুলোর আশপাশে ঘুরে বেড়ানোর কথা লিখেছেন। সম্ভবত, এর কারণ এই যে, শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তার সঙ্গে আত্মার অল্পস্বল্প অংশ রয়ে যায়...।

সবশেষে, উল্লিখিত দিনগুলোর দশম দিনে উত্তরাধিকারী দিবংগতের নামে প্রচুর পরিমাণে ভোজন ও ঠাণ্ডা পানি পরিবেশন করে। একাদশ দিনে উত্তরাধিকারী এক ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত ভোজন ও 'দিরহাম' ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠিয়ে দেয় আর শোকবর্ষের প্রতিদিনই কমবেশি এরকমই করে থাকে।

ত্রিসপ্ততি অধ্যায়

জীবিত ও মৃত লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার (অর্থাৎ আত্মহত্যা ও মৃতের সৎকার প্রসঙ্গে)

মৃতদেহ সৎকারের আদিম প্রথাসমূহ

বহু বহু বছর আগে মৃতব্যক্তির দেহকে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হতো। এভাবে রোগীদেরও বন-বনান্তরে ও পাহাড়-পাহাড়ান্তরে ফেলে রাখা হতো। সেখানেই তাদের মৃত্যু হতো এবং সেখানেই তাদের ঐভাবে সৎকার করা হতো– একটু আগেই যা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে তারা রোগমুক্ত হয়ে গেলে পুনরায় নিজ-নিজ গৃহে ফিরে আসত।

তারপরে, এমন এক নিয়ামকের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যিনি লোকেদের আদেশ দেন যে, মৃতদেহগুলোকে খোলা বাতাসে ছেড়ে দিয়ে রাখো, পরিণামস্বরূপ, তাদের জন্য ছাদওয়ালা ইমারত তৈরি করে দেওয়া হলো। তার দেয়ালে হাওয়া চলাচলের পথ রাখা হলো, যার ভিতর দিয়ে হাওয়া-বাতাস চলাচল করতে পারত। এই ইমারতগুলো দেখতে কিছুটা জুরথ্রুস্টি (পারসিক বা অগ্নিউপাসক)-দের মিনারওয়ালা কবরগুলোর মতো ছিল।

এই প্রথা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসার পর নারায়ণ তাদের মৃতদেহগুলোকে সৎকার করার জন্য এক বিধান ছিলেন। সেই মতে, মৃতদেহকে আগুনকে সঁপে দেওয়া হলো। যার ফলে শুরু হলো দাহক্রিয়া, সেই ক্রিয়া যাতে শরীরের সমস্ত দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায় আর শরীরের লেশমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। সেই থেকে তাদের এই প্রথা চলে আসছে।

[সমকক্ষ ইউনানি প্রথারও উল্লেখ করা হয়েছে 'ইউনানিদের মধ্যে কবর দেওয়া ও পোড়ানো দুটি প্রথাই ছিল।']

...হিঁদুরা নিজেদের ব্যাপারে এ ধরনের কথাই বলে থাকেন। মানব-শরীরে এমন কিছু বস্তু আছে, যা পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে ছাই ও ভস্মরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়, যার ফলে তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে যায়।

অগ্নি ও সূর্যের কিরণ পরমাত্মা পর্যন্ত পৌছানোর সবচেয়ে নিকটতম অবলম্বন

এই (অমরাত্মা ও পরমাত্মার কাছে) প্রত্যাবর্তনের সম্পর্কে হিঁদুদের সিদ্ধান্ত যে, আংশিকরূপে সে প্রত্যাবর্তন তো সূর্যের কিরণ থেকে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ আত্মা নিজেকে তারই সংলগ্ন করে নেয় এবং তারই সঙ্গে উর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে এবং আংশিক রূপে আগুনের শিখা থেকে, যা তাকে (পরমাত্মা পর্যন্ত) নিয়ে যায়। কিছু হিঁদু এ প্রার্থনাও করে থাকে যে, পরমাত্মা স্বয়ং আত্মার ঐ স্থান পর্যন্ত পৌছানোর পথ যা একটি সরলরেখার রূপে নির্মিত, কেননা, তারই নিকটতম পথ আর উপরে যাওয়ার জন্য আগুন ও সূর্যকিরণ ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন নেই।

গজজের তুর্কিদের মধ্যেকার প্রচলিত প্রথাও কিছুটা এরকম। যা ডুবে মরে যাওয়া ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয়। তারা মৃতদেহকে নদীতে একটি ভেলার উপরে রেখে দেয় এবং তার পা দুটি একটি দড়ি দিয়ে নিচের দিকে বেঁধে দেয় আর ঐ দড়ি অগ্রভাগ পানির উপরে ফেলে রাখে। (তাদের বিশ্বাস যে,) উপরের এই দড়িটি মৃতের আত্মাকে বেঁধে উপরের দিকে নিয়ে যায়...।

লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে, বুদ্ধ মৃতব্যক্তির দেহকে নদীস্রোতে ভাসিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেজন্য– তাঁর শামানী অনুচররা তাদের মৃতদেহকে প্রবহমান নদীস্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

মৃতদেহ সৎকারের হিঁদু রীতিনীতি

হিঁদুদের প্রথানুসারে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উপর তার সৎকারের দায়িত্ব এসে পড়ে। সে অনুসারে তাকে স্নান, সংলেপন ও কাপড় দিয়ে ঢেকে, যতটা সম্ভব চন্দন কাঠ ও অন্যান্য জ্বালানি সহযোগে তাকে পুড়িয়ে দেয়। তার পুড়ে যাওয়া অস্থিকে বা ছাইভস্মের কিছুটা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয় যেমনটি সগর-পুত্রদের ছাইভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল, যাতে গঙ্গার ধারা তাকে নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে। ছাইভস্মের বাকিটা কোনো প্রবাহিত নদীনালায় ফেলে দেওয়া হয়। যেখানে দাফন করা হয়, সেখানে একটি স্মারক নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

তিন বছরের কমবয়সী শিশুদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় না।

মৃত ব্যক্তির সেই আত্মীয় যে সৎকারে সশরীরে অংশ নেয়, তাকে সপ্তাহান্তে দু'দিন গোসল করতে হয় এবং বস্ত্রাদি ধৌত করে পবিত্র হতে হয়, কেননা, সৎকারাদির কারণে সে অপবিত্র হয়ে যায়।

মৃতদেহকে দাহ করার সামর্থ্য যাদের নেই তারা হয় তাকে ভাগাড়ে ফেলে দেয়, নতুবা নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

আত্মহত্যার বিধিবিধান

যেখানে জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রতি অধিকারের প্রশ্ন, সেখানে হিন্দুরা তার দাহন-সৎকারের ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারে না। এরকম কিছু ঘটনাও ঘটে, যেমন, বিধবা সম্পর্কিত, অর্থাৎ সে যদি মৃত স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে চায়, তাহলে তার ব্যাপারটি তো ঐ চিতাতেই শেষ হয়ে যায়। আর যারা দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি বা শারীরিক ত্রুটির কারণে, যা কখনো আরোগ্য হবে না, অথবা বৃদ্ধাবস্থায় অথবা অশক্ততাজনিত কারণে চিরদুঃখী, (আত্মহত্যা তারাই করে থাকে) কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এমনটি করে না। এটা করে বৈশ্য ও শূদ্ররাই। আর এর পিছনে উপযুক্ত শরীর ও অবস্থা লাভের নিমিত্ত, যেখানে সে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আত্মহত্যা বিশেষ নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেজন্য ঐ দুই বর্ণের লোকেদের কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলে তারা কোনো গ্রহণের সময় অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা করে থাকে, অথবা অর্থ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে (বা পারিশ্রমিক দিয়ে) তারা গঙ্গায় ডুব দেয়, ঐ ব্যক্তিকে তারা বলে রাখে যে, যতক্ষণ না মৃত্যু হবে, ততক্ষণ যেন তাকে ডুবিয়ে রাখা হয়।

প্রয়াগবৃক্ষ

যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগ[৩৯] নামের একটি বটবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের বিশেষত্ব হলো এই যে, এর শাখা-প্রশাখা থেকে দুই প্রকারের জটা বা শিকড় বের হয়– যার কিছুটা মাটির নিচে থাকে আর কিছু গাছের উপর থেকে ঝুলতে থাকে। এই জটা যে শাখা থেকে বের হয়, ঐ জটা কোনো মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে, সেটা তার জন্য অবলম্বন হয়ে যায়। প্রকৃতি জেনে বুঝেই এই ব্যবস্থাটি করেছে, কেননা, তাকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ওখানে এসেই আত্মহত্যা করতে অভ্যস্ত। তারা এই গাছের উপরে চড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে জীবনের পরপারে চলে যায়।

চতুঃসপ্ততি অধ্যায়
বিভিন্ন প্রকারের ব্রত

ব্রত পালন করা হিঁদুদের একটি ঐচ্ছিক বিষয়, আর তা কর্তব্যাতিরিক্তও বটে। তাদের মতে, ব্রতের অর্থ হলো কিছু সময়ের জন্য আহার থেকে বিরত থাকা এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য বিরত থাকা। তাদের এ নিয়মও ভিন্ন প্রকৃতির।

ব্রতের বিভিন্ন পদ্ধতি

সাধারণ মধ্যম শ্রেণীর একটি পদ্ধতি হলো এই যে, তারা একটি দিন ঠিক করে নেয় যে, ঐ দিন তারা ব্রত রাখবে। কোনো সত্তাকে, তা ঈশ্বরও হতে পারেন, কোনো দেবতা বা কোনো প্রাণী তার স্মরণে ব্রত রাখেন তাকে প্রসন্ন বা খুশি করার জন্য। এরপর তারা ব্রতের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ব্রতের একদিন পূর্বে দুপুরের ভোজন তৈরি করার পর, দাঁতন করে বা দাঁত মাজে এবং পরের দিনের ব্রতের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ঐ সময়েই সে ভোজন ত্যাগ করে। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে সে পুনরায় দাঁত মাজে, স্নান করে আর দিনের অনুষ্ঠান পুরো করে। সে হাতে পানি নিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দেয়, নিজমুখে ঐ দেবতার নাম উচ্চারণ করে যার জন্য সে ব্রত রাখে, ঐ অবস্থায় শুরু থেকে তিন দিন পর্যন্ত থাকে। সূর্যোদয়ের পরে চাইলে সে ব্রত ত্যাগ করতে পারে আবার ইচ্ছার ব্যতিক্রম হলে দুপুর পর্যন্ত রাখতেও পারে।

এ ধরনের ব্রতকে তারা 'উপবাস' বলে, যার অর্থ অনাহারে থাকা, যদিও দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত আহার গ্রহণ না করাকে উপবাস নয়, 'একনক্ত'(?) বলে।

আর এক ধরনের ব্রত আছে, তাকে 'কৃচ্ছ্র' বলে : কোনো ব্যক্তি দুপুর বেলায় ভোজন করে এবং পরদিন সন্ধ্যায় আহার গ্রহণ করে। তৃতীয় দিনেও তাই খায়, যা না চাইতেই তাকে দেওয়া হয়। চতুর্থ দিন সে উপবাসে থাকে।

তৃতীয় প্রকারের এক ব্রতকে তারা 'পরক' বলে। তা হলো এরকম : কোনো ব্যক্তি একটানা তিন দিনকার ভোজন প্রতিদিন দুপুর বেলা করে থাকে। এই তিন

দিনের মধ্যে নিজের খাওয়ার সময়কে সে পরিবর্তন করে নিতে পারে। তারপর, সে একটানা তিনদিন অনাহারে থাকে।

আরেক প্রকারের ব্রত আছে, তাকে তারা 'চন্দ্রায়ন' বলে। পূর্ণিমার দিন তারা ব্রত পালন করে ; পরদিন তারা এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করে ; তার পরদিন তার দ্বিগুণ, চতুর্থ দিন তার তিনগুণ, আর এভাবে এই প্রক্রিয়া অমাবস্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সেই দিন তারা ব্রত রাখে, পরদিন তার ভোজন কমে গিয়ে পুনরায় এক গ্রাস অবশিষ্ট থেকে যাবে, আর পূর্ণিমা না আসা পর্যন্ত তা জারি থাকে।

এছাড়া আরেক ধরনের ব্রত আছে, যাকে তারা 'মাসোয়াস' (বা মাসোপবাস) বলে। এ ব্রত তারা মাস যাবৎ পালন করে, তা ত্যাগ করে না।

তাদের ধারণা যে, চৈত্র মাস ব্যাপী ব্রত পালন করলে কুলীন সন্তানদের চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ লাভ করা যায়। যদি সে বৈশাখে পালন করে তাহলে সে তার বংশের উপর শাসন জারি রাখতে পারবে...। যদি সে জ্যৈষ্ঠ মাসভর ব্রত রাখে, তাহলে মহিলারা অনুগত হবে। আষাঢ়ে ব্রত পালন করলে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করবে। শ্রাবণে পালন করলে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ভাদ্র মাসে পালন করলে ধন, শৌর্য, সম্পত্তি ও পশুসম্পদ লাভ করবে। আশ্বিন মাসে পালন করলে সে শত্রুদের উপর সর্বদাই বিজয়ী হবে। কার্তিক মাসে পালন করলে... তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। অগ্রহায়ণ মাসে পালন করলে সে অত্যন্ত সুন্দর ও উর্বর দেশে জন্মলাভ করবে। পৌষ মাসে পালন করলে তার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। মাঘ মাসে পালন করলে অপার সম্পত্তির অধিকারী হবে। ফাল্গুন মাসে ব্রত পালন করলে সকলের ভালোবাসার পাত্র হবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি বছরের সবকটি মাসে ব্রত পালন করে এবং বছরে মাত্র বারো বার তা ভঙ্গ করে, সে ১০,০০০ বছর পর্যন্ত স্বর্গবাস করবে আর সেখান থেকে কুলীন, শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারে সে পুনর্জন্ম লাভ করবে।

পঞ্চসপ্ততি অধ্যায়
ব্রতের দিনগুলোর নির্ধারণ

মাসের প্রত্যেক পক্ষের অষ্টম ও একাদশ দিনে ব্রত নির্ধারিত হয়

পাঠকদের একথা অবগত করা উচিত যে, অশুভ বলে বিবেচনা করে অধিমাসকে বাদ দিয়ে প্রত্যেক মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টম এবং একাদশতম দিনে ব্রত পালন করা হয়।

একাদশতম দিনে বিশেষ করে বাসুদেবের পুজো করা হয়। কেননা, মাহুর (মথুরা ?) অধিকার করে নেওয়ার পর ওখানকার অধিবাসীরা মাসে একদিন ইন্দ্রের পুজো করত, তিনিই সেই পুজো একাদশতম দিনে নির্ধারিত করে দেন, যাতে সেটি তার নামেই হয়...। সেই কারণে তারা পরিপূর্ণভাবে স্বচ্ছ বা পবিত্র হয়ে ঐ দিন ব্রত পালন করে, সারা রাত জেগে পুজো করে– কেননা, এটাকে তারা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করে, যদিও তা নয়।

[এখানে সারা বছরের কিছু একদিনের ব্রতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এগুলোর কিছুটা এরকম :]

চৈত্রের ষষ্ঠ দিনে সূর্য পুজোর জন্য ব্রত...।

শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমার দিন সোমনাথের পুজোর জন্য ব্রত...।

ঐ মাসের অষ্টম দিনে ভগবতীয় পুজোর জন্য নির্ধারিত। চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে ব্রত ত্যাগ করতে হয়।

ভাদ্রপদের পঞ্চম দিনে সূর্যপুজোর জন্য ব্রত পালন করা হয়, যাকে 'ষট' বলা হয়।

কার্তিক মাসে চন্দ্র যখন রেবতীতে অবস্থান করে, যেটি তার অন্তিম নক্ষত্র, সেদিন বাসুদেবের জাগরণের স্মৃতিতে ব্রত দিবস পালন করা হয়। একে তারা 'দেবোত্থিনী' বা দেবতার শয্যাত্যাগ বলে অভিহিত করে। এছাড়া শুক্ল পক্ষের একাদশ তারিখকেও কিছু লোক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে...।

পৌষ মাসের ষষ্ঠ তারিখে সূর্যদেবতার সম্মানে ব্রত পালন করা হয়।

মাঘের তৃতীয় দিনটি পুরুষদের জন্য নয়, মহিলাদের ব্রতের জন্য নির্ধারিত। একে তারা গৌরী তৃতীয়া বলে অভিহিত করে, আর তা পুরো একদিন ও এক রাতের হয়ে থাকে। পরদিন সকালে তারা তাদের পতিদের আত্মীয়স্বজনদের উপহারাদি প্রদান করে।

ষষ্টিসপ্ততি অধ্যায়

ব্রত ও আমোদ-প্রমোদের দিন

চৈত্র দ্বিতীয়া

যাত্রার অর্থ হলো শুভক্ষণে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়া। একটি ভোজও আছে, যাকে 'যাত্রা' বলা হয়। হিঁদুদের অধিকাংশ ব্রত[৪০] মহিলা শিশুরা পালন করে থাকে। চৈত্র মাসের দ্বিতীয় তিথিতে কাশ্মিরে একটি পর্ব উদযাপিত হয়, তাকে তারা 'আগদাস' (?) বলে, এটি তারা রাজা মুত্তাই এর তুর্কিদের উপর বিজয় উপলক্ষে উদযাপন করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, ঐ রাজা সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। কিন্তু তারা ঠিক এই ধরনের কথা তাদের অধিকাংশ রাজার সম্পর্কেই বলে থাকে। আরেকটি কথা হলো এই যে, এ ঘটনা প্রসঙ্গে তারা যে যুগ-কালের উল্লেখ করে, তা আমাদের পূর্বকালেরও কোনো ঘটনা নয় ; এ থেকে প্রতীত হয় যে, এ বৃত্তান্ত সর্বৈব মিথ্যা। অবশ্য, এও অসম্ভব নয় যে এক হিঁদু (এক বিশাল সাম্রাজ্যের উপরে) রাজত্ব করেছিলেন, যেমন গ্রিক, রোমক, ব্যাবিলনীয় ও ইরানিরা করেছিলেন, কিন্তু তার শাসনকাল আমাদের কাল থেকে অতীতের নয় বলে সপ্রমাণিত। (এজন্য বাস্তবিকই কোনো হিঁদু যদি তা করত, নিশ্চয় তা আমাদের অজানা থাকত না)। সম্ভবত, উক্ত রাজা সারা ভারতের উপর তাঁর শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে থাকবেন। আর তাদের ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশ ও জাতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

চৈত্র একাদশী

চৈত্র মাসের এগারো তারিখে তাদের একটি উৎসব পালিত হয়, একে তারা বলে 'হিন্দোল চৈত্র'। এই উৎসবে তারা বাসুদেবের মন্দিরে একত্রিত হয়ে বাসুদেবের শৈশবকালীন মূর্তি তৈরি করে দোলনায় বসিয়ে তাকে দোল দেয়। যেমনটি শৈশবে করা হতো। ঐদিন তারা দিনভর আনন্দোৎসবে মেতে থাকে।

পূর্ণিমা

চৈত্র পূর্ণিমায় তারা 'বহন্দ' (বসন্ত) উৎসব পালন করে, এটি করে মহিলারা। ঐদিন তারা অলঙ্কারাদি পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে প্রতিদের কাছে উপহার দাবি করে।

চৈত্র দ্বাবিংশতি

চৈত্র মাসের বাইশ তারিখে তারা 'চৈত্র সংক্রান্তি' পালন করে। এটি তাদের আমোদ-প্রমোদের দিন, তারা দেবী ভগবতীর উদ্দেশে পুণ্যলাভের আশায় এটি করে। এদিন লোকেরা পুণ্যস্নান ও দানধ্যান করে।

বৈশাখী তৃতীয়া

বৈশাখী তৃতীয়া মহিলাদের পর্ব, যাকে তারা 'গৌরী-তৃতীয়া' বলে। এ হিমালয় - কন্যা ও মহাদেবের পত্নী গৌরীর উদ্দেশে পুণ্যলাভের আশায় করা হয়। এদিন তারা স্নান সমাপনান্তে মূল্যবান শাড়ি পরিধান করে, তারা গৌরী মূর্তির পূজা করে এবং সামনে প্রদীপ জ্বালায়। তাতে তারা দান করে এবং অন্ন গ্রহণ করে।

বৈশাখ মাসের দশম তিথিতে রাজা সমস্ত ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করেন। সেখানে তারা খোলা ময়দানে একত্রিত হয় এবং পূর্ণিমার প্রথম পাঁচদিন পর্যন্ত যজ্ঞের জন্য মহাগ্নি প্রজ্বলিত করে। তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ষোলোটি এবং চারটি দলে অগ্নি প্রজ্বলিত করে। প্রত্যেকটি দলে একজন করে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করে। এরকমই চারটি বেদের ন্যায় চারজন যাজ্ঞিক থাকে। ষোড়শ তিথিতে তারা ঘরে ফিরে যায়।

মহাবিষুব

এই মাসে মহাবিষুব হয়, যাকে তারা বসন্ত বলে। তারা গণনা করে এই দিন নির্ধারণ করে এবং এদিনই ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

জ্যৈষ্ঠ প্রথমা

জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিনে অথবা অমাবস্যার দিনে তারা একটি উৎসব পালন করে। ঐ দিন সমস্ত বীজের প্রথম ফলকে পানিতে নিক্ষেপ করা হয় যাতে সুফল লাভ করে।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা

এই মাসের প্রথম দিনে মহিলারা একটি ব্রত পালন করে তাকে 'রূপপঞ্চ' (?) বলে।

আষাঢ়

আষাঢ় মাসের সমস্ত দিনকে দানধ্যানের মধ্যে কাটানোকে তারা পুণ্য বলে জ্ঞান করে। একে তারা 'আহারনী'ও বলে। ঐদিন তারা গৃহে নতুন পাত্র নিয়ে যায়।

শ্রাবণ পঞ্চদশী

শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন তারা ব্রাহ্মণ ভোজন করায়।

আশ্বিনের অষ্টমী

আশ্বিনের অষ্টমীতে চাঁদ ঊনবিংশ বা মূল নক্ষত্রকক্ষে প্রবেশ করলে আখের রস নিষ্কাশন শুরু হয়। এটি হলো মহাদেবের ভগিনী[৪১] মহানববীর পুজো। তখন তারা আখের প্রথম ফসল শর্করা (চিনি বা গুড়) দিয়ে কোনো প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি সেই মূর্তিতে অর্পণ করে, একে তারা ভগবতী বলে অভিহিত করে। তারা তা থেকে নিবৃত্ত হয়ে প্রচুর দানধ্যান করে এবং শিশু বলি দেয়। যার কাছে চড়াবার বা অর্পণ করার মতো কিছু না থাকে সে মূর্তির সামনে না বসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে বলি-দাতা ঘাতক হঠাৎ তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে...।

ভাদ্রপদ, অমাবস্যা

ভাদ্রমাসে চন্দ্র যখন দশম নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থান করে, তখন তারা একটি উৎসব পালন করে, তারা একে বলে 'পিতৃপক্ষ'[৪২] অর্থাৎ পিতর-এর অর্ধমাস, কেননা, চন্দ্রের এই নক্ষত্রে প্রবেশ অমাবস্যার নিকটবর্তী সময়েই হয়ে থাকে। এই পনেরো দিনে তারা তাদের পিতরদের নামে দানধ্যান করে থাকে।

ভাদ্রপদ তৃতীয়া

ভাদ্রপদ তৃতীয়ায় মহিলারা 'হরবলী' (?) নামক এক ব্রত পালন করে। এই প্রথানুসারে তারা একটা টুকরিতে সমস্ত রকমের ফল-ফসলের বীজ বপন করে, যখন তাতে চারা গজাতে শুরু হয়, তখন তা জনসাধারণের সামনে প্রদর্শন করা হয়। তারা তাতে নানা প্রকারের সুগন্ধি পানি ছড়িয়ে দেয় এবং রাত-ভর তারা একে অন্যের সঙ্গে ক্রীড়া উপভোগ করে। পরদিন সকালে সে সমস্ত টুকরি পুকুরে এনে সেগুলোকে ধোয়, স্নান করে এবং দান করে।

ভাদ্রপদষষ্ঠী

এই মাসের ছয় তারিখে কারাবাসীদের ভোজন দান করা হয়, যাকে তারা 'গৈহাট' (?) বলে।

ভাদ্রপদ অষ্টমী

ভাদ্রমাসের অষ্টম তিথিতে যখন চন্দ্র অর্ধেক বিকশিত হয় তখন তারা একটি ব্রত পালন করে, একে তারা 'ধ্রুবগৃহ' (?) বলে অভিহিত করে ; তারা স্নান করে এবং পৌষ্টিক অন্ন ভোজন করে যাতে স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মলাভ করে। মহিলারা গর্ভধারণকালে এবং সন্তান লাভের ইচ্ছায় ঐ ব্রত পালন করে থাকে।

ভাদ্রপদ ষোড়শী

চন্দ্র যখন চতুর্থ নক্ষত্র রোহিণীতে অবস্থান করে তখন তারা ঐ সময়কে 'গুণালহীদ' (?) বলে অভিহিত করে এবং তিন দিন যাবৎ ব্রত পালন করে, একে অন্যের সঙ্গে ক্রীড়ালিপ্ত হয় এবং বাসুদেবের জন্মোৎসব পালন করে...।

কার্তিক প্রথমা

কার্তিক প্রথমা বা অমাবস্যার সূর্য যখন তুলারাশিতে গমন করে তখন তারা তাকে 'দীওয়ালী'[৪৩] বলে অভিহিত করে। এদিন লোকেরা স্নান করে, ভালো বস্ত্র পরিধান করে, একে অন্যকে পান-সুপারি উপহার দেয়, ঘোড়ায় চড়ে মন্দিরে যায় দান করতে আর পরস্পরে দুপুর পর্যন্ত আনন্দোল্লাসে মেতে থাকে। রাতের বেলায় যত্রতত্র দীপ জ্বালায় এই মানসে যে, সর্বত্রই যেন স্বচ্ছতা বিরাজ করে। এই পর্বের উদ্দেশ্য হলো যে, বাসুদেবের পত্নী লক্ষ্মী, বিরোচনের পুত্র বলিকে– যিনি সপ্তম লোকে বন্দী হয়ে আছেন, বছরে তাকে একবার এই দিনে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পৃথিবীর সর্বত্রই তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এ কারণে এ পর্বকে 'বলিরাজ্য' বলা হয়...।

এই মাসে পূর্ণচন্দ্র যখন পূর্ণতা লাভ করে, তারপর থেকে কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপী মহিলাদের ভোজে আহ্বান এবং আপ্যায়ন করা হয়...।

মার্গদশী পঞ্চদশী

এই মাসে পূর্ণিমার দিনে মহিলারা একটি ব্রত পালন করেন, পৌষ মাসের অধিকাংশ দিন তারা 'পুহবল' (পিঠা) অর্থাৎ মিষ্টিমিশ্রিত পিঠাপুলি ভক্ষণ করেন এবং তা প্রচুর পরিমাণে তৈরি করেন।

পৌষ অষ্টমী

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম দিনকে তারা 'অষ্টক' বলে অভিহিত করেন। ঐদিন তারা ব্রাহ্মণদের একত্রিত করে এক ধরনের খাদ্যান্ন তৈরি করেন, আরবিতে যাকে বলে 'সরমক', তা দিয়ে তাদের আতিথ্য করেন।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনকে 'সাকার্তম' বলে, ঐদিন তারা ওলকপি খান।

মাঘ তৃতীয়া

মাঘের তৃতীয়া তিথিকে তারা 'মাহতৃজ' (মাঘ তৃতীয়া ?) বলে। ওটা মহিলাদের ব্রত, ঐদিন তারা গৌরীর পুজো করে। তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাড়িতে গৌরীর মূর্তির সামনে একত্রিত হয়, তাকে অনেক প্রকারের মূল্যবান বস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ও সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদি অর্পণ করা হয়। প্রত্যেক মিলনস্থলে তারা ১০৮টি ঘড়া ভরতি করে পানি রেখে দেয়, এই পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা দিয়ে রাতের চারটি প্রহরে চারবার স্নান করে। পরদিন তারা গোসল করে, ভোজ দেয় এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করে, এ মাসের প্রতিটি দিনে এটা করাটা তাদের একটা সাধারণ ব্যাপার...।

ফাল্গুন পঞ্চদশী

ফাল্গুন পূর্ণিমায় মহিলাদের 'ওডস', বা 'ঢোলা'[৪৪] (অর্থাৎ ডোলা) নামে একটি ব্রত আছে। ঐদিন তারা আগুন জ্বেলে তাকে গ্রামের বাইরে ফেলে দেয়।

ফাল্গুন ষোড়শী

পরদিন রাত্রে তারা 'শবরাত্রি'[৪৫] করে, সারারাত ধরে মহাদেবের পুজো করে, বিনিদ্র রজনী যাপন করে তারা গন্ধপুষ্প দিয়ে পুজো করে।

ফাল্গুন ত্রিবিংশতি

তেইশ তারিখকে 'পুয়ত্তন' বলে, ঐদিন তারা ঘি-চিনি দিয়ে ভাত খায়।

মুলতানি উৎসব

মুলতানের হিংদুরা 'সম্বরপুর' যাত্রা নামে একটি উৎসব পালন করে এবং সূর্য পুজো করে।

সপ্তসপ্ততি অধ্যায়

বিশেষরূপে পুণ্যদিবস, শুভাশুভ সময় তথা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনুকূল সময়

প্রতিটি দিনের গুণাগুণ অনুযায়ী হিঁদুদের মধ্যে কমবেশি শ্রদ্ধাভাব বিরাজ করে। এটা হলো তাদের দ্বারা আরোপিত গুণ। উদাহরণত, রবিবার দিন, এটিকে তারা বিশেষভাবে এজন্যই গুরুত্ব দেয় যে, সেটি সূর্যের দিন, আর এটি সপ্তাহের শুরুর দিন, ঠিক ঐ রকম ইসলামে যেমন শুক্রবারটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

অমাবস্যা-পূর্ণিমা

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনটিকেও তারা যুতি (অমাবস্যা) ও বিযুতি (পূর্ণিমা)'র দিন হিসেবে গুরুত্ব দেয়, কেননা, তার সঙ্গে চন্দ্রকলার ক্ষয়-বৃদ্ধির সীমা পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষয় ও বৃদ্ধির সম্বন্ধে হিঁদুদের বিশ্বাসানুযায়ী ব্রাহ্মণরা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অগ্নিতে নিরন্তর আহুতি দেন। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত পুরো সময়-কালের মধ্যে তাঁরা যে সমস্ত বস্তু আগুনে আহুতি দেন তাতে সমস্ত দেবতার অংশ একত্রিত হতে থাকে। তারপরে, পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত দেবতাদের ঐ ভাগ বণ্টন করা হয় আর অমাবস্যার আগমন পর্যন্ত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পিতরদের আগমন মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। সেজন্য এ দুদিন যাবৎ যা দান করা হয় তা সর্বদাই পিতরদের সম্মানে করা হয়ে থাকে।

চারদিন, অর্থাৎ চার যুগের আরম্ভের দিন

আর চারটি বিশেষ দিনকেও পুণ্যদিবস বলে গণ্য করা হয়। হিঁদুদের মতানুসারে, এই দিনগুলো প্রতিটি চতুর্যুগের আরম্ভের দিন।

বৈশাখ তৃতীয়া, যাকে 'ক্ষয়ৌতি' (?) বলে, এই দিনে 'কৃতযুগ' শুরু হয়।

কার্তিক নবমীতে, ত্রেতা-যুগের শুরু।

মাঘ পঞ্চদশীতে দ্বাপর যুগের শুরু।

আশ্বিনের ত্রয়োদশী, কলি-যুগের শুরু।

আমার মতে, এ চারটি দিন উৎসবের দিন, অন্য আর যুগগুলোর জন্য পুজো রয়েছে। এ দিনগুলো দান তথা অন্য কিছু ধার্মিক অনুষ্ঠান অথবা সংস্কারের প্রয়োজনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ঠিক খ্রিষ্টানদের স্মরণোৎসবের মতো, কিন্তু আমার মতে, এটা ঠিক নয়, কেননা, এ চারযুগের আরম্ভের দিনগুলো উল্লেখিত দিনগুলোর ন্যায় হয়ে থাকবে।

[আল বিরুনী চারটি যুগের প্রারম্ভের বাস্তবিক দিনগুলোকে নির্ধারণের জন্য পরিকলনের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে, এ ধরনের সঠিক নির্ধারণ 'অত্যন্ত কৃত্রিমভাবে' করা সম্ভব ছিল।]

পুণ্যকাল

পুণ্যপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময়কে 'পুণ্যকাল' বলা হয়..।

এতে সন্দেহ নেই যে, পূর্বের অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যলাভের জন্য দানধ্যান ও ভোজ দেওয়া হয়। এসবের মাধ্যমে লোকেদের যদি পুণ্যপ্রাপ্তির আশা না থাকত তাহলে তারা আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দোৎসবের দিনগুলোর বিশেষত্বগুলোকে কখনোই স্বীকার করত না।

এছাড়া তারা দিনগুলোর শুভাশুভের স্বরূপানুসারেও পুণ্যকাল নির্ধারণ করেছে।

সংক্রান্তি

সূর্যের একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রস্থানের দিনগুলোকেও শুভ বলে গণ্য করা হয়। একে তারা সংক্রান্তি বলে অভিহিত করে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শুভ হলো বিষুব ও অয়নের দিনগুলো, এর মধ্যে সর্বাধিক মাঙ্গলিক হলো মহাবিষুবের দিন। ওটিকে তারা 'বিখু' বা শিধু' (বিষুব) বলে, কেননা, 'ষ' ও 'খ' ধ্বনিগুলো দ্বারাও নিজের স্থান পরিবর্তন করতে সক্ষম।

যে কোনো গ্রহের পক্ষে ক্ষেত্র পরিবর্তনের সময় মুহূর্তের বেশি লাগে না কিন্তু ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই হোমানলে ঘি এবং অন্নের সঙ্গে 'সান্ত' (?) নামক নৈবেদ্য চড়ানো অত্যাবশ্যক। এজন্য হিঁদুরা ক্ষেত্র পরিবর্তনের সময় দীর্ঘায়িত করে থাকে। যে মুহূর্তে সূর্যের পূর্বপ্রান্ত কক্ষের প্রথমাংশ স্পর্শ করে, সেই মুহূর্তকে তারা 'প্রারম্ভিক' বলে অভিহিত করে ; সূর্যের মধ্যভাগ যখন কক্ষ স্পর্শ করে তখন সেটাকে বলে মাধ্যমিক, জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রে একে কক্ষান্তর (একরাশি থেকে অন্য রাশিতে) বলে গণ্য করা হয়, আর ঐ সময়কে 'অন্তিম' বলে অভিহিত করা হয়, যখন সূর্যের পশ্চিম প্রান্ত কক্ষের প্রথমাংশ স্পর্শ করে। তখন সূর্যের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া দু'ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

[সংক্রান্তি নির্ণয়ের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে।]

গ্রহণ-কাল

...এছাড়া তারা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময়কে শুভক্ষণ বলে গণ্য করে। তাদের বিশ্বাস মতে, এর ফলে সমগ্র পৃথিবীর নদী ও সমুদ্রের জলরাশি গঙ্গার মতো পবিত্র হয়ে যায়। এই বিশ্বাসটি এতই অন্ধ ও অতিরঞ্জিত যে, মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ-লাভের আশায় তারা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যাও করে থাকে। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বৈশ্য ও শূদ্ররাই করে থাকে ; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্য এটা করা নিষেধ, সেজন্য তারা আত্মহত্যা করে না।

পর্বন ও যোগ

এছাড়া পর্বনের সময়টিও তাদের মতে পুণ্যকাল, অর্থাৎ যে সময়ে গ্রহণ হয়ে থাকে। আর গ্রহণ না হলেও সে সময়টিকে শুভ বলে গণ্য করা হয়।

'যোগ'-এর সময়টিকেও গ্রহণের ন্যায় শুভ বলে গণ্য করা হয়। আমি এর জন্য আলাদা একটি অধ্যায় নির্দিষ্ট করেছি (উনাশীতি অধ্যায়)।

ভূমিকম্পের সময়

ভূমিকম্পের সময়টিকে তারা অত্যন্ত অশুভ সময় বলে গণ্য করে। (এ সময়টির কোনো প্রকারের গুণ আছে বলে তারা মানে না)। ঐ সময়ের আকস্মিক সর্বনাশের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা তাদের ঘরের বাসনপত্র আছড়ে ভেঙে ফেলে। এ রকমের অনিষ্টকর সময়ের বর্ণনা 'সংহিতা'-য় দেওয়া হয়েছে– তা হলো, এ সময়ে ভূমি-স্খলন, উল্কাপাত, আকাশের রক্তিমাভা ধারণ, বজ্রাঘাত, ধূমকেতু দেখা দেওয়া, আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি বদলে যাওয়া, গ্রামগুলোতে বন্যজন্তুদের প্রবেশ করা, অসময়ে বৃষ্টিপাত হওয়া, বে-মওসুমে গাছে নতুন পাতা গজানো, ঋতু বিপর্যয় ছাড়াও অন্যান্য ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটে...।

অষ্টসপ্ততি অধ্যায়
করণ

'করণ'-এর ব্যাখ্যা

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, চান্দ্রদিবসকে 'তিথি' বলা হয় এবং তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে যে, চান্দ্রদিবস, সৌরদিবস বা ব্যবহারিক দিবসের চেয়ে ছোট হয়, কেননা, চান্দ্র মাস হয় ত্রিশ চান্দ্রদিবসে কিন্তু ব্যবহারিক দিবস সাড়ে ঊনত্রিশ দিনের চেয়ে সামান্য একটু বড় হয়।

হিঁদুরা তিথিকে যেমন অহোরাত্র বলেন, তেমনই তারা তিথির পূর্বার্ধকে দিন ও উত্তরার্ধকে রাত বলেন। এই অর্ধাংশগুলোর প্রত্যেকের পৃথক-পৃথক নাম রয়েছে আর এগুলোকে সম্মিলিতভাবে (অর্থাৎ চান্দ্র মাসের চান্দ্রদিবসগুলোর সমস্ত অর্ধাংশকে) 'করণ' বলে অভিহিত করেন।

['করণ' নির্ণয়ের নিয়মাইল প্রদত্ত হয়েছে।]

'ভুক্তি'র ব্যাখ্যা :

'বুহ্ত' (বা ভূত) কথাটির উৎপত্তি ভারতে। ভারতীয় ভাষায় একে 'ভুক্তি' (গ্রহের দৈনিক গতি) বলে। নির্ভুলভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে তাকে তাঁরা 'ভুক্তিস্ফুট' বলেন। এর মধ্যম গতিকে বোঝাতে তাঁরা 'ভুক্তিমধ্যমা' বলেন, আর 'বুহ্ত' (ভূত) বোঝাতে তাঁরা 'ভুক্তান্তর' অর্থাৎ দুই ব্যক্তির মধ্যবর্তী অবস্থাকে উল্লেখ করেন।

মাসের অর্ধাংশের চান্দ্রদিবসগুলোর নাম

চান্দ্র মাসের দিবসগুলোর বিশেষ নাম রয়েছে, যা নিচের তালিকায় দেখানো হয়েছে। কোন চান্দদিবসে আপনি আছেন, তা যদি জানতে চান তাহলে নিচের তালিকার পাশেই তার সংখ্যা দেওয়া আছে এবং আপনি কোন করণে আছেন তা-ও বলা আছে। যদি বর্তমান দিবসের অতিবাহিত হওয়া দিন অর্ধেকের কম হয়

তাহলে 'করণ' হয় দৈনিক, আর তার অর্ধেকাংশ অতিবাহিত হলে তার 'করণ' হবে নৈশ...।

[তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।]

'করণ'সমূহের তালিকা ও তার গুণাবলি

হিঁদুদের প্রথানুযায়ী তাদের করণসমূহের অধিপতি রয়েছে। এছাড়া তাঁরা কিছু নিয়মকানুনও তৈরি করে রেখেছেন, তাতে দেখানো হয়েছে প্রত্যেক 'করণ'-এর সময়ে কী করা যাবে, আর কী যাবে না। এ নিয়ম জ্যোতিষ-বিষয়ক করণসমূহের (শুভ অথবা অশুভ দিন ইত্যাদি) নিয়মাবলিতে আছে। আমরা যদি করণসমূহের অন্য তালিকা পেশ করি, তাহলে তা কেবল এ উদ্দেশ্যে হবে যে, তা পূর্ব-তালিকারই পুনরাবৃত্তি। আর তা তবে এক অজ্ঞাত বিষয়, যা মানুষ বারবার চেষ্টার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে।

[তালিকা প্রদত্ত হয়েছে এবং 'করণ'গুলোর পূর্বাভাসমূলক প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে।]

আর-বিরুনী বলেছেন যে, আলকিন্দী এবং আরও কিছু আরব লেখক 'করণ'সমূহের ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কিন্তু ব্যাপারটা তারা ভালোমত বুঝতে পারেননি। যদিও তাঁরা তার কমবেশি সংশোধন করেছেন 'কিন্তু তার আদি রূপটিই বদলে গেছে।'

সেজন্য হিঁদুদের ও আলকিন্দীর পদ্ধতির পৃথক পৃথক বিচার করা উচিত।

উনাশীতি অধ্যায়
যোগ

এমন কিছু সময় আছে, যাকে হিঁদুরা অত্যন্ত অশুভ বলে গণ্য করেন। এ সময়ে তাঁরা যে কোনো রকমের শুভকাজ থেকে বিরত থাকেন। এরকম অনেক সময় আছে, এখানে আমি তার কিছুটা উল্লেখ করব।

'ব্যতিপাত' ও 'বৈধৃত'-এর ব্যাখ্যা

এমন দুটি যোগ আছে, হিঁদুরা যে বিষয়ে একমত :

(ক) সূর্য ও চন্দ্র যে সময়ে দুটি বৃত্তে অবস্থান করে এবং সংযুক্তভাবে একই বৃত্তে লম্বমান মনে হয়, এই যোগকে তারা 'ব্যতিপাত' বলে।

(খ) যে সময়ে চন্দ্র ও সূর্য দুটি সমান্তরাল বৃত্তে অর্থাৎ বিত্তদ্রব্যের প্রত্যেকটিতে সমভাবে অবস্থান করে এবং যার দিক্‌পাত সমান হয়, তাকে তারা 'বৈধৃত' বলে।

['ব্যতিপাত' ও 'বৈধৃত'-এর গণনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ পুলিশ ও 'করণতিলক'-এর লেখকরা করেছেন। আল বিরুনী এই দুই পুস্তকের উল্লেখও করেছেন, যাতে 'আরবি খাণ্ডখাদ্যক'ও রয়েছে, যেটি 'সায়ব্বাল'[৪৬] নামক কাশ্মিরি লেখক রচনা করেছিলেন। যোগসমূহের নাম এবং তাদের গুণাবলির তালিকাও তাতে দেওয়া হয়েছে।]

অশীতি অধ্যায়

হিঁদু ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত ও ফলিত জ্যোতিষ-সম্পর্কিত তাঁদের গণনা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে মুসলিমদের অজ্ঞতা

এই (মুসলিম) দেশগুলোতে আমাদের সমমতাবলম্বীরা হিঁদুদের ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এ ধরনের বিষয়ে এ সম্পর্কিত গ্রন্থাধ্যয়নের সুযোগও তাঁরা পাননি। ফলে, তাঁরা মনে করেন যে, হিঁদুদের ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র তাদেরই অনুরূপ এবং অনেক কিছুকেই তাঁরা ভারতীয় উৎসজাত বলে মনে করেন। বলা বাহুল্য, আমি তার সামান্যতম ইঙ্গিতও হিঁদুদের জ্যোতিষশাস্ত্রে পাইনি। এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যেমন অল্পবিস্তর সমস্ত বিষয়বস্তুরই উল্লেখ আছে, তেমনিভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়াদিও উল্লেখ করব, যাতে পাঠকরা ঐ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলি সম্পর্কে চর্চা করতে পারেন। যদিও তাতে অনেক সময় লাগবে, তা সত্ত্বেও শাস্ত্রের প্রধান তত্ত্বগুলোর উল্লেখ তার চেয়ে কম সময়সাপেক্ষ।

প্রথমেই পাঠকদের একথা জ্ঞাত থাকা উচিত যে, অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী তারা উচিত-মতো গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সংকেতানুযায়ী না করে তাঁরা বাহ্যিক গঠন ও পাখির উড্ডয়ন ইত্যাদি থেকে করে থাকেন।

গ্রহ

গ্রহের সংখ্যা সাতটি হওয়ার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো মতপার্থক্য নেই। তাঁরা ঐগুলোকে 'গ্রহ' বলে অভিহিত করে থাকেন। ঐগুলোর মধ্যে তাঁরা বৃহস্পতি ও শুক্রকে শুভ বলে জ্ঞান করেন আর চন্দ্রগ্রহকে তারা 'সৌম্য' বলে অভিহিত করেন। (তাদের মতে,) শনি, মঙ্গল ও সূর্য সর্বদাই অশুভ, এদের তাঁরা 'ক্রূর' বলে অভিহিত করেন। অন্য একটি গ্রহকে তারা 'রাহু' বলে অভিহিত করেন, বাস্তবিকই সেটি গ্রহ নয়। গ্রহের স্বভাব পরিবর্তনশীল, তা শুভাশুভ যাই

হোক না কেন, সে যে গ্রহের উপর সংযুক্ত তার উপর নির্ভরশীল। এটা হলো বুধ, একাকী হওয়ার কারণে তা শুভ।

[সাতটি গ্রহের নাম, তাদের মাধ্যমে মানুষের লিঙ্গ এবং চরিত্রের যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তার বিভিন্ন নিদেন, বছরের উপযুক্ত ভাগ বা কাল ইত্যাদি সম্বলিত তালিকা এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, রাশিচক্রের বৈশিষ্ট্যসূচক তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।]

ভারতীয় ভাষায় কতিপয় ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিভাষিক শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

গ্রহের উচ্চতা বা উন্নতাংশকে ভারতীয় ভাষায় 'উচ্চস্থ' বলা হয় এবং এর বিশিষ্ট উচ্চাংশকে 'পরমোচ্চস্থ' বলা হয়। গ্রহের গভীরতা ও তার নিম্নস্থানকে 'নিচস্থ' ও তার বিশিষ্ট অংশকে 'পরনিচস্থ' বলা হয়। 'মূল ত্রিকোণ'-এর প্রভাব খুব বেশি হয় যাতে গ্রহের সময় আরোপ করা হয় যখন তা দুই ঘরের মধ্যস্থলে অবস্থান করে...।

তাঁরা ত্রিকোণীয় অবস্থান সম্পর্কিত প্রকৃতিকে গ্রহদৃষ্টির ত্রিকোণ থেকে বিচার করেন না, যেমনটি আমরা করে থাকি ; বরং তালিকায় যেমন দেখানো হয়েছে, সেই অনুসারে তাঁরা সাধারণভাবে অষ্টকোণের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

ঘূর্ণায়মান রাশিকে তাঁরা 'চররাশি' বা চলমান রাশি বলেন, দণ্ডায়মানকে 'স্থিররাশি' এবং পিণ্ডাকৃতি রাশিকে 'দ্বিস্বভাব' বা সংযুক্ত রাশি বলে অভিহিত করেন।

ভবন

যেভাবে আমরা রাশিসমূহের তালিকা প্রদান করেছি, তেমনি পরবর্তীতে আমরা 'ভবন'সমূহের তালিকাও প্রদান করব, তাতে প্রত্যেকের গুণের উল্লেখ করা হবে। তারা পৃথিবীর উপরের অর্ধাংশকে 'ছত্র' এবং নিচের অর্ধাংশকে 'নৌ' অর্থাৎ জলযান বলে অভিহিত করেন। এছাড়া উর্ধ্বগামী নিম্নগামী অর্ধাংশের মধ্যবর্তী স্থানকে তাঁরা বলেন 'ধনু'। মৌলিক কক্ষকে বলেন 'কেন্দ্র' আর পরবর্তী ভবন বা কক্ষগুলোকে বলেন 'পণকর' (?) এবং আনত কক্ষগুলোকে বলেন অপোক্লীশ (?)।

[ভবন বা কক্ষগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে।]

এ পর্যন্ত যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বাস্তবিকই তা হলো হিঁদু জ্যোতিষশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু, যেমন রাশি ও ভবন। এ থেকে সেগুলোর প্রত্যেকের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভবিষ্যতের পূর্বলক্ষণ-সূচক বৈশিষ্ট্যগুলো যে যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারে সে-ই সুদক্ষ বলে গণ্য হয় এবং ঐ বিষয়ের পদবি লাভের যোগ্য হয়।

[এরপর, আল বিরুনী রাশিসমূহকে 'গৌণভাগে রাশিদের বিভাজন' 'গ্রহসমূহের মৈত্রী ও শত্রুতা'র বিষয়ে ভারতীয় ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রীদের মতামত 'প্রত্যেক গ্রহের চার শক্তি' 'জীবনবর্ষ বা বিভিন্ন গ্রহ প্রদান করে, এবং 'এই বর্ষগুলোর তিনটি প্রকার' ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন।]

হিঁদু ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রীদের জ্ঞানানুসন্ধানের বিশিষ্ট পদ্ধতিসমূহ

পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহ পাঠ শেষে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, কী পদ্ধতিতে হিঁদু জ্যোতিষীরা মানবজীবন গণনা করেন। তাঁরা এ কথা গ্রহসমূহের অবস্থান থেকে জানতে পারেন এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কোন গ্রহ কী অবস্থায় ছিল বা গ্রহসমূহের কী প্রভাব আছে তার ভিত্তিতে বিচার করেন। সেই সঙ্গে হিঁদু জ্যোতিষীরা জন্মানুসারে জ্ঞাতিত্ব ইত্যাদিও বিচার করেন, যা অন্যান্য জ্যোতিষীরা করেন না...।

ধূমকেতু

আমি এখানে এগুলোর উল্লেখ এ কারণেই করলাম, যাতে পাঠকদের হিঁদু-ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলোকে বুঝিয়ে দিতে পারি। আকাশ ও ব্রহ্মদণ্ড-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের ধারণা এবং গণনা পদ্ধতি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সূক্ষ্মও। এ পর্যন্ত তাঁদের জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী কোষ্ঠীবিচারে কেবলমাত্র আয়ুর কথাই আলোচিত হয়েছে। এবার আমি তাঁদের বিশারদদের ধারণানুযায়ী কিছু ধূমকেতুর কথাও বলব। এ প্রসঙ্গে এরই অনুরূপ বিষয়াবলির প্রতিও দৃষ্টিপাত করব।

কালির বা সিংহিকাপত্যের শিরোভাগকে বলা হয় 'রাহু' এবং পুচ্ছভাগকে (পশ্চাদ্‌ভাগ) বলা হয় 'কেতু'। হিঁদুরা ঐ পুচ্ছের (কেতুর) উল্লেখ অল্পস্বল্পই করেন। তাঁরা কেবল তার অগ্রভাগের কথাই উল্লেখ করে থাকেন। আকাশে যত প্রকারের ধূমকেতুই দেখা যাক না কেন, সাধারণত, তাদের 'কেতু'ই বলা হয়।

[বিভিন্ন প্রকারের ধূমকেতু এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যাবলির কথা বরাহমিহিরের 'সংহিতা' নামক গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে, যাতে তারকাসমূহের সংখ্যা ও তার দিকসমূহ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীরও উল্লেখ আছে।

আল বিরুনীর ন্যায় দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর গ্রন্থে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন তা ত্রুটিযুক্ত, যে জন্য তালিকার কোনো কোনো জায়গায় খালি রেখে দিয়েছেন।]

বরাহমিহিরের 'সংহিতা' থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতি

লেখক বরাহমিহির ধূমকেতুগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। 'উচ্চ'– যেগুলো নক্ষত্রসমূহের নিকটেই প্রকাশ হয়, 'প্রবহমান' যা পৃথিবীর নিকটেই ; 'মধ্য' যা এ দুয়ের মধ্যবর্তীস্থলে প্রকাশ হয়– মধ্যবর্তী ও উচ্চ-কে পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে... ।

পবিত্র কাবা (শরিফ) সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, ধূমকেতু সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণা তারই অনুরূপ (অর্থাৎ, এ সমস্ত সত্তা যারা তাদের নানা উৎকর্ষানুসারে স্বর্গলাভ করেছিলেন এবং স্বর্গবাসের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসছেন।

[তিন শ্রেণীর ধূমকেতু সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।]

ধূমকেতু ও সেগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই হলো হিঁদুদের সিদ্ধান্ত।

আবহাওয়া বিজ্ঞান

হিঁদুদের মধ্যে এ ধরনের বিজ্ঞানী অতি বিরল, যারা আকাশের নানাবিধ ঘটনা ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিকবিজ্ঞানীদের ন্যায় যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অভ্যস্ত। এ বিষয়ে এঁরা নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন ও সৈদ্ধান্তিক প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেননি... ।

উদাহরণত, আকাশের বজ্রনিনাদ সম্পর্কে তাঁরা বলেন যে, এ হলো মেঘ-নাদ ঐরাবত অর্থাৎ, রাজা ইন্দ্রের বাহন হাতির ঐ সময়কার গর্জন, যখন সে মানসসরোবর থেকে পানি পান করে মস্তক উত্তোলন করে, তখন সে ঐরকমই কর্কশস্বরে গর্জন করে।

ইন্দ্রধনু, যাকে বলা হয় রামধনু বা রংধনু, তাকে তারা ইন্দ্রের ধনুক বলে মনে করেন, যেমন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা তাকে রুস্তমের ধনুক বলে মনে করেন।

উপসংহার

আমার ধারণা যে, এ গ্রন্থে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি, তা এমন কিছু ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে, যাঁরা হিঁদুদের সঙ্গে আলাপালোচনা করতে চান এবং তাদের সভ্যতার ভিত্তিতে ধর্ম, বিজ্ঞান বা সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নাদি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করতে চান, অতএব, আমি এই পুস্তকের রচনাকর্ম এখানেই শেষ করছি যার প্রশস্ততা পাঠকবর্গের বিরক্তিরও কারণ হয়ে থেকে থাকবে। পরিশেষে, প্রার্থনা করি, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্নিধানে, আমি যা লিখেছি, তা যদি সত্য না হয় তাহলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি তাঁর

কাছে এই সাহায্য প্রার্থনা করি যে, আমি যদি সত্য নিরূপণে সুদৃঢ় থাকি, তাহলে তিনি যেন প্রসন্ন হন। আমি প্রার্থনা করি যে, মিথ্যা ও অসত্য বস্তুর অবলোকনে তিনি যেন আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে গোধূম থেকে তার ভূষিকে পৃথক করতে সমর্থ হই। সমস্ত প্রকার মঙ্গল ও করুণার মূলাধার তিনিই এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। আল হামদুলিল্লাহি ওয়া রাব্বুল আল আমিন-ওয়াস্‌সালাত উন্নবী ওয়া মুহম্মদ ওয়ালা আজমাইন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর- যিনি সমস্ত জগতের প্রভু এবং পয়গাম্বর মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

টীকা-টিপ্পনী

১. *আবু সহল আবদুল মুনইম ইবন-এ-আলী ইবন-এ-নূহ আতিফলিসী*। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, আল বিরুনী এই ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্যই লিপিবদ্ধ করেননি। অথচ ইনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি এবং তাঁরই পরামর্শানুসারে এবং তাঁকেই খুশি করার জন্য আল বিরুনী ভারত সম্পর্কিত এই মহান গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'উস্তাদ' শব্দটি সাধারণত, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নামের সঙ্গেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তবে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নয়। সবাই মনে করেন, ইনি সুলতান মাহমুদের রাজসভার কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে থাকবেন এবং সম্ভবত তিনি ইরানি বংশোদ্ভূত।

২. *মুতাজিলা সম্প্রদায়*। ইসলাম ধর্মের এক প্রাচীন ও দার্শনিক আন্দোলন। এই চিন্তাধারার উদ্গাতা হলেন ওয়াসিম ইবনে আতা (মৃত্যু ৭৮৪ খ্রি.)। মুতাজিলাবাদীরা নীতিগতভাবে 'নিয়ত'র পরিবর্তে ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহর যা দিব্যগুণ তার সন্দেহ সহবর্তমানতায় যোগ করলে তার একত্ব নষ্ট হয়। তাঁরা কুরআন প্রসঙ্গে 'সৃষ্টি' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। খলিফা আল মামুনের আমলে এ মতবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়।

এঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল গ্রিক দর্শন। এই বিষয়ের উপরে ব্যাপক তর্ক-বিতর্কের ফলে প্রচুর গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে, যা বিতর্কমূলক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থকে সেই বিতর্কের কূটজাল থেকে রক্ষা করেন।

৩. *আবুল আব্বাস আল ইরান শহরীর* ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থে যে সকল লেখকদের নির্ধারিত গ্রন্থাবলি হতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, তাঁর গ্রন্থটি এগুলোর অন্যতম এবং আল বিরুনী যে সকল মুসলিম লেখকের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছেন, এ লেখকও তাঁদের অন্যতম। তা সত্ত্বেও আল বিরুনীর গ্রন্থের মূল তথ্যাবলির উৎস হলো দেশীয় উপকরণ, ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও ভারতীয় মূল গ্রন্থাবলি।

কিছু প্রাচীন আরব ভূগোলবেত্তার মতে, সমগ্র সামানী সাম্রাজ্য বোঝায় কিন্তু এখানে 'ইরান শহরী' বলতে ক্ষুদ্র একটি এলাকাকে বোঝানো হয়েছে।

৪. *জারকান*। আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থে এঁর সম্পর্কে শুধু এতটাই লিখেছেন, যতটা ইরান শহরী তাঁর গ্রন্থে তাঁর লেখা বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করেছেন। জারকানের গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে আল বিরুনী বেশিকিছু লেখেননি। কিন্তু সখাউ-এর মতে, বৌদ্ধদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে আল বিরুনীর প্রদত্ত তথ্যাবলি তাঁর গ্রন্থ হতেই গৃহীত।

৫. *সাংখ্য* একটি দর্শনের নাম। এর উদ্গাতা ছিলেন কপিল মুনি। এর বৈশিষ্ট্য হলো, (প্রকৃতির ও পুরুষের মধ্যে) দ্বৈতবাদ ও মৌলিক নিরীশ্বরবাদ। সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে আল বিরুনী বিস্তারিত লিখেছেন।

আল বিরুনী লিখেছেন, 'সাংখ্য' কপিল মুনির লেখা বই। আল বিরুনী বইটির আরবি অনুবাদ করেন এবং ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত রচনায় এ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে সখাউ 'সাংখ্যপ্রবচনম' (কপিলের সাংখ্যসূত্র), ঈশ্বর কৃষ্ণ রচিত 'সাংখ্যাকারিকা' এবং গৌরাঙ্গ রচিত 'ভাষ্য' এই তিনটি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, যদিও এ গ্রন্থের তিনটি ধারায় সাদৃশ্য রয়েছে তা সত্ত্বেও তারা মূলত স্বতন্ত্র।

এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম 'ষষ্ঠিতন্ত্র'– খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ভার্যাজ্ঞা তা রচনা করেন। সাংখ্য দর্শন মতে একবার জন্মালেও যেমন, দু'বারে জন্মালেও তেমনি মোক্ষলাভ করা যায়। কিন্তু পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত মতে, কেবলমাত্র দ্বিজরাই মোক্ষলাভ করে।

৬. *পাতঞ্জল (পতঞ্জলি ?)*। সখাউ লিখেছেন, আরবি পাঠে 'কিতাব-এ বাতাঞ্জল' পাওয়া যায়, কেননা, আরবি বর্ণমালায় 'প' অক্ষরটি নেই, সেজন্য সে স্থলে 'ব' লেখা হয়। কেবলমাত্র একটি স্থানে আল বিরুনী লিখেছেন 'সাহিব-ই-কিতাব-ই-পাঞ্জল'– যার অর্থ দাঁড়ায় পাতঞ্জল গ্রন্থের রচয়িতা অর্থাৎ 'পাতঞ্জল' হলো গ্রন্থের নাম, রচয়িতার নয়। আবার দুটি স্থানে 'পাতঞ্জল' শব্দের ব্যবহার গ্রন্থকার বোঝায়। এ সমস্ত নানান কারণে সখাউ-এর ধারণা, রচয়িতার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। সখাউ আরও লিখেছেন যে, আরবির মূল পাঠ্যাংশে শব্দটা লেখা আছে দীর্ঘ 'আ' দিয়ে। কিন্তু এ বিষয়ে লিপ্যান্তরণের মধ্যে সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না। যার ফলে, সখাউ সর্বত্রই সংস্কৃত নিয়ম 'পতঞ্জলি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাংখ্য ও অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় আল বিরুনীও এ গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ করেছেন এবং ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গে বহু জায়গায় তার উল্লেখ করেছেন।

পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' নামক গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন, যে গ্রন্থটি চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে রচনা বলে ধারণা করা হয়। সখাউ একথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, 'আল বিরুনীর পতঞ্জলি' ও 'যোগসূত্রের পতঞ্জলি' সর্বথায় ভিন্ন।

৭. '*গীতা*' হলো '*ভারত*' নামক গ্রন্থের অংশ। উপরোক্ত দুটি পুস্তকের ন্যায় আল বিরুনী ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত বিষয়ে এ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি বলেছেন 'গীতা' 'ভারত' নামক গ্রন্থের অংশ কিন্তু 'মহাভারত' কথার উল্লেখ কোথাও করেননি।

আল বিরুনীর দ্বারা প্রযুক্ত পাঠ ও বর্তমান কালের গীতার পাঠের মধ্যে সখাউ সাহেব বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করেছেন, সেটি বাস্তবিকই ছিল প্রাচীনতম সংস্করণ এবং বহুলাংশে পরিবর্ধিত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ঐ সংস্করণের কোনো চিহ্নই আজ আর অবশিষ্ট নেই। আল বিরুনী কর্তৃক ব্যবহৃত মূল সংস্কৃত পাঠ্যাংশের কিছু বিবরণ ১২ সংখ্যক টীকায় রয়েছে।

৮. *জবারিয়া সম্প্রদায়*। এ শব্দ 'জবর' ধাতু উৎপন্ন, যার অর্থ হঠকারিতা বা অত্যাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিচারে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' এবং এরা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের 'মুক্তমনা' নীতির ঘোর বিরোধী।

৯. *আবুল ফাতহ্ আল বুস্তী*। সুলতান মাহমুদ ও মাসুদের দরবারের প্রধান কবি। তিনি আফগানিস্তানের বুস্ত নামক অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং সামানীদের অধীনে কাজ করেছিলেন। ১০৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১০ *বুদ্ধোদন* এবং *শ্রমণরা*। সখাউ-এর মতে, যে প্রেক্ষিতে কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ভিত্তিতে কথাটা যে গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন বোঝায়, এমনটি মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাঁর অন্য আরেকটি মতানুযায়ী আল বিরুনীর তথ্যের মূল সূত্র ইরান শহরীর প্রবন্ধে কথাটা নিশ্চয় শুদ্ধোদন ছিল, বুদ্ধোদন নয় (আরবি ভাষায় শব্দ দুটি প্রায় একই রকম শোনায়)। আসলে কথাটা বোধ করি 'শোদ্ধোদনী' অর্থাৎ শুদ্ধোদনের পুত্র।

বস্তুত, গ্রন্থের অন্যত্র আল বিরুনী নিজেই লিখেছেন 'শুদ্ধোদনের পুত্র' বুদ্ধোদন। সখাউ এ স্পষ্ট উক্তিটি লক্ষই করেননি।

আরবি ভাষায় 'শমনিয়ন' শব্দটি বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। 'এই কথাটি সংস্কৃতের প্রাকৃত রূপ 'শ্রবণ' থেকে এসেছে। তাঁদেরকেই আল বিরুনী 'মুহম্মির' বা রক্তাভবস্ত্রপরিধানকারী বলেছেন। তাকে গেরুয়া বসনও বলা হয়।

১১. *বিষ্ণুপুরাণ*। বহু পুরাণের একটি নাম। পুরাণ ছয় ভাগে বিভক্ত, যার পাঁচটির বিষয়বস্তু হলো 'সৃষ্টি' সংক্রান্ত এবং ষষ্ঠাংশটি বিষ্ণুর প্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা।

১২. *বিষ্ণুধর্ম*। আল বিরুনী হিঁদুদের ধর্মীয় সাহিত্য বিষয়ক অধ্যায়ে এর উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ হলো 'ভগবানের ধর্ম– এ ক্ষেত্রে যিনি নারায়ণ।'

সখাউ এই রচনা শনাক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এটা হলো এক প্রকারের পুরাণ– যাতে পৌরাণিক কাহিনি ও বিশ্বাসগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণভাবে যেগুলো পুরাণের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আল বিরুনী তাঁর প্রদত্ত পুরাণের তালিকায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।' তিনি আরও বলেছেন, শৌনকের ঐতিহ্য সম্পর্কিত উদ্ধৃতির সবটাই সম্ভবত 'বিষ্ণুধর্ম' থেকে নেওয়া। তাঁর মতে, এটা হয়ত 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ'। ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' যার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। আল বিরুনীর কাছে এই গ্রন্থের অনুলিপি ছিল, সম্ভবত, সেটি মূল গ্রন্থের অংশবিশেষ।

আল বিরুনী যে সমস্ত সংস্কৃত পাঠ্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন, তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে ড. জে গোন্ডার লেখা 'সংস্কৃত পাঠ্যাংশ থেকে আল বিরুনীর উদ্ধৃতি' নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন যে, পৌরাণিক ঐতিহ্য সম্যক উপলব্ধি এবং আরও কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুলিপি সখাউ-এর উপরোক্ত মতামত অন্যান্য লেখকরাও গ্রহণ করেছেন।

১৩. *'অন্ত্যজ' ও চতুর্বর্ণ*। বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অধ্যায় এবং বিভিন্ন বর্ণের মানুষের আচার ব্যবহার, সংস্কার ও প্রথা সম্পর্কিত অধ্যায় (একাদশ, ত্রয়োদশ, ও চতুর্দশ অধ্যায়) ; আল বিরুনী কৃত এই অধ্যায়গুলো কয়েকটি দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণপ্রথা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত বিবরণ আল বিরুনীর এ গ্রন্থ ছাড়া আর কোনো ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বি. পি. মজুমদার [সোশিও-ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (১০৩০–১১৯৪ খ্রি.) ১৯৬০, পৃ. ৭৯] মতে, আল বিরুনী যে অবস্থার বর্ণনা করেছেন, তা সে যুগে হিঁদু সমাজে প্রচলিত না থেকে, শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলিতে উল্লেখিত হয়ে থাকবে। তাঁর মতে, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, যাদের মধ্যে অনেক মিশ্রজাতিও ছিল।

বাস্তবে, আল বিরুনীর বিবরণে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তব তথ্যচিত্রই ফুটে উঠেছে।

উদাহরণ, 'পরবর্তী দুটি জাতি' (বৈশ্য ও শূদ্রদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যদিও তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা সত্ত্বেও তারা একই লোকালয়ে পাশাপাশি বাস করে একই গৃহে মিলেমিশে বসবাস করে।" এ থেকে একথা অনুমান দুঃসাধ্য নয় যে, তাদের মধ্যে জাতিগত কিছু ভেদাভেদ থেকে থাকবে।) অন্ত্যজদের প্রসঙ্গে অধ্যাপক মজুমদার লেখেন যে, প্রারম্ভিক কালে স্মৃতিগ্রন্থগুলো রচনার সময়ে অস্পৃশ্য (জনগোষ্ঠী)-দের অন্ত্যজ বলা হতো। তিনি আরও লেখেন যে, তাদের মধ্যেকার শ্রেণীগুলোর মধ্যে আরও কিছু উপশ্রেণী বা তাদের উপবিভাগ ছিল– কেউ তাদের সংখ্যা ৭ আর কেউ ১২ বলে উল্লেখ করেছেন। আল বিরুনী তাদের 'শূদ্রদের পরে' স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, 'তাদের কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হতো না ; বরং তাদেরকে কোনো শিল্প বা ব্যবসায়ের পেশাজীবী বলে মনে করা হতো। তিনি তাদের একটি তালিকাও দিয়েছেন, যাতে তিনি তাদের "ধোপা, চামার, বাজিকর, বেত-বাঁশের বস্ত্রসামগ্রী নির্মাতা, নাপিত, নাবিক, জেলে, বাউলি ও জোলা" বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক মজুমদার তাদের ধোপা, চর্মকার, নট বা শৈশুষিক, বুরুদা (?), নাবিক, কৈবর্ত, ভীল আর কুবিন্দক বলে অভিমত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, স্মৃতিগ্রন্থে যাদের চণ্ডাল বা অন্ত্যজ বলা হয়েছে কিন্তু মনু তাদের শূদ্র বলে অভিহিত করেছেন।

১৪. *কারামতিয়ান*। এটি একটি সুসংগঠিত উগ্রপন্থী সম্প্রদায়ের নাম। প্রথমে ইসমাইলিয়াদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এদের মূল উৎস সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এরা ছিল কিছুটা অতীন্দ্রিয়বাদী, আবার সাম্যবাদী প্রভাবও এদের মধ্যে ছিল। এদেরই কিছু অনুসারী এ যুগের পরিভাষায় তাঁদের 'ইসলামী বলশেভিকবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এঁরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিরিক্ত জোর দিয়েছিলেন, কুলিমজুর ও শিল্পীদের তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংগঠিত করেছিলেন এবং সম্পত্তির উপর মহিলাদের সম-অধিকারের দাবিতে তাঁরা খুবই সোচ্চার হয়েছিলেন।

হামদান কারামত নামে এক ইরাকি কৃষক এই আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন বলে তাঁর নামানুসারে এই সম্প্রদায় 'কারামতিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি পারস্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে (৮৯৯ খ্রি.) একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা আব্বাসীয় খলিফাদের জন্য এক নিরন্তর উপদ্রব বলে গণ্য হয়। তিনি ৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে আক্রমণ চালান, তাকে অবরোধ করেন এবং 'সংগ্-এ-আসোয়াদ' নামক পবিত্র পাথরকে সেখান

থেকে তুলে নিয়ে আসেন। এর ২০ বছর পরে ফাতিমী খলিফা আল মনসুরের (৯৪৬–৯৫২ খ্রি.) আদেশে তাকে যথাস্থানে ফেরত পাঠানো হয়।

কালান্তরে, তিনি সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাংশকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুলতান মাহমুদ তাকে পরাজিত ও দমন করেন (আল বিরুনী যার উল্লেখ এখানে করেছেন)। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে, তার হৃত রাজ্য পুনরাধিকার করা হয় এবং ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী (১১৭৩–১২০৬ খ্রি.) তাকে পুনরায় দমন করেন।

১৫. *বরাহমিহির*। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'বৃহৎসংহিতা' নামক প্রসিদ্ধ দুই গ্রন্থের লেখক। আল বিরুনী এ দুই গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। পরের গ্রন্থটি ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরে লেখা কিন্তু তাতে বাস্তুকলা, প্রতিমা শিল্প, উদ্যানশিল্প, কামশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি পাওয়া যায়। এইচ. কর্ন 'বিবলিওথিকা ইন্ডিকা' সিরিজ (১৮৬৪–১৮৬৫ খ্রি.)-এ এটির সম্পাদনা করেছেন এবং জর্নল অব রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি লন্ডন, নিউ সিরিজ, ভলিউম IV-VII-এ এর ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন।

১৬. *বসুত্র, কাশ্মিরি*, যিনি বেদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ১০ ও ১১শ শতাব্দীতে বেদ লিপিবদ্ধ করার এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুঃখের বিষয় যে, সে সময়ে সংকলিত বেদের একটি পাণ্ডুলিপিও আজ আর অবশিষ্ট নেই।

১৬-ক. *পুরাণ*। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ প্রাচীন। এ হলো পদ্য ও গদ্যে লেখা ধর্মীয় আখ্যানমূলক রচনার সংকলন। বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে এ গ্রন্থগুলো পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন– সৃষ্টি, পুনঃসৃষ্টি, দেবতা, ও মুনিঋষিদের বংশাবলি, চারটি প্রধান যুগ ও রাজাদের বংশাবলি। ঐ সমস্ত গ্রন্থাবলিতে বর্তমানে যে সমস্ত পাঠ পাওয়া যায়, এল. এম. বাশামের মতানুসারে ('দ্য ওয়ান্ডার ওয়াজ ইন্ডিয়া, পেপারব্যাক সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃ. ৩০) গুপ্ত যুগের (৩১৯–৫৫০ খ্রি.) পরবর্তীকালে কোনো বর্ণনা এতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাতে আখ্যান সম্পর্কিত সামগ্রী খুবই প্রাচীনকালের।

আল বিরুনী ১৮টি পুরাণের তালিকাও দিয়েছেন, তা মূলত নিজে চোখে দেখে এবং লোকমুখে শুনে। আরও একটি পৃথক তালিকাও তিনি দিয়েছেন, তাতেও ১৮টি পুরাণের নাম রয়েছে। যা তাঁকে 'বিষ্ণুপুরাণ' পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন, আমি মৎস্য, আদিত্য ও বায়ুপুরাণ-এর কিছু অংশই কেবল দেখেছি।

১৭. *স্মৃতি*। 'স্মৃতিগ্রন্থ'গুলো মূলত ধর্মীয় নিয়মকানুন সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে 'মনুস্মৃতি' সবচেয়ে প্রাচীন, সেটি খ্রিষ্টীয় তিন শতকে লেখা হয়েছিল। কিন্তু আল বিরুনী যে 'স্মৃতি'র কথা লিখেছেন তা একটা 'বিধি-নিষেধ' সংক্রান্ত বর্ণনা।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে, আল বিরুনী স্মৃতিগ্রন্থাবলির যে তালিকা দিয়েছেন তা একদিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে 'অত্তি', 'হরিত' ও 'দক্ষ' নামক তিনটি লঘু স্মৃতিগ্রন্থের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে আমরা এগুলো সংকলনের নিম্নতম সময়সীমাকে নির্ধারণ করতে সহায়তা লাভ করি। তাতে লিখিত ও শঙ্খ দুটি ভিন্ন পুস্তক বলে বর্ণনা করা হয়েছে– অথচ তা একই 'শঙ্খ' লিখিত গ্রন্থ।

১৭-ক. *গৌড়মুনি*। আল বিরুনী গৌড়পাদের নাম লেখার সময় একথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেননি যে, তিনি শঙ্করাচার্যের গুরু ছিলেন। অবশ্য সখাউ-এর মতে, এখানে যে গৌড়মুনির কথা লেখা হয়েছে, তিনি গৌড়পাদ হতে পারেন। তবে, সেখানে আল বিরুনীর শঙ্করাচার্যের উদ্ধৃতি না দেওয়া বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার।

১৮. *'ন্যায়ভাষ'* এটি কপিলের রচনা। সখাউ বলেন যে, আরবি পাঠে এই শব্দের লিপ্যান্তর সন্দেহমুক্ত নয়– কেননা, সেটা 'ন্যায়ভাষ' বলে মনে হয়। তিনি একথাও বলেছেন যে, এ পুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গৌতমের ন্যায় দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং জৈমিনীর মীমাংসা দর্শনের সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে। কেননা, কিছুটা পরেই তিনি সেই নামটি দিয়েছেন।

'ন্যায়' হিঁদুদর্শনের পরম্পরাগত সংখ্যাগুলোর অন্যতম, যার প্রামাণ্য দলিল হলো অক্ষরপাদ গৌতম রচিত 'ন্যায়সূত্র' (চতুর্থ খ্রি.)। ষোড়শ শতাব্দীতে 'ন্যায়ভাষ্য' নামে এর একটি টীকা রচিত হয়েছিল। এর সত্যিকার রচয়িতা কে ছিলেন তা জানা যায় না, তবে, আল বিরুনী এর লেখক হিসেবে কপিলের নাম উল্লেখ করেছেন।

১৯. *মীমাংসা* । জৈমিনী প্রবর্তিত দার্শনিক গোষ্ঠী। এদের ধারণা মীমাংসা হলো দর্শন শাস্ত্রের দুটি শাখা, এর প্রথমটির নাম পূর্ব মীমাংসা, যাতে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর দ্বিতীয়টি হলো উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত নামেও পরিচিত), যার মূলাধার হলো বৈদিক সাহিত্যের আধ্যাত্মিক দিক।

আল বিরুনী এর প্রথম শাখাটির উল্লেখ করেছেন। জৈমিনী রচিত পূর্ব মীমাংসা সূত্রের রচনাকাল চার থেকে পাঁচ শতাব্দী।

২০. *লোকায়ত গ্রন্থ*। সখাউ-এর মতে, লোকায়ত দর্শন বৃহস্পতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি 'বৃহস্পতিসূত্রম'-এর রচয়িতা ছিলেন। এই গোষ্ঠীর চিন্তকরা ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক এবং দৈহিক প্রয়োজনের বাইরে বা ঊর্ধ্বে কোনো কিছু আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হলো জ্ঞানের একমাত্র সাধন। আল বিরুনী লোকায়ত কথার যে প্রয়োগ করেছেন, তা থেকে মনে হয় গ্রন্থটি এই গোষ্ঠীরই কারো রচনা।

২০.ক. *'অগস্ত্যমত'* নামক গ্রন্থ। অগস্ত্য দিয়ে নামের আরম্ভ এরকম আরও দুটি গ্রন্থ আছে। এটি ষষ্ঠ থেকে দশম খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, ভক্তিগোষ্ঠীর রমায়িত সম্প্রদায় রচিত 'অগস্ত্য-সুতিবেঞ্চ সংবাদ' আর দ্বিতীয়টি মধ্যযুগের শেষাংশে রচিত 'অগস্ত্যসূত্র'।

'অগস্ত্যসূত্র' এবং 'দেবী ভাগবতী'– এই দুটি গ্রন্থ, মহত্তর জ্ঞানের দেবী ভগবতীর উপাসনার মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধক, শক্তি, সম্প্রদায়ের নীতি এবং সূত্রের প্রধান এবং প্রামাণিক দলিল। আল বিরুনী এ দুটির মধ্যে কোনটির উল্লেখ করেছেন, বলা শক্ত।

২১. *পাণিনি*। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী'র রচয়িতা।

২২. *আবুল আসওয়াদ আদু আলী*। সাহিত্যিক ঐতিহ্যানুযায়ী তিনি আরবি ব্যাকরণের জন্মদাতা। ৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

২৩. *সিন্দহিন্দ*। আল বিরুনী বলেন যে, ভারতীয়রা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত সব গ্রন্থকেই সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেন। এরকমই একটি গ্রন্থ ব্রহ্মগুপ্তের লেখা 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত', আল ফাজারী যেটি আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন, খলিফা আল-মনসুরের আদেশে। এই গ্রন্থেরই নাম 'সিন্দহিন্দ' এবং এরই মাধ্যমে আরবরা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন।

২৪. *পৌলিশ* এবং *পুলিশ*, আল বিরুনী এদের ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার করেছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন গ্রিক, তিনি গণিত-জ্যোতিষ সম্পর্কে 'পৌলিশসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ পল। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুলিশ-ই ছিলেন ঐ গ্রন্থের সমালোচক।

২৫. *ব্রহ্মগুপ্ত*। ইনি সপ্তম শতাব্দীর প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষশাস্ত্রী। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরে লেখা তাঁর 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'-এর অংশবিশেষ আল বিরুনী আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং তিনি এ গ্রন্থের সূচিগুলোর বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন। তিনি ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যক' নামক একটি গ্রন্থেরও

উল্লেখ করেছেন, আরবিতে যা 'আরকান্দ' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থের একটি টীকাও রচিত হয়েছিল, আল বিরুনীর মতে, সে টীকাগ্রন্থটির রচয়িতা বলভদ্র। এ টীকাগুলোর নাম ছিল 'খাণ্ডখাদ্যক টিপ্প'। এখানে একথাও স্মর্তব্য যে, আল বিরুনী অন্য একটি পুস্তকের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, যার রচয়িতা ছিলেন সায়বওয়াল (?) নামক এক কাশ্মিরি। আল বিরুনী এর নাম রেখেছিলেন 'আরবি খণ্ডখাদ্যক'।

আল বিরুনী ব্রহ্মগুপ্তের 'জ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে হিঁদু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের শিরোমণি বলে উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কিছু সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেছেন এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, অশিক্ষিত হিঁদু পুরোহিতদের খুশি করার জন্যই তিনি এমনটি করে থাকবেন। আল বিরুনী তাঁর সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে, সত্য প্রকাশের কারণে সক্রেটিসের মতো দুঃখজনক ঘটনার অভিযোগের কবল থেকে মুক্তির জন্য তিনি এমনটি করে থাকতে পারেন। আল বিরুনী তাঁকে আর্যভট্টের ন্যায় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করার জন্য ভর্ৎসনা করেছেন।

২৬. *আর্যভট্ট*। পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গণিতশাস্ত্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। গণিতশাস্ত্রে দশমিক পদ্ধতির তিনিই উদ্গাতা। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর্যভট্ট ৪৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এইচ. কর্ন (লিডেন ১৮৭৪) গ্রন্থটির সঠিক সম্পাদন করেছেন। এর পরে বলদেব মিশ্র এতে, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় টীকা সংযোজন করেছেন (এটি বিহার রিসার্চ সোসাইটি, পাটনা থেকে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে)। আর-বিরুনী লিখিছেন যে, তিনি তাঁর লেখা কোনো গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখেননি। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

আর্যভট্টের মতে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং সে তার নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। তিনি গ্রহণ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যাই আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'চন্দ্রগ্রহণ' তখনই হয় যখন সে পৃথিবীর ছায়াপথের মধ্যে প্রবেশ করে আর যখন চাঁদ সূর্যকে ঢেকে আমাদের দৃষ্টি থেকে সূর্যকে আড়াল করে নেয়। আল বিরুনী এই মতামতের জন্য আর্যভট্টের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল বিরুনী দুজন আর্যভট্টের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁদের 'জ্যেষ্ঠ আর্যভট্ট' ও 'কুসুমপুরের আর্যভট্ট' 'আল-নসফ' (?) নামক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এবং কুষাণ শাসকের (১ম শতাব্দী) রাজবৈদ্য ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে এটিকেই মূল বলে গণ্য করা হয়।

২৭. আল বিরুনী এ গ্রন্থের আরবি অনুবাদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এটি বারমকী রাজবংশের এক রাজার আদেশে আরবিতে অনূদিত হয়েছিল।

২৮. *বরমিসিডিজ*। খালিদ ইবনে বারমাকের বংশধর, যিনি খলিফা মনসুরের একজন অত্যন্ত প্রতাপী ও প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন। খালিদ বলখের এক বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষের (বারমাক) পুত্র ছিলেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে যিনি বারমকী বরমিসিডিজ নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি মনসুর ও মেহেদীর (৭৭৫–৮৫ খ্রি.) খিলাফতের যুগে বড়ই প্রতাপশালী অমাত্য ছিলেন ; তিনি হারুন আল রশিদের খিলাফতের যুগে ইন্তিকাল করেন (৭৮৬–৮০৯ খ্রি.)। বরমিসিডিজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান সংরক্ষক ছিলেন। তাঁর যুগে আব্বাসীয় খলিফাদের দরবারে ইরানি ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

২৯. *কলীলা ওয়া দিমনা (বা পঞ্চতন্ত্র)*। এটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ, যা অনেক আগেই করা হয়েছিল, তা থেকেই এর আবার আরবি অনুবাদ করা হয়। মূল সংস্কৃত ও তার ফারসি অনুবাদ– এ দুটিই বর্তমানে সুদুর্লভ এবং ইবনে আল মুকাফ্ফা (মৃত্যু ৭৫৭ খ্রি.) কৃত আরব সংস্করণকে ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এ গ্রন্থ শিক্ষামূলক কাহিনির একটি সংকলন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজাদের নীতিশাস্ত্র ও রাজতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষাদান করা।

সংস্কৃতের মূল পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এর কিছুটা 'পঞ্চতন্ত্রে'র মধ্যে পাওয়া যায়।

৩০. *আবদুল্লাহ আল মুকাফফা*। তিনি একজন জরথ্রুস্টী ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ; ৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সন্দেহমূলক ধর্মীয় মতবাদের কারণে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

৩০-ক. *পূর্বদেশের উদুনপুর*। উদুনপুরকে উদন্তপুরী 'বিহার' বলে অনুমান করা যেতে পারে, যেটি পূর্ব-মধ্যযুগেও (৬০০–১২০০ খ্রি.) বিহারের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম ছিল। এটি ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমান বিহার শরিফ এলাকার (নালন্দা জেলা) সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাহাড়ের উপর স্থাপিত ছিল। যোগেন্দ্র মিশ্রের গবেষণা-সন্দর্ভ 'দি উদন্তপুরী বিহার' (রামকৃষ্ণ মিশন, পাটনা পত্রিকায় বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ. ৯৩–১১৪) দেখুন। এটি অধিক প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিহার থেকে ভিন্ন, যেটি তার নিকটেই অবস্থিত।

৩১. *কনৌজ ও বাড়ি।* প্রসিদ্ধ রাজধানী কনৌজের পতনের পরে এ রাজধানী বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বাড়ি নগরটি গঙ্গা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানান্তরণ হয়েছিল সুলতান মাহমুদের কনৌজ আক্রমণের (১০১৮ খ্রি.) সময়।

আর. এস. ত্রিপাঠী (হিস্ট্রি অব কনৌজ, ১৯৬৪–সংস্করণ, পৃ. ২৮৫, ২৮৭) তাঁর গ্রন্থে এ তথ্য উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু এর উপরে কোনো টিপ্পনী লেখেননি। অধ্যাপক ওয়াই মিশ্র (দি হিঁদু শাহীজ অব আফগানিস্তান অ্যান্ড দি পাঞ্জাব, ৮৬৫–১০২৬ খ্রি. পাটনা ১৯৭২, পৃ. ১৯৭) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাড়ী (যাকে তিনি বাড়ি বলে মনে করেছেন) স্কন্ধবারী প্রতিহার রাজ্যের একটি শিবির ছিল মাত্র এবং সুলতান মাহমুদের ব্যাপক লুটতরাজের ফলে সেখানে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু একথা এখানে অবশ্যই স্মর্তব্য যে, আল বিরুনী, যিনি এই আক্রমণের বারো বছর পরে এ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি সেখানে লোকালয় ও নগরের কথাই লিখেছেন।

৩২. *ফারসাখ।* এ হলো দূরত্ব বিষয়ক পরিমাপের একক, যা চার মাইলের সমান হয়ে থাকে।

৩৩. *ইয়াকুব ও আল-ফাজরী।* ইয়াকুব ইবনে তারিক ও মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল ফাজরী ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলো মুসলিম জগতে পরিচয় প্রদানকারী প্রথম দিককার লেখক ছিলেন। এঁদের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর উত্তরার্ধের লোক ছিলেন এবং তিনি ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ও ফলিত-ভূগোলের উপর এক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আল বিরুনী তাঁর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ভুল ধরেছেন এবং কতিপয় সংস্কৃত শব্দের আরবি লিপ্যান্তরণের ত্রুটির বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সামান্য আলোচনাও করেছেন। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'-এর অনুবাদ করেছিলেন এবং সখাউ-এর মতে, তিনি ব্রহ্মগুপ্তের অন্য গ্রন্থ 'খাণ্ডখাদ্যক'-এরও আরবি অনুবাদ করেছিলেন, যেটি আরবদের কাছে 'আল আরকন্দ' নামে পরিচিত।

৩৪. *রাম ও রামায়ণ।* মি. বুল্ক (আল বিরুনী অ্যান্ড দ্য রাম কথা এ. সি.বি. পৃ. ৭৭–৮৩)-এর মতে, যদিও আল বিরুনী ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্য সম্পর্কিত অধ্যায়ে রামায়ণের কোনো উল্লেখ করেননি (দ্বাদশ অধ্যায়), তা সত্ত্বেও 'রাম ও রামায়ণের কাহিনি' সম্পর্কে তিনি প্রদত্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ মহাকাব্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন।

৩৫. *মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজী।* আবু বকর মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজী (ইয়োরোপে যিনি রাজেজ নামে পরিচিত ; ৮৬৫–৯২৫ খ্রি.) বাগদাদের রাজকীয় হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আয়ুর্বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলোর মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ হলো 'হাবি'।

৩৬. *ব্রাহ্মণ রাজা সামন্ত ভীমপাল।* সখাউ এই অধ্যায় (উনপঞ্চাশ)-এর দুই অংশের প্রকৃতির ও বিষয়ন্তর অসমৃদ্ধতার বিষয়ে টিপ্পনী দিয়েছেন এবং তিনি লিখেছেন যে, এর পূর্বাংশটি সংবৎসর সম্পর্কিত এবং তা 'বিষ্ণুধর্ম' থেকে নেওয়া হয়েছে (পূর্বোক্ত টিপ্পনী দেখুন)। আর এর অপরাংশটির সম্পর্ক ঐতিহাসিক বিষয়ের সঙ্গে (কাবুলের শাহ বংশ)। আল বিরুনী এর তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি। এটা আল বিরুনীর স্বভাব প্রকৃতির বিপরীত, কেননা, তিনি যদি এ সম্পর্কিত কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন, তাহলে অবশ্যই তার নামোল্লেখ করতেন। সম্ভবত, এ অধ্যায়ের তথ্যগুলো তিনি লোকমুখ হতে সংগ্রহ করেছিলেন– 'আর তাকে ঐ যুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিক্ষিত হিঁদুদের মধ্যে প্রচলিত পাঠ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।' আল বিরুনী এ ধরনের ঐতিহ্যগত অবিশ্বাস্যনীয়তার সম্পর্কে প্রায়শই টিপ্পনী দিয়েছেন এবং সেই বিষয়টিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। একথাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি যে ঐতিহাসিক কালানুক্রম দিয়েছেন, তা পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নয়। সখাউ পরিশেষে লিখেছেন যে, এই অধ্যায়ে 'দোষারোপ বা প্রশংসা যাই হোক না কেন' তাতে যা জুড়ে গিয়েছে, তা আল বিরুনীর তথ্য-সরবরাহকারীদের উপরেই বর্তায়। হিন্দি শাহীদের অবস্থারই বিস্তৃত অধ্যয়নের জন্য দেখুন যোগেন্দ্র মিশ্রের গ্রন্থ 'হিন্দ শাহী অব আফগানিস্তান অ্যান্ড দ্য পাঞ্জাব' (৮৬৫–১০২৬ খ্রি.) পাটনা, ১৯৭২ ; অধ্যাপক মিশ্র এখানে প্রদত্ত শাসকদের তালিকাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন কিন্তু একথাও বলেছেন যে, শাহীরা ক্ষত্রিয় ছিলেন, ব্রাহ্মণ নয়, যেমনটি আল বিরুনী বলেছেন।

৩৭. *এক ঘড়ি... ছাড়া হলো।* পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে ঘোড়ার প্রয়োগ করা হতো কিন্তু আল বিরুনী লিখেছেন ঘড়ি।

৩৮. এ এক আকর্ষণীয় তথ্য। উল্লেখ যে, এমন লোকেদের সংখ্যাও অনেক, যারা এই ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিল।

৩৯. এ এক বিশাল বৃক্ষ যাকে '*প্রয়াগ*' বলা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে বট জাতীয় কোনো বৃক্ষ ছিল যাকে 'প্রয়াগবৃক্ষ' বা প্রয়াগের বৃক্ষ বলা হয়ে থাকবে।

৪০. হিঁদুদের উৎসব। সখাউ-এর মতে, ভারতীয় পালা-পার্বণগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত এই অংশের তুলনা এইচ. এইচ উইলসনের এসেজ অ্যান্ড লেকচার্স ২য় খণ্ড, 'দি রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালস অব দ্য হিন্দুজ'-এর সঙ্গে করা উচিত। সখাউ পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, এ অধ্যায়ের ফারসি অনুবাদ আবু সাঈদ আবদুল হাই গরদেজীর পুস্তকে করা হয়েছিল (বোদলিয়ান পাণ্ডুলিপি)।

একথাও উল্লেখনীয় যে, গরদেজী সুলতান জাইনুল মিল্লাত আবদুর রশিদ বিন সুলতান মাহমুদ (১০৪৯-৫২ খ্রি.)-এ সমকালীন ছিলেন যাকে তিনি 'জাইনুল আখবার' নামক গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন। এ পুস্তকে ইরানের প্রাচীন রাজা-বাদশাহ, ইসলামের প্রাচীনকালীন ইতিহাস, কালানুক্রমিক সম্বত, মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান, পারসিক ও হিঁদুদের পালা-পার্বণের বর্ণনা রয়েছে। এর শেষাংশ, যার উদ্ধৃতি সখাউ সাহেব দিয়েছেন, তা আল বিরুনীর এই অধ্যায়ের অনুবাদ। খুরাসান প্রদেশের ইতিহাসে 'জাইবুল আখবার'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবোল্ড লিখেছেন যে, 'ভারত সম্পর্কিত অংশটি সম্পূর্ণভাবে আরবি উৎস থেকে গৃহীত' আর সেই সঙ্গে অনুবাদের কিছু ত্রুটিও আছে।

বোদলিয়ান পাণ্ডুলিপি কেম্ব্রিজ পাণ্ডুলিপিরই প্রতিলিপি।

৪১. *মহানবমী, মহাদেবের ভগিনী।* দেবী মহানবমীকে ভগবতীর সমকক্ষ বলে মান্য করা হয়েছে, যে পর্বটি অশ্বযুজ অষ্টমীতে পালিত হয় কিন্তু তাকে মহাদেবের পত্নী না বলে ভগিনী বলাটা সরাসরি ভুল। এ তথ্য স্পষ্ট যে, এ পর্বটি আজকাল দুর্গাপুজোর আগে পালন করা হয়। পাঠা বলির কথাও সেখানে উল্লেখিত হয়েছে।

৪২-৪৫. পাঠকের মনে কিছু অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, পিতৃপক্ষ ও দিওয়ালী (দীপাবলি) শিবরাত্রি ইত্যাদির তারিখ ইত্যাদি। এই বর্ণনাগুলো ভালোমত বোঝার জন্য বি. পি মজুমদারের গ্রন্থ 'সোশ্যিও-ইকনমিক হিস্ট্রি অব মডার্ন ইন্ডিয়া' (১০৩০-১১৯৪ খ্রি. পৃ. ২৭৩-৩১৫) দেখা যেতে পারে, যাতে হিঁদুদের সার-সংগ্রহ ও আল বিরুনীর গ্রন্থের তুলনামূলক অধ্যায়ের উপরে ভিত্তি করে ভারতীয় পালা-পার্বণের আনুপূর্বিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধ্যাপক মজুমদার এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু পালা-পার্বণ ও তার তারিখ নির্ধারণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু পালা-পার্বণ, যেগুলো বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাতে অনেক

পরিবর্তন এসে গিয়েছে এবং আল বিরুনী এরকম কিছু প্রথার উল্লেখ করেছেন যা "যা ভারতীয় সার-সংগ্রহকর্তা'র জানা ছিল না।" কিছু পুজোপর্ব সে সময়ে পালন করা হতো এবং আজকালকার কিছু প্রধান পর্ব যেমন 'ছট' দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতের অধিবাসীদের জানা ছিল না।

এ সম্পর্কে 'হিঁদু পঞ্চাঙ্গ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বিশেষভাবে স্মর্তব্য :

১. *পিতৃপক্ষ।* বছরের কিছু মাস গণনার দুটি পদ্ধতি আছে (ক) অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত গণনাকৃত মাসকে 'অমান্ত' বলে, আর (খ) পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত গণনাকৃত মাসকে 'পূর্ণিমান্ত' বলে। শুক্লপক্ষের অবধি দুটি পক্ষেই সমান। আল বিরুনী এ পর্বের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এ তখনই পড়ে যখন চাঁদ দশম নক্ষত্রে অবস্থান করে' এবং পরে একথাও বলেছেন যে, 'চাঁদ অমাবস্যার কাছাকাছি সময়ে নক্ষত্রে প্রবেশ করে।' মাস গণনায় পূর্ণিমান্ত পদ্ধতির অন্তর্গত ভাদ্রপাদ-এর উল্লেখ আল বিরুনী করেছেন। আশ্বিন (অশ্বয্যুজ) ওরই অন্তর্ভুক্ত, যাতে এই পর্ব পালন করা হয়।

২. *দিওয়ালী (দীপাবলি)।* আল বিরুনী বলেছেন, এটি কার্তিক-এর শেষে অমাবস্যায় পালন করা হয় এবং সূর্য যখন তুলা অভিমুখে অগ্রসর হয়। এল. ডি. এস. পিল্লাই (ইন্ডিয়ান ইফেমেরিস, প্রথম খণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯২২, পৃ. ৩) এর মতে, চান্দ্রমাস বা সংযুক্ত মাস তিরিশ তিথি বা চান্দ্রদিবসে, যা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান হয়, তা দুভাগে বিভক্ত। প্রথম অর্ধাংশকে শুক্লপক্ষ বলা হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধাংশকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। অন্তিম বা তৃতীয়াংশকে বালচন্দ্র অমাবস্যা বলা হয়, আর কখনো বা তা ঐ মাসের নামে পরিচিত হয়, কখনো বা আগামী মাস থেকে গণনা করা হয়। এখানে একথাও সবিশেষ উল্লেখ্য যে, অমাবস্যা বিশেষ একটি ক্ষণের নাম, কোনো বিশেষ দিন বা তিথির নাম নয়। 'বালচন্দ্র' পারিভাষিক দৃষ্টিতে তা ক্ষিতিজের উপর প্রকাশ বোঝায় না।

৩. *'ঢোল' (অর্থাৎ ডোল) ও শিবরাত্রি।* ডোল উৎসব এ যুগের দোল বা হোলি উৎসব, যা এর তারিখ (১৫ ফাল্গুন) ও তা পালন থেকে বোঝা যায়। শিবরাত্রি প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ্য যে, তা এর পরবর্তী রাতে অর্থাৎ ১৬ ফাল্গুন তারিখে পড়ে। যেমনটি আমাদের জানা আছে যে, মহাশিবরাত্রি নামেও একটি পর্ব আছে। যা দোলের ১৬ দিন আগে পালন করা হয়। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে শিবরাত্রি প্রতি মাসের তেরো তারিখে পড়ে। আল বিরুনী

মহাশিবরাত্রির উল্লেখ না করে শিবরাত্রির উল্লেখ করেছেন, যা সম্ভবত, মাসিক শিবরাত্রিরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু তারিখগুলোর মধ্যে (ত্রয়োদশ ও ষোড়শ) অসঙ্গতি রয়েছে, তা সম্ভবত, লিপিকরের ভুল।

আরও একটি ক্ষুদ্র অসঙ্গতির প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত। পালা-পার্বণের বর্ণনা মাসের নিয়মানুসারে করেছেন। আল বিরুনী একথা স্পষ্ট করেননি যে, মাসগুলোকে তার ক্রমানুযায়ী দেখানো হয়েছে কিন্তু একটি মাস ব্যতীত তা সমস্ত মাসের ক্ষেত্রে করা হয়েছে– তাতে এক মাসের ক্রম ভঙ্গ হয়েছে, শ্রাবণের পরে আশ্বিন মাস এসেছে, ভাদ্রের নাম আসেনি।

৪৬. *সায়ক্বাল (?)।* সখাউ তাঁর টীকায় এ সংকেত দিয়েছেন যে, সায়ওয়াবাল (আরবি পাঠে 'সিয়াওবাল' দেওয়া হয়েছে)। ইনি কাশ্মিরি হিঁদু বলে জানা যায়, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। একথা সত্য হোক বা না হোক, একথা স্মর্তব্য যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু শিক্ষিত মানুষ আরবিতে লেখা বইপত্র পড়তে পারতেন এবং যিনি তাদের মাধ্যমে কিছু-না-কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন।

অন্য এক স্থানে আল বিরুনী লিখেছেন যে, তিনি হিঁদুদের জন্য 'ইউক্লিদিস' ও 'আল মজোস্তী' নামক দুটি পুস্তকের অনুবাদে এবং বেধযন্ত্র নির্মাণের উপর এক গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। এ উদ্ধৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ প্রশ্নে আল বিরুনী ভারতীয় পাঠকদের ব্যাপারে অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন।

টীকায় ব্যবহৃত সহায়ক গ্রন্থাবলির তালিকা

১. অ্যাডওয়ার্ড সি. সখাউ, ক্রনোলজি অব এনশেন্ট নেশনস, লন্ডন, ১৮৭৯, ভূমিকা, পৃ. ৫—১৪

২. অ্যাডওয়ার্ড সি. সখাউ, আল বিরুনীজ ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৮৮৮, দিল্লি পুণর্মুদ্রণ, ১৯৬৪, ভূমিকা-পৃ. ৬

৩. আল বিরুনী কমেমোরেটিভ ভলিউম, ইরান সোসাইটি, কলিকাতা—১৯৫১।

৪. ইন্দো-ইরানিকা, খণ্ড ৫, সং, ৪, ১৯৫২, 'আল বিরুনী মিলেনারি সেলিব্রেশেন্স।'

৫. কে. এ. নিজামী, 'পলিটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি ডিউরিং দ্য আর্লি মেডাইভ্যাল পিরিয়ড' (প্রফেসর এম. হাবীবের গ্রন্থাবলি) 'আবু রাইহান আল বিরুনী অন দ্য ন্যাশনাল ক্যারেক্টর অব দ্য হিন্দুজ,' পৃ. ২৫—৩২, 'হিন্দু সোসাইটি ইন দ্য মেডাইভ্যাল এজেজ' পৃ. ১৩৭—৫৭, 'ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ অ্যাট দ্য টাইম অব দ্য টার্কিশ এনভেজেন্স।' পৃ. ১৫২—২২৮.

৬. ইলিয়ট অ্যান্ড ডাসন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এক টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্ট্রিয়ান্স, খণ্ড—২, পুণর্মুদ্রিত সং. ১৯৫২, এম. হাবীব-এর ভূমিকা, পৃ. ১৮ ও টিপ্পনী।

৭. এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ডি. জে. বাইলোট-এর 'আল বিরুনী' শীর্ষক প্রবন্ধ, নয়া সং. লন্ডন, ১৯৬০, ১, ১২৩৬—৩৮.

৮. সি. সি. জিলেস্পাই, সম্পাদক, ডিকশনারি অব সাইন্টিফিক বায়োগ্রাফি, এ. এস. কেনেডি লিখিত 'আল বিরুনী' শীর্ষক প্রবন্ধ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০, ১১, ১৪৭—৫৮.

৯. এন্সলি টি, এম্ব্রি, আল বিরুনীজ ইন্ডিয়া, (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, ভূমিকা, পৃ. ৫—১৯, (দেখুন, পৃ. ১১, টিপ্পনী ৩০)

১০. আর. সি. মজুমদার, এ প্যাসেজ ইন আল বিরুনীজ ইন্ডিয়া, নন্দ যুগ ? জে. বি. ও. আর. এস. ৯, ১৯২৩, পৃ. ৪১৭—১৮.

১১. আল বিরুনীজ ইন্ডিয়া, আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, আই. সি. ১, সং. ১, ১৯২৭, পৃ. ৩১—৩৫, উপরোক্ত সং. ২, ২২৩—৩০ ; উপরোক্ত সং. ৩, পৃ. ৪৭৩—৮৭.

১২. জেড. আহমদ, আল বিরুনী, আই. সি. ৫, ১৯৩১, পৃ. ৩৪৩—৫১ ; উপরোক্ত, ৬, ১৯৩২, পৃ. ৩৬৩—৬৯.

১৩. এফ, কেরেঙ্কোভ, আবু রাইহান আল বিরুনী, আই. সি. ৬, ১৯৩৭, পৃ. ৫২৮—৩৪.

১৪. এস. এইচ. বর্ণী, আল বিরুনীজ সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস, উপরোক্ত, ১৯৫২—৫৩, পৃ. ৩৭—৪৮.

১৫. এ. এইচ. দানী, আল বিরুনী অন সংস্কৃত লিটারেচার, জে. পি. এইচ. এম. ১, ১৯৫৩, পৃ. ৩০১—১৭.

১৬. এস. এ. আলী, আল বিরুনী, দি স্কলার অ্যান্ড দি রাইটার, পাকিস্তান হিস্ট্রিক্যাল কনফারেন্স, ১৯৫৩, পৃ. ২৪৩—৫২.

১৭. এম. এল. রায় চৌধুরী, আবু রাইহান আল বিরুনী অ্যান্ড হিজ ইন্ডিয়ান স্টাডিজ, আই. আই. ভলিউম ৮, ১৯৫৪, পৃ. ৯—১২.

১৮. বি. সি. এল, আল বিরুনীজ নলেজ অব ইন্ডিয়ান জিয়োগ্রাফি, আই. আই. ভলিউম ৭, ১৯৫৪, পৃ. ১—২৬.

১৯. এম. ইয়াসীন, আল বিরুনী ইন ইন্ডিয়া, আই. সি. XLIX, ১৯৭৫, পৃ. ২০৭—১৩.

২০. এম. এস. খান, আল বিরুনী অব ইন্ডিয়ান মেটাফিজিকস, LV, ১৯৮১, ১৬১—৮৮.

২১. গুণীন্দর কৌর, আল বিরুনী আরলি স্টুডেন্ট অব কম্পারেটিভ রেলিজিয়ান্স, LXI, ১৯৮২, পৃ. ১৪৯—৬৩.

২২. এম. এস. খান, আল বিরুনী অ্যান্ড দি পলিটিক্যাল হিস্টি অব ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্স, ই. জে. ব্রিল, লাইডন, ভলিউম ২৫-২৬, পৃ. ৮৬—১১৫.

২৩. মকবুল আহমদ ও অন্যান্য, আল বিরুনী, অ্যান ইনট্রোডাকশন টু হিজ লাইফ অ্যান্ড রাইটিংস, আল বিরুনীর উপর আলোচিত উদ্যোক্তাদের দ্বারা লিখিত অভিসন্দর্ভ ১৯৭১.

২৪. এম. গিয়াসউদ্দীন, পিএইচ. ডি-র অপ্রকাশিত প্রবন্ধ (১৯৬৮), এ ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস অব দ্য রাইটিংস অব আল বিরুনী পার্টেনিং টু ইন্ডিয়া, মওলানা আজাদ লাইব্রেরি, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।